গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ভবন, ঢাকা।
www.fisheries.gov.bd

নং: ৩৩.০২.০০০০.১১২.৫৫.০০১.২০-৭৬ তারিখ: ৬৯/০১/২০২২খ্রি.

বিষয়: মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা" প্রকল্পের আওতায় প্রণয়নকৃত জেলেদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল চূড়ান্ত অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: ১। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১১২.৫৫.০১.২০.৭৮৩; তারিখ: ০৯.১২.২০২১খ্রি.;
২। উপপরিচালক (প্রশাসন), মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১০৬.০৬.০০৯.২১.০৯; তারিখ: ১১.০১.২০২২খ্রি.;
৩। প্রকল্প পরিচালকের স্মারক নং: ৩৩.০২.০০০০.৯৫৬.২৫.০০৮.২১-৭৮; তারিখ: ২৪/০১/২০২২ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা" প্রকল্পের আওতায় জেলেদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩দিনের ট্রেডভিত্তিক আবাসিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রণীত মডিউলটি Validation Workshop এর মাধ্যমে পুনর্গঠন করা হয়। পুর্নগঠিত মডিউলটি অনুমোদন করা প্রয়োজন মর্মে প্রকল্প পরিচালক তাঁর পত্রে উল্লেখ করেছেন।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত প্রকল্পের কর্মশালার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুর্নগঠিত মডিউলটি অনুমোদন করা হলো। এ ব্যাপারে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(খঃ মাহবুবুল হক)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ০২- ২২৩৩৮২৮৬১
ই-মেইল:dg@fisheries.gov.bd

প্রকল্প পরিচালক
ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা উইং, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। অফিস কপি।

ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ মডিউল

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

স্বত্ব
ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা

মোহাঃ আতিয়ার রহমান	অতিরিক্ত মহাপরিচালক
আজিজুল হক	পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য)
মোহাঃ আতাউর রহমান খাঁন	উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা)
সৈয়দ মোঃ আলমগীর	উপপরিচালক (প্রশাসন)
মোঃ জিয়া হায়দার চৌধুরী	প্রকল্প পরিচালক
মাসুদ আরা মমি	উপপ্রধান
ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসেন চৌধুরী	উপপ্রধান
মোঃ মাগফুর রহমান	সহকারী পরিচালক
মোঃ মাহবুবুর রহমান	উপ প্রকল্প পরিচালক
মনিকা দাস	সহকারী পরিচালক
মোছাঃ শিরিন শীলা	সহকারী প্রকল্প পরিচালক
তন্ময় কুমার দাশ	সহকারী পরিচালক
সঞ্জয় দেবনাথ	সহকারী পরিচালক
মোঃ শামসুল আলম পাটওয়ারী	সহকারী পরিচালক

প্রকাশ সংখ্যা
০১

প্রকাশকাল
জানুয়ারি, ২০২২

ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স

কোর্সের বিষয়সূচী

দিন	ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
		প্রশিক্ষণ সময়সূচী	০২
১ম দিন	১.০	নিবন্ধন ও উদ্বোধন	০৪
	১.১	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; কার্যক্রম সমুহের বিবরণ	০৯
	১.২	ইলিশ মাছের গুরুত্ব, বিস্তৃতি,জীববিদ্যা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	১৩
	১.৩	ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে কৌশল প্রণয়ন ও সরকারের গৃহিত কার্যক্রম	২০
	১.৪	মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে বিদ্যমান আইন	২৭
	১.৫	জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব, জেলেদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিকল্প কর্ম সংস্থান সৃষ্টি	৩৯
২য় দিন	২.১	বিকল্প কর্মসংস্থানে সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক আলোচনা (গরু/গাভী/বকনা বাছুর পালন)	৪৫
	২.২	বিকল্প কর্মসংস্থানে সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক আলোচনা (উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল/ ভেড়া পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা)	৬৬
	২.৩	বিকল্প কর্মসংস্থানে সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক আলোচনা (উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন)	৭৪
৩য় দিন	৩.১	মাছচাষের প্রাথমিক ধারণা (পুকুর/খাচাঁয় /পেনে /কোলে মাছচাষ)	৮৪
	৩.২	ইলিশ মাছ পরিবহন, বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	১১৩
	৩.৩	ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গণসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব	১২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স

প্রশিক্ষণের মেয়াদঃ ০৩ দিন
অংশগ্রহণকারীঃ এআইজিএ সুবিধাভোগী জেলে/জেলে পরিবারের সদস্য

সময়	৯:০০- ৯:৩০	০৯:৩০ - ১০:৩০	১০:৩০-১১:০০	১১:০০ - ১২:০০	১২.০০-১৩.০০	১৩.০০-১৪.০০	১৪:০০-১৫:০০	১৫:০০-১৬:০০	
দিন	**সেশন বিবরণ**								
দিন-১	নিবন্ধন ও উদ্বোধন	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; প্রকল্পের কার্যক্রম সমুহ	চা বিরতি	ইলিশের গুরুত্ব, বিস্তৃতি, জীব বিদ্যা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন কৌশল ও সরকারের গৃহিত কার্যক্রম	নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি	জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব, জেলেদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিকল্প কর্ম সংস্থান সৃষ্টি	জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে বিদ্যমান আইন	সান্ধ্যকালিন কাজ
দিন-২	পুনারালোচনা ও প্রতিভাব	বিকল্প কর্মসংস্থানে সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক আলোচনা-১ (গরু/ গাভী/ বকনা বাছুর পালন/ উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল /ভেড়া/ হাঁস-মুরগী পালন/ ডিস্কেলিং মেশিন অপারেট/ ক্ষুদ্র ব্যবসা/ অন্যান্য)	চা বিরতি	বিকল্প কর্মসংস্থানে সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক আলোচনা-২ (গরু/ গাভী/ বকনা বাছুর পালন/ উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল /ভেড়া/ হাঁস-মুরগী পালন/ ডিস্কেলিং মেশিন অপারেট/ ক্ষুদ্র ব্যবসা/ অন্যান্য)	বিকল্প কর্মসংস্থানে সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক আলোচনা-৩ (গরু/ গাভী/ বকনা বাছুর পালন/ উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল /ভেড়া/ হাঁস-মুরগী পালন/ ডিস্কেলিং মেশিন অপারেট/ ক্ষুদ্র ব্যবসা/ অন্যান্য)	নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি	বিকল্প কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক মাঠ পারদর্শন		
দিন-৩	পুনারালোচনা ও প্রতিভাব	মাছচাষের প্রাথমিক ধারণা (পুকুর/খাচাঁয় /পেনে /কোলে মাছচাষ)	চা বিরতি	ইলিশ মাছ পরিবহন, বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গণসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব	নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি	কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী		

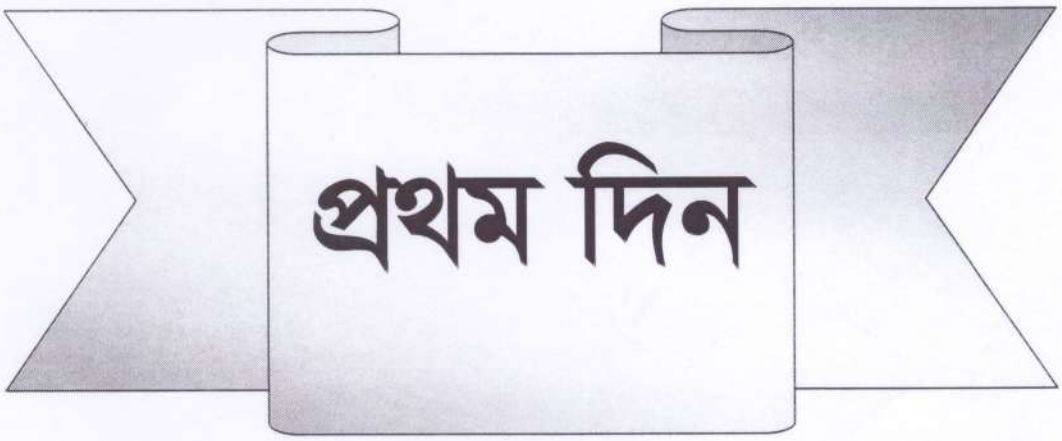

- নিবন্ধন ও উদ্বোধন
- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; কার্যক্রম সমুহের বিবরণ
- ইলিশ মাছের গুরুত্ব, বিস্তৃতি,জীববিদ্যা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা
- ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা কৌশল ও সরকারের গৃহিত কার্যক্রম
- জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব, জেলেদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণে আইনে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে বিদ্যমান আইন

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	অধিবেশন নং- ০০	সময়: ০৯:০০-০৯:৩০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: নিবন্ধন ও কোর্স উদ্বোধন

অভীষ্ট দল: বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নির্বাচিত সুফলভোগী জেলে

লক্ষ্য: জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হবে যাতে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষনার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে পরিচিতি ঘটে এবং কোর্স সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

উদ্দেশ্য এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –

- প্রশিক্ষণার্থীদের সুনির্দিষ্ট ফরমে নাম নিবন্ধন করবেন।
- প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে পরিচিতি ঘটবে।
- আমন্ত্রিত অতিথিগণ কোর্স সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের নামে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			১০ মিনিট
	• স্বাগত ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন: • প্রশিক্ষক কর্তৃক সংক্ষেপে কোর্সের গুরুত্ব ব্যাখ্যা।	বক্তৃতা	
বিষয়বস্তু			৪০ মিনিট
	• প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরন (ব্যাগ, খাতা, কলম ইত্যাদি); সুনির্দিষ্ঠ ফরমে প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন; • একজন প্রশিক্ষনার্থী ও একজন আমন্ত্রিত অতিথি "জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ" কোর্সের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান এবং • প্রধান অতিথি কর্তৃক কোর্স উদ্বোধন।	বক্তৃতা	
সার-সংক্ষেপ			১০মিনিট
	• প্রশিক্ষক কর্তৃক আমন্ত্রিত অতিথি ও প্রশিক্ষণার্থীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন • পরবর্তী অধিবেশনে সার্বিকভাবে কোর্সের মৌলিক অবকাঠামো এবং কিছু আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা।	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: ব্যানার, নিবন্ধন ফরম, প্রশিক্ষণ সামগ্রী ইত্যাদি।			

ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রশিক্ষণের মেয়াদকালঃ ০৩ দিন (..... হতে .....)
প্রশিক্ষণের স্থানঃ .....
দপ্তরের নাম ও ঠিকানাঃ.....

নিবন্ধন ফরম

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	NID ও FID নম্বর	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					
১৩					
১৪					
১৫					
১৬					
১৭					
১৮					
১৯					
২০					
২১					
২২					
২৩					
২৪					
২৫					

প্রশিক্ষকের নাম, স্বাক্ষর ও তারিখঃ

ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স

প্রাত্যহিক পুনরালোচনা

(একক/দলীয় অনুশীলনী)

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হলো পূর্বদিনের কার্যক্রম পুনরালোচনা এবং প্রদত্ত সান্ধ্যকালীন কাজ উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে অংশগ্রহণকারীগণ অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন।

ক. পুনরালোচনা

- প্রথম দিন ব্যতীত প্রতিদিন শুরতেই লটারির মাধ্যমে ঐ দিনের পুনরালোচনা অধিবেশন উপস্থাপনার জন্যে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। যিনি আগের দিনের উপস্থাপিত সমস্ত অধিবেশন থেকে গুরত্বপূর্ণ একটি শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর ৫ মিনিট সময় বক্তব্য রাখবেন। বক্তব্যের মূল বিষয় হবে বিষয়টি কী, কেন গুরত্বপূর্ণ এবং কীভাবে তা ভবিষ্যতে কাজে লাগাবেন।
- একইভাবে প্রশিক্ষক আর একজন প্রশিক্ষণার্থীকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করবেন যিনি গত দিনের সমস্ত বিষয়গুলো সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১৫ মিনিট সময় ধরে পুনরালোচনা করবেন।
- উপরোক্ত দু'জন উপস্থাপকের সার্বিক উপস্থাপনার ওপর ১০ মিনিট সময়ে প্রথমে সকল প্রশিক্ষণার্থী ও পরে প্রশিক্ষক ভাল ও মন্দ প্রতিভাব দেবেন।
- কোন অংশগ্রহণকারীর গতদিনের আলোচনায় কোন বিষয়ে জানতে বা বুঝতে অসুবিধা হলে তা সংশোধন করে নিন।

খ. সান্ধ্যকালীন/বৈকালিক কাজের উপস্থাপন

- পূর্ব দিনে প্রদত্ত সান্ধ্যকালীন অনুশীলনী সঠিক ভাবে জেনে নিন।
- কীভাবে উপস্থাপন করবেন তা নির্ধারণ করুন।
- কে উপস্থাপন করবেন তা নির্ধারণ করুন।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থাপন, আলোচনা ও প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষ করুন।

ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স

গ্রাফিটি বোর্ড

(একক কাজ)

এ অনুশীলনীর উদ্দেশ্য হলো কোর্সের বিভিন্ন কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও প্রতিভাবের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে স্বাচ্ছন্দময় পরিবেশে সফলভাবে কোর্স পরিচালনায় প্রশিক্ষক প্রয়োজনীয় মতামত পেতে পারেন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

- কোর্সে সার্বিক কার্যক্রমের ওপর কোন মতামত বা পরামর্শ থাকলে তা গ্রাফিটি বোর্ড (Graffiti Board)-এ লিপিবদ্ধ করুন। প্রশিক্ষক প্রতিদিন গ্রাফিটি বোর্ড দেখবেন এবং উল্লিখিত মতামতের প্রতিভাব দেবেন।

ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স

মুড মিটার

প্রতিদিনের অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণের মনোভাব, অর্থাৎ তাঁরা ঐ দিনের অধিবেশনসহ সামগ্রিকভাবে তাঁদের সন্তুষ্টির বিষয়টি 'মুড মিটারের' মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন। সহায়তাদানকারী আর্ট শিটে ছবির মাধ্যমে তিন ধরনের সন্তুষ্টির বিষয় উপস্থাপন করবেন। প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রত্যেকে প্রতিদিন অধিবেশন শেষে টিক (√) চিহ্নের মাধ্যমে তা পূরণ করবেন।

দিন			
১ম			
২য়			
৩য়			

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	অধিবেশন নং- ০১	সময়: ০৯:৩০-১০:৩০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম সমূহ

অভীষ্ট দল: **বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনুমোদিত সুফলভোগী জেলে**

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর পাশাপাশি প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্ক জানানো যাতে তারা প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয় বলতে পারে।

উদ্দেশ্য *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –*

- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী তা জানতে পারবে।
- প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ কী তা জানতে পারবে।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			১০ মিনিট
	• চলতি অধিবেশনের সাথে গত অধিবেশনের সংযোগ স্থাপন; • বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা; • বর্তমান অধিবেশনের শিক্ষণ উদ্দেশ্যের বর্ণনা; এবং • উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৪০ মিনিট
	• প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য • প্রকল্পের প্রধান পধান কার্যক্রম	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	• শিক্ষণীয় মূল বিষয়ের পুনরালোচনা; • অধিবেশনের উদ্দেশ্য- যাচাই; হ্যান্ড আউট বিতরণ ও পড়ানো; • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত; এবং • ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ এবং নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় ও আমিষ সরবরাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ (প্রায় ১২.২২ ভাগ) এবং জিডিপিতে অবদান ১%এর বেশী। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস হচ্ছে ইলিশ। প্রায় ৬.০ লক্ষ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে জড়িত। বিশ্বে ইলিশ আহরণকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন শীর্ষে। সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের প্রায় ৮০ শতাংশ আহরিত হয় এ দেশের নদ-নদী থেকে।

এক সময় দেশের প্রায় সকল নদ-নদী এবং নদীসমূহের শাখা ও উপনদীতেও প্রচুর পরিমাণ ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। বন্যা বা প্লাবনের বছরে নদীর সাথে সংযোগ আছে এমন সব বিল ও হাওরেও ইলিশ মাছ কখনও কখনও পাওয়া যেত। গুরুত্বপূর্ণ এই মৎস্য সম্পদ আশির দশকে সংকটে পড়ে। আশির দশকের পূর্বে মোট মৎস্য উৎপাদনের ২০% ছিল ইলিশের অবদান। ২০০২-০৩ সালে ইলিশের অবদান দাঁড়ায় জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ৮% (১.৯৯ লক্ষ মে.টন)। ইলিশ উৎপাদনের গতিধারায় লক্ষ্য করা যায় যে, বিগত ২০০০-০১ সালে ইলিশের উৎপাদন ২.২৯ লক্ষ মে.টন থাকলেও ২০০১-০২ ও ২০০২-০৩ সালে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ২.২০ লক্ষ মে.টন এবং ১.৯৯ লক্ষ মে.টনে পৌঁছে। প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট উভয় কারণেই ইলিশের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। এর অন্যতম কারণ হলো অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে বিশেষ করে বিভিন্ন নদ-নদীতে অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ ও কালভার্ট/ব্রীজ নির্মাণের কারণে এবং উজান হতে পরিবাহিত পলি জমার জন্য পানি প্রবাহ ও নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে এবং জলজ পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ছে। ফলে ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ পথ, প্রজননক্ষেত্র, বিচরণ ও চারণক্ষেত্র (ফিডিং ও নার্সারি গ্রাউন্ড) দিন দিন পরিবর্তিত ও বিনষ্ট হচ্ছে এবং অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ইলিশ মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও বর্তমানে ক্রমাগত বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, কর্মসংস্থানের অভাব, অতি কার্যকরী একতন্তু বিশিষ্ট ফাঁস জাল এবং মাছ আহরণের উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন ও নৌকা যান্ত্রিকীকরণের ফলে সামুদ্রিক জলাশয়ে ইলিশ মাছের আহরণ মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের ইলিশ সম্পদ ধ্বংসের এবং উৎপাদন কমে যাওয়ার পিছনে যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নির্বিচারে ক্ষতিকর জাল ও সরঞ্জাম দিয়ে জাটকা ও মা ইলিশ আহরণ। ইলিশের জন্য খ্যাত এক সময়ের পদ্মা, ধলেশ্বরী, গড়াই, চিত্রা, মধুমতি ইত্যাদি নদীতে বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে ইলিশ মাছ প্রায় পাওয়া যায় না বলা যেতে পারে। এসব কারণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নির্বিচারে অবৈধ জাল যেমন- কারেন্ট জাল, বেহুন্দি জাল, বেড় জাল, চরঘেড়া জাল, মশারী জাল, পাইজাল, খুটাজাল ইত্যাদি । যদি এই ক্ষতিকর অবৈধ জাল ও সরঞ্জাম নির্মূল না করা যায় তাহলে ইলিশের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হবে। তাই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের মাধ্যমে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ নদী, মাছ বাজার, মাছ ঘাট, হাট, আড়ৎ ইত্যাদিতে অভিযান পরিচালনা করা অপরিহার্য।

ইলিশ ও জাটকাসহ অন্যান্য ছোট মাছ, পোনা মাছ নির্বিচারে ধ্বংসের অপতৎপরতায় কেবল ইলিশ সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে তা নয় উপকূলীয় ইকোসিস্টেম প্রতিকূল অবস্থায় পড়েছে এবং ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ইলিশ জেলেদের এক বিরাট অংশ বেকার হয়ে যাচ্ছে এবং পরিবার পরিচালনা কঠিন হচ্ছে এবং ইলিশ সম্পদ হ্রাসের কারণে এর আহরণ কমে যাওয়ায় জীবন ধারণ করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। কেননা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আবাসস্থল দূরে ও দুর্গম হওয়ায় সরকারের সেবামূলক কার্যক্রম এবং সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে তাঁদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত। এছাড়াও এ অঞ্চলের জনসাধারণকে প্রায় প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয় অনেক জীবন ও সম্পদের বিনিময়ে। প্রাকৃতিক ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জীবনের নিরাপত্তা বিধান তথা তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে তাঁদের যৌথ উদ্যোগ/প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজন। এভাবে ইলিশ সম্পদ স্থায়িত্বশীল হবে এবং উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অধিক ক্ষমতায়ন ঘটবে। এই প্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য সম্পদ এই জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ইলিশের স্থায়িত্বশীল আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের ইলিশসমৃদ্ধ ২৯ জেলার ১৩৪টি উপকূলীয় উপজেলায় 'ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সমাজের দরিদ্রতার স্তরের অনেক নিচে রয়েছে জেলেদের স্থান। প্রতিদিন তিনবেলা খাবার জোগাড় করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য। আর জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার সময় যখন মাছ ধরা বন্ধ রাখা হয় তখন তাদের কষ্ট চরম শিখরে পৌঁছে। এই দারিদ্র্য নিরসনে প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উপকূলীয় এলাকার ৪০ (চল্লিশ) হাজার জেলে পরিবার স্বাবলম্বী হবে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য বিকল্প অয়ের পথ খুঁজে পাবে যা তাদের দরিদ্রতা হ্রাস করবে। সেই সাথে জেলেসহ অন্যান্য পেশাজীবী জনসাধারণের প্রায় ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) জন ইলিশ ও জাটকা রক্ষা কার্যক্রমের সুফল সম্পর্কে সচেতন হবে। অর্থাৎ প্রকল্প হতে দরিদ্র জেলেরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকারে উপকৃত হবে। ফলে প্রকল্পটি ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণে সহায়তা করার সাথে সাথে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Objectives)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন এবং ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

- মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন এবং অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক জাটকা ও মা ইলিশ আহরণকারী ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার)টি জেলে পরিবারের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; এবং
- জেলেদের ১০০০০ (দশ হাজার)টি বৈধ জাল বিতরণ ও ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

১.৩ প্রকল্পের ফলাফল (Outcome)

মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন এবং ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং পদ্মা নদীসহ অন্যান্য নদীতেও ইলিশের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে। জাটকা আহরণকারী জেলে পরিবারের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। জাটকা ও ইলিশ জেলেদের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টি হবে। ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল গড়ে উঠবে এবং দেশে মাছের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং জাটকা ও ইলিশ জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

১.৪ প্রকল্পের আউটপুট (Output)

- প্রকল্প সমাপ্তির পর ইলিশের উৎপাদন ১৬% বৃদ্ধি;
- মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে ২৩০৪ (দুই হাজার তিনশত) টি জনসচেতনতা সভা ও ৬০ (ষাট)টি কর্মশালা আয়োজিত;
- জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে ১৬৬১৬ (ষোল হাজার ছয়শত ষোল)টি অভিযান/ মোবাইল কোর্ট পরিচালিত;
- মা ইলিশ সংরক্ষণে ১২৭৮ (এক হাজার দুইশত আটাত্তর)টি সম্মিলিত বিশেষ অভিযান পরিচালিত;
- প্রকল্প মেয়াদে ৬ (ছয়)টি জেলার ২৩ (তেইশ)টি উপজেলার ১৫৪ (একশত চুয়ান্ন)টি ইউনিয়ন সংলগ্ন ০৬ (ছয়)টি ইলিশ অভয়াশ্রম ব্যবস্হাপনা;
- ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার)টি জাটকা জেলে পরিবারের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- জেলে পরিবারের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) জন জেলেকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উপকূলীয় ৭ টি জেলা (চাঁদপুর, লক্ষিপুর, নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালি, বরগুনা ও ভোলা) এ ১০,০০০ (দশ হাজার)টি জেলে পরিবারকে ১০,০০০টি বৈধ জাল বিতরণ;
- প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকার ৪.০ (চার) লক্ষ জেলেসহ অন্যান্য পেশাজীবী জনসাধারণের মাঝে জাটকা সংরক্ষণের গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
- মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল, ফিক্সড নেট/ইঞ্জিন অপসারণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জীববৈচিত্রের উন্নয়ন; এবং
- ইলিশ সম্পদের সাথে জড়িত জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

১.৫ প্রকল্পের কার্যাবলি

ইলিশের সহনশীল উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রকল্পে নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে:

- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে এলাকা ভিত্তিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ বিদ্যমান মৎস্য পলিসি/আইন/নীতিমালা/বিধি অনুসরণ করে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন;
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের আওতায় (১) সম্মিলিত বিশেষ অভিযান; (২) বিশেষ অপারেশন; এবং (৩) অভিযান পরিচালনা/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- দরিদ্র জেলেদের সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার)টি জাটকা জেলে পরিবারের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ১০,০০০ (দশ হাজার) টি জেলে পরিবারকে বৈধ জাল বিতরণ;
- প্রকল্প মেয়াদে ৬ (ছয়)টি জেলার ২৩ (তেইশ)টি উপজেলার ১৫৪ (একশত চুয়ান্ন)টি ইউনিয়ন সংলগ্ন ছয়টি ইলিশ অভয়াশ্রম পরিচালনা;
- সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ১০৭২ (এক হাজার বাহাত্তর)টি জনসচেতনতা সভা করার পাশাপাশি পোস্টার, লিফলেট, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, ভিডিও ডকুমেন্টরিসহ নানা প্রকার প্রচারণামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- জেলে পরিবারের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১৮,০০০ (আঠারো হাজার) জন জেলেকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন জোরদার করার জন্য ১৯ (উনিশ) টি হাই স্পীড এফআরপি বোট ক্রয় ও সরবরাহ; এবং

- প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কর্মশালার আয়োজন।

১.৬ প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটি দেশের ৬ টি বিভাগের ২৯ (উনত্রিশ) টি জেলার ১৩৪ (একশত চৌত্রিশ) টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রধান কার্যক্রম মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি ২৯ (উনত্রিশ)টি জেলার ১৩৪ (একশত চৌত্রিশ)টি উপজেলায় এবং জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপকরণ সহায়তা কার্যক্রম ২৭ (সাতাশ)টি জেলার ১০৭ (একশত সাত)টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।এছাড়া উপকূলীয় ১৪টি জেলার ৭১টি উপজেলায় কম্বিং অপারেশন নামে বিশেষ সম্মিলিত অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। উপকূলীয় নদ-নদী থেকে অবৈধ জাল নির্মূলে ৭টি জেলায় (চাঁদপুর, লক্ষিপুর, নোয়াখালি, বরিশাল, পটুয়াখালি, ভোলাও বরগুনা) ১০,০০০টি বৈধ জাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রঃ নং	বিভাগ	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলা সমূহের নাম
১	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৬	মীরসরাই, সীতাকুন্ড, বাঁশখালী, আনোয়ারা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনসহ
		কক্সবাজার	৩	কক্সবাজার সদর, মহেশখালী, কুতুবদিয়া
		ফেনী	১	সোনাগাজী
		লক্ষ্মীপুর	৪	লক্ষ্মীপুর সদর, রামগতি, কমলনগর, রায়পুর
		চাঁদপুর	৬	চাঁদপুর সদর, মতলব উত্তর, মতলব দক্ষিণ, হাইমচর, ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ
		নোয়াখালী	৪	নোয়াখালী সদর, সুবর্ণচর, হাতিয়া, কোম্পানিগঞ্জ
২	বরিশাল	পটুয়াখালী	৮	পটুয়াখালী সদর, কলাপাড়া, রাঙ্গাবালী, বাউফল, দশমিনা, গলাচিপা, মির্জাগঞ্জ, দুমকি
		ভোলা	৭	ভোলা সদর, চরফ্যাশন, তজুমদ্দিন, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা
		বরগুনা	৬	বরগুনা সদর, পাথরঘাটা, আমতলী, বামনা, তালতলী, বেতাগী
		বরিশাল	১০	বরিশাল সদর, মেহেন্দিগঞ্জ, হিজলা, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, মুলাদী, বানারীপাড়া, গৌড়নদী, উজিরপুর, আগৈলঝড়া
		ঝালকাঠি	৪	ঝালকাঠি সদর, কাঁঠালিয়া, রাজাপুর, নলছিটি
		পিরোজপুর	৭	পিরোজপুর সদর, মঠবাড়িয়া, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ, জিয়ানগর, নাজিরপুর, কাউখালী
৩	ঢাকা	ঢাকা	৫	ঢাকা মহানগর, দোহার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ
		মাদারীপুর	৩	মাদারীপুর সদর, কালকিনি, শিবচর
		নারায়ণগঞ্জ	৩	আড়াইহাজার, সোনারগাঁও, বন্দর
		মানিকগঞ্জ	৪	মানিকগঞ্জ সদর, শিবালয়, হরিরামপুর, দৌলতপুর
		মুন্সীগঞ্জ	৫	মুন্সীগঞ্জ সদর, গজারিয়া, শ্রীনগর, লৌহজং, টঙ্গীবাড়ি
		শরীয়তপুর	৬	শরীয়তপুর সদর, গোসাইরহাট, ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া, জাজিরা, ডামুড্যা
		ফরিদপুর	৪	ফরিদপুর সদর, সদরপুর, চরভদ্রাসন, মধুখালী
		রাজবাড়ী	৪	রাজবাড়ী সদর, গোয়ালন্দ, পাংশা, কালুখালী
		নরসিংদী	৩	নরসিংদী সদর, রায়পুরা, মনোহরদী
৪	ময়মনসিংহ	জামালপুর	৪	ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, সরিষাবাড়ী
৫	খুলনা	খুলনা	৫	বটিয়াঘাটা, দিঘলিয়া, রূপসা, তেরখাদা, দাকোপ
		বাগেরহাট	৪	মংলা, মোড়েলগঞ্জ, শরণখোলা, কচুয়া
		কুষ্টিয়া	৫	সদর, দৌলতপুর, কুমারখালী, ভেড়ামারা, মিরপুর
৬	রাজশাহী	রাজশাহী	৪	বাঘা, পবা, চারঘাট, গোদাগাড়ী
		নাটোর	১	লালপুর
		পাবনা	৪	পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, বেড়া, সুজানগর
		সিরাজগঞ্জ	৪	সিরাজগঞ্জ সদর, বেলকুচি, কাজিপুর, চৌহালি
মোট	৬টি বিভাগ	২৯ টি জেলা	১৩৪ টি উপজেলা	

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	অধিবেশন নং- ০২	সময়: ১১:০০-১২:০০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: ইলিশের গুরুত্ব, বিস্তৃতি, জীববিদ্যা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

অভীষ্ট দল: **বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনুমোদিত সুফলভোগী জেলে**

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের আলোকে ইলিশ মাছের গুরুত্ব, ইলিশের বিস্তৃতি ও ইলিশের বর্তমান উৎপাদন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া যাতে তারা ইলিশ সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

উদ্দেশ্য *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ*

- ইলিশ সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ইলিশ মাছের বিস্তৃতি বর্ণনা করতে পারবে এবং
- ইলিশের জীবন বৃতান্ত জানতে পারবে জানতে পারবে
- ইলিশ অভয়াশ্রম ও প্রজনন ক্ষেত্র সম্পর্ক জানতে পারবে
- অভয়াশ্রম ও প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক জানতে পারবে

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			১০ মিনিট
	• চলতি অধিবেশনের সাথে গত অধিবেশনের সংযোগ স্থাপন; • বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা; • বর্তমান অধিবেশনের শিক্ষণ উদ্দেশ্যের বর্ণনা; এবং • উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৪০ মিনিট
	• জাতীয় অর্থনীতিতে ইলিশ মাছের গুরুত্ব ও অবদান • ইলিশ মাছের বিস্তৃতি • ইলিশের জীববিদ্যা • ইলিশ অভয়াশ্রম ও প্রজনন ক্ষেত্র • অভয়াশ্রম ও প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	• শিক্ষণীয় মূল বিষয়ের পুনরালোচনা; • অধিবেশনের উদ্দেশ্য- যাচাই; হ্যান্ড আউট বিতরণ ও পড়ানো; • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত; এবং • ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, ফ্লিপচার্ট, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদে ইলিশ মাছের গুরুত্ব ও বিস্তৃতি

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৫৭ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২৫.৭২ শতাংশ মৎস্য উপখাত থেকে আসে। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে মৎস্য উপখাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২৮ শতাংশ। দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ১.২৩ শতাংশ আসে মৎস্য উপখাত থেকে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬২ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। দেশের মানুষ মাথাপিছু দৈনিক ৬০ গ্রাম চাহিদার বিপরীতে বর্তমানে ৬২ গ্রাম মাছ গ্রহণ করছে। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ১২ শতাংশ এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের পরিমান ছিল প্রায় ৪৫.০৩ লক্ষ মে.টন, যার মধ্যে ইলিশ উৎপাদিত হয় প্রায় ৫.৫০ লক্ষ মে.টন।

ইলিশ মাছের গুরুত্ব

- ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ চিরায়ত বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে ইলিশ মাছ। যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালীর রসনা মেটানোর পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আমিষ সরবরাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম।
- দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ ।
- ভৌগলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে "বাংলাদেশ ইলিশ" সমাদৃত।
- উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জীবিকার প্রধান উৎস হচ্ছে ইলিশ। প্রায় ৬.০ লক্ষ লোক ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবহন, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, বরফায়ন, সরঞ্জাম তৈরি ইত্যাদি কাজে জড়িত।
- সারা বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের সর্বাধিক আহরিত হয় এদেশের সমুদ্র ও অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয় থেকে।
- ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ইলিশ উৎপাদিত হয়েছে ৫.৫০ লক্ষ মে.টন।
- খাদ্যমানের দিক থেকে ইলিশ বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্বাদু মাছ । এ মাছে উচ্চমাত্রায় আমিষ (২১.৮%), চর্বি (১৯.৪%) ও খনিজ পদার্থ (০.৬৩%) রয়েছে। ইলিশ মাছের চর্বিতে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড থাকে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

বাংলাদেশে ইলিশ মাছের বিস্তৃতি

- বাংলাদেশে ইলিশ মাছের বিস্তৃতি ব্যাপক। একসময় দেশের প্রায় সকল প্রধান নদ-নদী এবং নদীসমূহের শাখা নদীতেও প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত।
- বর্তমানে দেশের প্রায় সকল নদ-নদীতে ইলিশ ও জাটকা পাওয়া যায় এবং প্রধান আহরণ এলাকা হচ্ছে মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চল, তেঁতুলিয়া, কালাবদর বা আড়িয়াল খাঁ (নিম্ন অংশ), ধর্মগঞ্জ, নয়াডাংগানি ইত্যাদি নদী এবং মোহনা ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল। এ সকল এলাকায় প্রায় সারা বছর ইলিশ ধরা পড়ে ।

ইলিশ মাছের সামগ্রিক উৎপাদন

- বঙ্গোপসাগরের উপকূল তথা বাংলাদেশ, ভারত এবং মায়ানমারে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে ধরা পড়ে। সার্বিকভাবে সারা বিশ্বে ইলিশ মাছের উৎপাদন প্রায় ৫.০-৬.০ লক্ষ টন। এর মধ্যে বাংলাদেশে ৮৬%, ভারতে ১০%, মায়ানমারে ৩%, এবং অবশিষ্ট ১% ইরান, ইরাক, কুয়েত ও পাকিস্তানে ধরা পড়ে।

ইলিশ উৎপাদনের গতিধারা

এক সময় দেশের প্রায় সকল নদ-নদী এবং নদীসমূহের শাখা ও উপনদীতেও প্রচুর পরিমান ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। বন্যা বা প্লাবনের বছরে নদীর সাথে সংযোগ আছে এমন সব বিল ও হাওরেও ইলিশ মাছ কখনও কখনও পাওয়া যেত। গুরুত্বপূর্ণ এই মৎস্য সম্পদ আশির দশকে সংকটে পড়ে। আশির দশকের পূর্বে মোট মৎস্য উৎপাদনের ২০% ছিল ইলিশের অবদান। ২০০২-২০০৩ সালে ইলিশের অবদান দাঁড়ায় জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ৮% (১.৯৯ মে.টন)। ইলিশ উৎপাদনের গতিধারায় লক্ষ্য করা যায় যে, বিগত ২০০০-২০০১ সালে ইলিশের উৎপাদন ২.২৯ মে.টন থাকলেও ২০০১-০২ ও ২০০২-০৩ সালে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ২.২০ মে.টন এবং ১.৯৯ মে.টনে পৌঁছে। ২০১২-১৩ আর্থিক সাল থেকে মৎস্য অধিদপ্তর ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে যেমনঃ জাটকা সংরক্ষণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলেদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকরণ

সহায়তা প্রদান, প্রতি বছর জাটকা আহরণ থেকে বিরত রাখতে চারমাস ব্যাপী পরিবার প্রতি ৪০ কেজি হারে এবং মা ইলিশ সংরক্ষণে ২২ দিন মাছ আহরণ বন্ধ থাকায় ২০ কেজি হারে প্রতি জেলে পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া অবৈধ জাল যেমন- কারেন্ট জাল, বেহন্দি জাল, বেড় জাল, চর ঘড়া জাল, মশারী জাল, পাইজাল ইত্যাদি অপসারণে বিশেষ অভিযান পরিচালনাসহ বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হয়। সারা বছর জেলেদের নিয়ে ইলিশের স্থায়ীত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ, গণসচেতনতা সভা, উদ্বুদ্ধকরন সভা, লিফলেট, পোস্টার, টিভি স্পট ও ভিডিও প্রচারসহ সভা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ফলশ্রুতিতে বিগত কয়েক বছরে ইলিশের আশানুরুপ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর ৩.৫% হারে বৃদ্ধি এবং ২০১৫ সালের পরে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৩.৫% হতে ৯.০% এ উন্নীত হয়েছে।

লোকজ সাহিত্য সংস্কৃতিতে ইলিশ উৎপাদন সম্পৃক্ততা

প্রাচীন বাংলা সংস্কৃত সাহিত্য এবং লোকজ সংস্কৃতিতে ইলিশ মাছের স্বাদ, খাওয়ার পদ্ধতি এবং সংরক্ষণের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। মাছের রাজা ইলিশ অর্থাৎ সকল মাছের মধ্যে ইলিশ মাছই শ্রেষ্ঠ এ কথা বাঙ্গালীর মুখে মুখে প্রতিষ্ঠিত।প্রাচীনকালে লোকজনের বিশ্বাস ছিল যে, আশ্বিন-কার্তিক মাসের দুর্গা পূজার দশমির দিন হতে মাঘ-ফাল্গুন মাসের শ্রী পঞ্চমী (সরস্বতী পূজার দিন পর্যন্ত ইলিশ মাছ ধরা বন্ধ রাখা হলে ইলিশ মাছ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। এমনকি মানুষের বিশ্বাস ছিল উক্ত ৪ মাসে ইলিশ মাছ ধরা এবং খাওয়া বন্ধ থাকলে মানুষের সুনাম (Fame), শক্তি (Strength), দীর্ঘ জীবন (Long life) এবং মহিমা বা গৌরব (Glory) বৃদ্ধি পাবে।

ইলিশ মাছের জীববিদ্যা

ইলিশ মাছের পরিভ্রমণ

ইলিশ মাছ সাধারণত সমুদ্রের লবণাক্ত পানি হতে মিঠা পানিতে এবং মিঠা পানি হতে সমুদ্রে চলাচল করে থাকে। ইলিশ মাছের চলাচলের ধারা হতে দেখা যায় যে, সাগরের ইলিশ মিঠা পানিতে এবং মিঠা পানি হতে একই মাছ সাগরে পরিভ্রমণ করে থাকে। সাধারণত উপকূলীয় এলাকায় ইলিশ মাছের ঝাঁক (স্কুলিং) হয়। মোহনা এলাকা হতে নদনদীর প্রায় ১২০০-১৩০০ কি.মি. উর্ধ্বেও ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। গঙ্গা এবং কয়েকটি বড় নদীতে ইলিশ মাছ স্থায়ীভাবে বসবাস করে। ইলিশ মাছ অত্যন্ত দ্রুত সাঁতার কেটে থাকে। দিনে প্রায় ৭১কি.মি. পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে পারে।

ইলিশ মাছের বৃদ্ধির হার

ইলিশ মাছের বয়স ও বৃদ্ধির হার পর্যালোচনায় দেখা যায়, অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর ন্যায় কম বয়সে ইলিশ মাছ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের বয়স ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার পর বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে পরবর্তীতে শূন্য পর্যায়ে উপনীত হয়। ইলিশ মাছ ১ বছর বয়সে গড়ে প্রায় ২.৩ হতে ২.৬ সে.মি. ২ বছর বয়সে প্রায় ১.৮ হতে ২.০ সে.মি. এবং ৩ বছর বয়স পর্যন্ত গড়ে প্রায় ০.৭৫ সে.মি. প্রতি মাসে বৃদ্ধি পায়। ইলিশ মাছের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৫৭-৫৮ সে.মি. পৌঁছাতে প্রায় ৫-৬ বছর সময় লাগে। এ মাছের বয়স ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার পর তুলনামূলক বৃদ্ধির হার দ্রুত হ্রাস প্রায় এবং পরবর্তী সময়ে তেমন বৃদ্ধি পায় না। এ মাছের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যে পৌঁছাতে ৫-৬ বছর লাগে বলে এদের আয়ু ৫-৬ বছর বা মধ্যম আয়ুর মাছ বলা যেতে পারে। একই ইলিশ মাছ একাধিকবার সমুদ্র হতে নদনদীতে আসে বিধায় দ্রুত বর্ধনশীল ছোট মাছ ধরা বন্ধ করা হলে প্রাকৃতিকভাবে এ মাছের উচ্চ উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে।

ইলিশ মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

ইলিশ মাছের গীল রেকার প্রায় চালুনির মতো। তাই খাদ্যের তালিকায় কোনো নৈর্বাচনিকতা নেই। ইলিশ মাছ মূলত প্লাংটন ভোজী। ইলিশ মাছের খাদ্য তালিকায় অ্যালজি ৪১.৬৫%, বালুকণা-৩৬.২৮%, ডায়াটম-১৫.৩৬, রটিফার-৩.১৯%, ক্রাস্টাসিয়া-১.৮৯%, প্রোটোজোয়া ১.২২% এবং মিশ্র দ্রব্যাদি ০.৪১% পাওয়া গিয়েছে। ইলিশ মাছের আকার, বয়স ও পরিবেশভেদে খাদ্য গ্রহণের মাত্রার তারতম্য হয়ে থাকে। প্রজনন ঋতুতে খাদ্য গ্রহণ থেকে প্রায় বিরত থাকে।

ইলিশ মাছের পরিপক্কতার বয়স

ইলিশ মাছের গোনাডের হিস্টোলজিকাল বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, সাধারণত ১৮ মাস বয়সে ইলিশ মাছ পরিপক্কতা লাভ করে। তবে আবহাওয়ার তারতম্য ও অন্যান্য কারণে অনেক সময় ৮-১০ মাস বয়সেও ইলিশ মাছ পরিপক্ক হতে পারে।

পুরুষ-স্ত্রী ইলিশ মাছের অনুপাত

পূর্বে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল পুরুষ এবং স্ত্রী ইলিশ মাছের আনুপাতিক হার ১:১। সাম্প্রতিককালের গবেষণায় এ ধারণাটি ভুল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। স্থান, কাল, আকার ও প্রজাতিভেসে পুরুষ-স্ত্রী ইলিশ মাছের আনুপাতিক হার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। জিইএফ স্টাডিজের অধীনে ইলিশ মাছ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সার্বিকভাবে পুরুষ-স্ত্রী ইলিশ মাছের আনুপাতিক হার ১:২ পাওয়া গিয়েছে। জাটকা বা কিশোর বয়সে স্ত্রী-পুরুষ মাছের আনুপাতিক হার প্রায় সমান (১ : ১) এবং এ হার ২৮-৩০ সে.মি. পর্যন্ত বলবৎ থাকে। অতঃপর স্ত্রী মাছের আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পায় এবং ৮৮ সে.মি. এর উর্ধ্ব আকারের প্রায় সকল মাছই স্ত্রী হিসেবে পাওয়া যায়। ফলে সর্বোচ্চ আহরণ ও প্রজনন মৌসুমে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাছ ধরা পড়ে বিধায় এ সময় অধিকাংশই স্ত্রী বা ডিমওয়ালা মাছ পাওয়া যায়।

ইলিশের ডিমধারণ ক্ষমতা

ইলিশ মাছের বয়স ও আকারভেদে ডিমধারণ ক্ষমতার তারতম্য হয়ে থাকে এবং দৈর্ঘ্য ও ওজনের সাথে ডিমের পরিমাণ সরাসরি (Directly) সম্পর্কযুক্ত। বড় মাছে বেশি ডিম এবং ছোট মাছে কম সংখ্যক ডিম থাকে। বাংলাদেশে পরিণত ইলিশ মাছের ডিমের সংখ্যা ১.৫-২৩.০ লক্ষ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। দুই বছরের অধিক বয়সের ইলিশ সবচেয়ে বেশী ডিম ধারণ করে থাকে। বিগত ২০০৩ সালে ৪৪.৫ সে.মি. দৈর্ঘ্য এবং ১১০০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ মাছে সর্বোচ্চ ২২.৮৬ লক্ষ টি ডিম পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধু নদের ইলিশ মাছে সর্বোচ্চ ২.১৭লক্ষ টি পর্যন্ত ডিমধারণ করার প্রতিবেদন আছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ র করা সম্ভব হলে প্রাকৃতিকভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণে ইলিশের ডিম এবং পরবর্তীতে জাটকা হিসেবে পাওয়া যেতে পারে।

ইলিশ মাছের প্রজননকাল ও সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম

ইলিশ মাছ প্রায় সারা বছর কম-বেশি প্রজনন করে থাকে। তবে ইলিশ মাছের পরিপকৃতার সূচক (জি. এস.আই) প্রজননক্ষম মাছের পরিমাণ এবং প্রজননোত্তর মাছ (Spent fish) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দু'টি প্রধান যথা অক্টোবর মাস সর্বোচ্চ এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম নিরূপণ করা হয়েছে। তবে অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমার আগে এবং পরে ইলিশের ডিমের ব্যাস (Egg dia meter) ও পরিপক্বতার মান সর্বোচ্চ পাওয়া গিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে অন্য কয়েকটি মাসে ইলিশ মাছের পরিপক্বতার সূচক উচ্চ মাত্রায় পাওয়া গেলেও এ সময় ডিমের ব্যাস সর্বোচ্চ পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র ডিমের ব্যাস সর্বোচ্চ হলেই আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে ইলিশ মাছ ডিম ছেড়ে থাকে। আমাদের দেশের জেলেদেরও ধারণা ইলিশ মাছ বড় পূর্ণিমার (দুর্গা পূজার পূর্ণিমা) সময়ই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ডিম ছাড়ে।

ইলিশের প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র

ইলিশ মাছ বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রধান প্রধান নদনদী, মোহনা এবং উপকূলীয় এলাকায় ডিম ছেড়ে থাকে। তবে বিভিন্ন তথ্যের ওপর নির্ভর করে মেঘনা নদীর চলচর, মনপুরা দ্বীপ, মৌলতীর চর ও কালির চর এলাকাকে ইলিশের প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব এলাকায় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পরিপক্ব ও ডিম নির্গত অবস্থার মাছ সমুদ্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের সময় প্রবেশ করে। অন্যান্য সময় এখানে ইলিশ মাছের এত ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যায় না। জেলেদের হাতে এ সময় প্রচুর পরিমাণে ডিম নির্গত অবস্থার ইলিশ মাছ ধরা পড়ে এবং পানি খুব ঘোলাটে ও প্রবল জোয়ার-ভাটা থাকে। উক্ত ০৪ (চার) টি প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রের ব্যাপ্তি ভৌগোলিক অবস্থান নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো।

- ঢলচর দ্বীপ (চর ফ্যাশন, ভোলা) প্রায় ১২৫ বর্গকিলোমিটার (২১°৪২'-২১°৫৫' N এবং ৯০° ২০', ৯০° ৫৩'- ৯০°- ৫০' E
- মনপুরা দ্বীপ সংলগ্ন এলাকা প্রায় ৮০ বর্গকিলোমিটার (৯১°১২'-৯১° ২০' এবং ২২°০০-২২°১৫'N)
- মৌলভীর চর দ্বীপ সংলগ্ন এলাকা প্রায় ১২০বর্গকিলোমিটার (২১°৫৩-১২°০৩' N এবং ৯১°১৭-৯১°২৭' E)
- কালিরচর দ্বীপ সংলগ্ন এলাকা প্রায় ১৯৪ বর্গকিলোমিটার

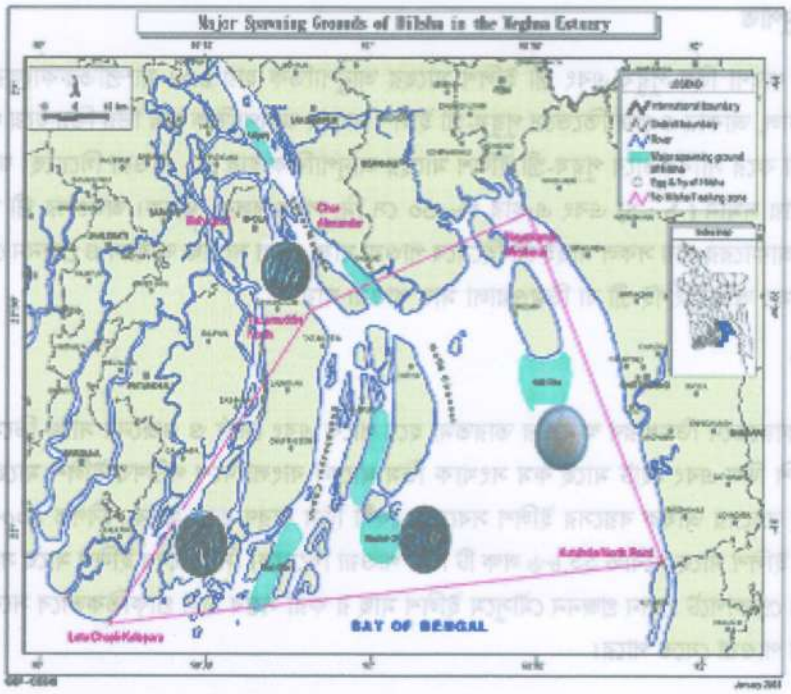

চিত্র: বাংলাদেশে ইলিশ মাছের প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র

ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র

আমাদের দেশে প্রায় সারা বছর ইলিশ মাছ ধরা হলেও প্রতিবছর আগস্ট হতে অক্টোবর মাসে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে (৬০-৬৫%) ধরা পড়ে। উক্ত সময়ে প্রায় ৭০-৮০% মাছ পূর্ণমাত্রায় পরিপক থাকে এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমার জো এর সময় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ডিম ছেড়ে থাকে। বছরের পর বছর ক্রমাগতভাবে এ সময়ে ব্যাপকভাবে পরিপক্ব মাছ ধরার ফলে প্রাকৃতিকভাবে ইলিশ মাছের ডিম উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। কাজেই প্রাকৃতিকভাবে ইলিশ মাছের অধিক ডিম উৎপাদনের জন্য সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বড় পূর্ণিমার জোর সময় প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রে কিছুদিন মাছ আহরণ বন্ধ রাখা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে মেঘনা নদীর মোহনায় ইলিশ মাছের প্রধান প্রজনন এলাকায় প্রতি বছর অক্টোবর বা আশ্বিন-কার্তিক মাসের বড় পূর্ণিমার আগে- পরে মোট ২২ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ আইন প্রণয়ন করে প্রজনন ক্ষেত্র ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত প্রজনন ক্ষেত্রের সীমানা নিম্নরূপঃ

উত্তর-পশ্চিম : উত্তর তজমুদ্দিন/পশ্চিম সৈয়দ আওলিয়া পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ৯০°৪৯′১২.০০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২২°১৯′৫৬.৪০" উত্তর অক্ষাংশ);

উত্তর-পূর্ব : শাহের খালী/ হাইতকান্দী পয়েন্ট, মীরসরাই (জিপিএস পয়েন্ট ৯১°২৮′৫৫.২০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২২°৪২′৫৭.৬০" উত্তর অক্ষাংশ);

দক্ষিণ-পশ্চিম : লতা চাপালি পয়েন্ট, কলাপাড়া (জিপিএস পয়েন্ট ৯০°১২′৩৯.৬০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২১°৪৭′৫৬.৪০" উত্তর অক্ষাংশ);

দক্ষিণ-পূর্ব : উত্তর কুতুবদিয়া/ গন্ডামারা পয়েন্ট (জিপিএস পয়েন্ট ৯১°৫২′৫১.৬০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২১°৫৫′১৯.০০" উত্তর অক্ষাংশ)।

উক্ত চারটি পয়েন্ট চারটি সরলরেখা দ্বারা যোগ করা হলে প্রায় ৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি আয়তকার ক্ষেত্র পাওয়া যাবে। উক্ত ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে প্রতি বছর অক্টোবর বা আশ্বিন-কার্তিক মাসের বড় পূর্ণিমার আগে-পরে মোট ২২ দিন ইলিশ মাছ ধরা বা এ উদ্দেশ্যে যে কোনো প্রকার জাল ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এ আইন অমান্য করে ইলিশ মাছ ধরা হলে জাল-নৌকা বাজেয়াপ্ত এবং কারাবাস ও জরিমানার বিধান করা হয়েছে। আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়নের জন্য নেভি ও কোস্ট গার্ড নিয়োজিত সহ মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় আইন বাস্তবায়ন করা হয়

ইলিশ অভয়াশ্রম

অভয়াশ্রম হচ্ছে নিরাপদ আবাস্থল। ইহা নির্ধারিত সীমানার সংরক্ষিত এলাকা, যেখানে কাঙ্ক্ষিত প্রজাতি বা প্রজাতিসমূহ ধরা পড়া বা কোন প্রকারের বাধা বিপত্তি ছাড়াই জীবনচক্র সমাধা করতে বা জীবন চক্রের বিশেষ কোন একটি সময় অতিবাহিত করতে পারে। অভয়াশ্রম এক বা একাধিক প্রানীর আপদকালীন আশ্রয়স্থল, যখন বেশীর ভাগ এলাকা ঐ প্রাণীর/প্রাণীকূলের জন্য বৈরী হয়ে পড়ে। অভয়াশ্রম স্থায়ী বা মৌসম ভিত্তিক হতে পারে। উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণ এবং টেকসই উপাদান ব্যবস্থার জন্য অভয়াশ্রম একটি পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। মৎস্য অভয়াশ্রম হলো মাছের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ইহা একটি সংরক্ষিত জলাশয় বা জলাশয়ের অংশবিশেষ যা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাধীনে ঘোষনা দিয়ে মৎস্য আহরণ থেকে মুক্ত রাখা হয়। ইহা মৎস্য ব্যবস্থাপনার পরীক্ষিত কৌশল যা ঘোষনা বা আইন সৃজনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জলাশয়ের সর্ম্পূণ অংশ অথবা অংশ বিশেষ অভয়াশ্রমের আওতায় আনা হয়। অভয়াশ্রম ঘোষণার মাধ্যমে সারা বছর বা বছরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করা জলাশয়কে মাছের নিরুপদ্রপ আবাস্থাল, প্রজনন বা লালন-পালন ক্ষেত্র হিসেবে রক্ষা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ইলিশ মাছের পোনা বা জাটকা রক্ষার জন্য দীর্ঘ অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ইলিশ মাছের প্রজনন নিশ্চিত করতে স্বল্প সময় মেয়াদে ইলিশ মাছের প্রজনন নিশ্চিত করতে স্বল্প সময় মেয়াদে ৬টি প্রজনন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ইলিশ অভয়াশ্রম হচ্ছে জলাশয়ের কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা আবাসস্থল যেখানে জাটকা বা ইলিশ মাছ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে চলাচল ও বসবাস করতে পারে। অভয়াশ্রম ঘোষিত এলাকায় সারা বছর অথবা কোন নির্দিষ্ট মৌসুমে মাছ ধরা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। কোন জলাশয়ের মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সহজতম ও কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা ইলিশসহ অন্যান্য মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাটকা মাছের প্রধান বিচরণক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত নিম্নের ছয়টি এলাকাকে ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। অভয়াশ্রমের এলাকা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ইলিশ অভয়াশ্রমের এলাকা	মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়
১	চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষ্মীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার (মেঘনা নদীর নিম্ন অববাহিকায় ১০০ কিমি এলাকা)	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
২	ভোলা জেলার মদনপুর/চর ইলিশা হতে চর পিয়াল (মেঘনা নদীর শাহবাজপুর শাখার ৯০ কিমি এলাকা)	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
৩	ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তম (তেঁতুলিয়া নদীর প্রায় ১০০ কিমি এলাকা)	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিমি এলাকা	প্রতি বছর নভেম্বর হতে জানুয়ারি
৫	শরীয়তপুর জেলার নিম্ন পদ্মার ২০ কিমি এলাকা ।	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
৬	বরিশাল জেলার হিজলা, মেদেন্দীগঞ্জ ও বরিশাল সদর উপজেলার কালাবদর, গজারিয়া ও মেঘনা নদীর প্রায় ৮২ কিলোমিটার এলাকা।	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল

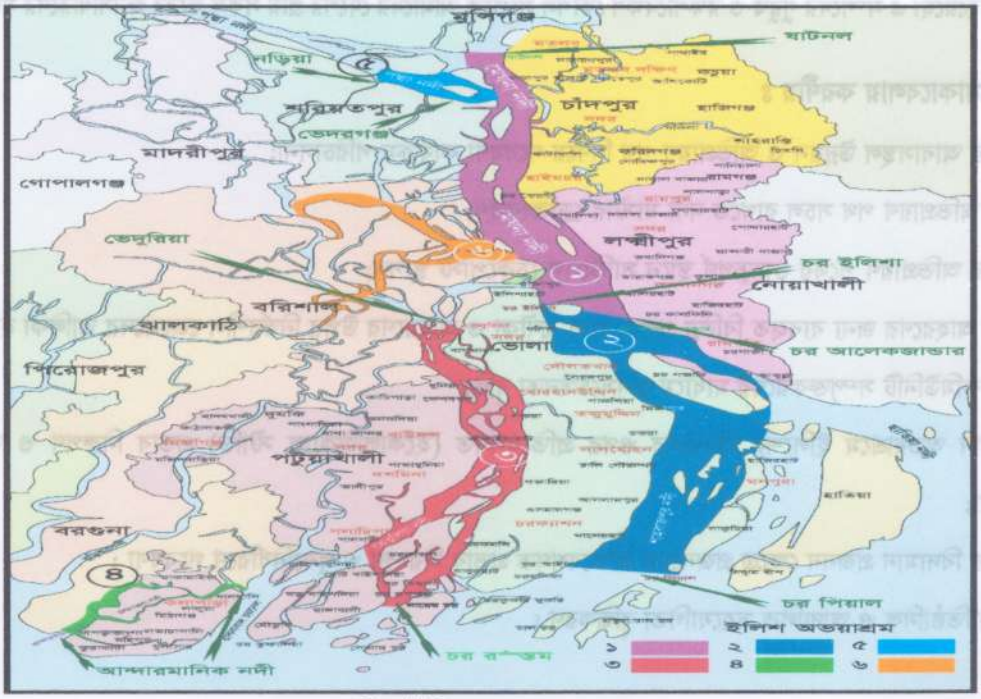

চিত্র: ইলিশ অভয়াশ্রম সমূহ

ইলিশ অভয়াশ্রম হচ্ছে জলাশয়ের কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা আবাসস্থল যেখানে জাটকা বা ইলিশ মাছ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে চলাচল ও বসবাস করতে পারে। অভয়াশ্রম ঘোষিত এলাকায় সারা বছর অথবা কোনো নির্দিষ্ট মৌসুমে মাছ ধরা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। কোনো জলাশয়ের মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সহজতম ও কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা। ইলিশসহ অন্যান্য মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রধান বিচরণক্ষেত্র হিসেবে ইতোমধ্যে সারা দেশে ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। এই ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম দেশের ৬টি জেলার ২৪টি উপজেলার ৪৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীতে স্থাপিত হয়েছে। এই ৬ টি অভয়াশ্রমকে ঘিরে ১৫৪ টি ইউনিয়নের অসংখ্য জেলেদের জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে। ভয়াশ্রম সংরক্ষণে মাছ আহরণ বন্ধ রাখা অধিকতর কার্যকর করার জন্য ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প থেকে নিম্নোক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে:

১. অভয়াশ্রমসমূহে মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ের পূর্বে প্রতিটি ইউনিয়নের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সকল মাছ ধরার নৌকাকে আটকে রাখার ব্যবস্থা প্রকল্প হতে করা হয়। এর ফলে অভয়াশ্রম গুলোতে অবৈধ মাছ আহরণ অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। প্রকল্পের সুফলভোগী জেলেরা পালাক্রমে অভয়াশ্রম গুলো পাহারা দিবেন যাতে নিষিদ্ধ সময়ে কেউ মাছ ধরার সুযোগ নিতে না পারে। ইউনিয়ন পর্যায়ে নৌকা ব্যবস্থাপনা ও পাহারা দেয়ার কাজটি জেলা ও উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সহায়তায় সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২. অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট জেলে গ্রাম গুলোতে নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ধরা বন্ধের লক্ষ্যে প্রকল্প হতে বিভিন্ন প্রকার সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমন- সচেতনতা সভা, পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, মাইকিং-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, মসজিদ ইত্যাদি স্থানে প্রকল্প হতে সচেতনতা সভার আয়োজন করা হচ্ছে।

৩. প্রতি অভয়াশ্রমে প্রকল্প মেয়াদে ৫ জন পাহারাদার নিয়োজিত রয়েছে। একাধিক জেলা ও উপজেলায় অভয়াশ্রমের বিস্তৃতি থাকায় গুরুত্ব ও আয়তন অনুসারে আনুপাতিক হারে পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে।

৪. অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট ১৫৪ টি ইউনিয়নের জেলে পল্লী/মাছ ঘাট/নদীর পাড়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ইউনিয়ন পরিষদ বা সুবিধাজনক স্থানেস্থানীয় জনপ্রতিনিধি/স্থানীয় প্রশাসন/আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য/গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/গণমাধ্যমকর্মী/ আড়তদার/ট্রলার মালিক/ মাঝি/জেলে/মৎস্যজীবী সমিতির সদস্য/প্রতিনিধির সমন্বয়ে সচতনতামূলক সভা আয়োজন করা হচ্ছে।

ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা / চ্যালেঞ্জ

সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে অবৈধভাবে ইলিশ মাছ আহরণ করার ফলে এ মাছের প্রাকৃতিকভাবে ডিম তথা পোনা উৎপাদন ব্যাহত হয়। আইন অমান্য করে জাটকা ধরার ফলে এ মাছের নতুন প্রজন্মের প্রবেশন, জাটকাকে বৃদ্ধির সময় না দিয়ে ধরার ফলে গ্রোথ ওভার ফিসিং এবং পূর্ণবয়স্ক মাছকে রক্ষা না করার ফলে রিক্রুটমেন্ট ওভার ফিসিং হচ্ছে। ইলিশ মাছের জীবনচক্রের প্রায় সকল স্তরে আহরণজনিত মৃত্যু হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন কারণে নদ-নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস, পরিবেশগত পরিবর্তন এবং জলজ দূষণের কারণে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের 'ইলিশ মাছের অনেক বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র এবং জাটকা ইলিশের চারণ ক্ষেত্র বিনষ্ট হয়েছে। এ সম্পদের গুরুত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রায় সকল স্তরের জনসাধারণের সচেতনতা প্রয়োজন।

চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলায় করণীয় ঃ

- ইলিশের আবাসস্থল উন্নয়ন ও অভিপ্রায়ণ পথ নির্ণয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- মাছের অভিপ্রায়ণ পথ সচল রাখতে নদী মাস্টার ড্রেজিংকরণ;
- ইলিশের অভিপ্রায়ণ পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট স্থাপন;
- ইলিশ আহরণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার জাল, নৌকা ও আহরণের উপর নির্ভরশীল জেলেদের তালিকা হালনাগাদকরণ;
- স্থানীয় কমিউনিটি সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি;
- বিদ্যমান অভয়াশ্রমে ইলিশের বিচরণের ওপর প্রতিবেশগত (ইকোলজিক্যাল স্টাডি) প্রভাব নিরুপণ ও অভয়াশ্রম পুনঃনির্ধারণে গবেষণা;
- ইলিশের বিদ্যমান প্রজনন ক্ষেত্রে প্রজননের প্রতিবেশগত প্রভাব নিরুপণ ও পুনঃনির্ধারণে গবেষণা ;
- আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	অধিবেশন নং- ০৩	সময়: ১২:০০-১৩:৩০	মেয়াদকাল: ৯০ মিনিট

শিরোনাম: ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা কৌশল ও সরকারের গৃহিত কার্যক্রম

অভীষ্ট দল: বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নির্বাচিত সুফলভোগী জেলে

লক্ষ্য: এ অধিবেশনে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দেয়া হবে, যাতে তারা ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দেশ্য *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –*

- ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে সরকারের ব্যবস্থাপনা কৌশল ও গৃহীত কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবে।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			১৫ মিনিট
	• গত অধিবেশনের সংযোগ স্থাপন; • বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা; • বর্তমান অধিবেশনের শিক্ষণ উদ্দেশ্যের বর্ণনা এবং • উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৬০ মিনিট
	• ইলিশসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কৌশল • সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে বাস্তবায়নের সুফল।	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			১৫ মিনিট
	• শিক্ষণীয় মূল বিষয়ের পুনরালোচনা; • অধিবেশনের উদ্দেশ্য যাচাই; • হ্যান্ড আউট বিতরণ ও পড়ানো • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত এবং • ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সরকারের গৃহীত কার্যক্রম

ভূমিকা

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ এবং গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য সম্পদ। একক প্রজাতি হিসেবে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সবচেয়ে বেশি। ইলিশ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এ দেশের প্রায় ৬.০ লক্ষ মৎস্যজীবী প্রত্যক্ষভাবে ইলিশ আহরণ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। এ প্রেক্ষিতে ইলিশের টেকসই ও সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইলিশের টেকসই উন্নয়নে জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষা অপরিহার্য। ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা কৌশল নিম্নরূপঃ

ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা কৌশল

ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কৌশল/ব্যবস্থা গ্রহণঃ

- জাটকা সংরক্ষণ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন;
- জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ এবং ইলিশ উন্নয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিকভাবে ছোট আকারের ইলিশকে বড় হওয়ার সুযোগ তৈরী;
- ইলিশ মাছের অতি আহরণ নিয়ন্ত্রণ;
- ডিমওয়ালা ইলিশ ও ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ;
- ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ উন্নয়ন;
- ইলিশ মাছের আহরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ;
- প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি;
- ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা;
- ইলিশসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনবল তৈরী, জনবল ও অবকাঠামো জোরদারকরণ;
- জাটকা ও ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন দরিদ্র জেলেদের প্রয়োজন মাফিক খাদ্য সহায়তা প্রদান;
- ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন বা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- ইলিশ জেলেদের জন্য বীমা ব্যবস্থার প্রচলন ও সুদমুক্ত ঋণ প্রদান;
- ইলিশ মাছ পরিবহণ, বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণ; এবং
- ইলিশ মাছের রপ্তানি ।

ইলিশ সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন

জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিধি সংশোধন করে সময়োপযোগী করা হয়েছে। ২০০৩ সালে মৎস্য সংরক্ষণ আইন/বিধি সংশোধন করে প্রচলিত ০১ নভেম্বর থেকে ৩০ এপ্রিল এর পরিবর্তে ৩১ মে পর্যন্ত ০৯ ইঞ্চি আকারের ছোট জাটকা ধরা, পরিবহন, সংরক্ষণ,ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং আইনত দন্ডনীয় অপরাধ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে বিদ্যমান বিধি সংশোধন কওে জাটকার দৈর্ঘ্য ২৫ সেঃমি বা ১০ ইঞ্চি পুনঃনির্ধারণ করা হয়। পাশাপশি মা ইলিশ রক্ষায় ২০১১ সালে মৎস্য সংরক্ষণ বিধি সংশোধন করে আশ্বিন মাসের ১ম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার সাথে মিলিয়ে প্রধান প্রজনন মৌসুম পুনঃনির্ধারণ করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় পূর্ণিমার চাঁদের সাথে মিল রেখে ১১ দিন নির্ধারণ হলেও ২০১৬ সাল থেকে প্রধান প্রজনন মৌসুম ২২ দিন ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্রে নির্বিঘ্নে প্রজনন করতে পারায় ইলিশের ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। জাটকা নিধন প্রতিরোধ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, জেলা প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, পুলিশ প্রশাসন উক্ত আইন বাস্তবায়নে সক্রিয় আছে। নিয়মিত অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকার প্রায় সকল উপজেলায় জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল যেমন- কারেন্ট জাল, বেহন্দি জাল, মশারি জাল, চড়ঘেরা জালসহ অন্যান্য জাল নির্মূলে প্রতি বছর মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্বাবধানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় জানুয়ারি মাসে ১৫ দিন ব্যাপি বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হয়। ২০১৬ সাল থেকে এ কার্যক্রম উপকূলীয় ০৩ টি জেলায় শুরু হলেও বর্তমানে ১৭ টি জেলায় উক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

জাটকা ও ইলিশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি

জাটকা সংরক্ষণ, ইলিশ মাছের গুরুত্ব ও উন্নয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আপামর জনসাধারণ যথেষ্ট সচেতন নন। এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য সকল স্তরের জনসাধারণ ও প্রশাসনের সহযোগিতা প্রয়োজন বিধায় ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন। মৎস্য অধিদপ্তর হতে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ইলিশের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধিতে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলনে রুপ দেওয়ার জন্য প্রতিবছর জাটকা মৌসুমে "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ" উৎযাপন করা হয়। এছাড়া সারা বছর লিফলেট, পোষ্টার, ভিডিও, বুকলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি মুদ্রণ করে সকল অংশীজনের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সড়ক র‍্যালি, নৌ র‍্যালি, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, দলীয় আলোচনা, মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে ইলিশ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় প্রনীত আইন ও নীতি, পদ্ধতি, পরিবেশ বিষয়ক ইস্যু, সম্পদ সংরক্ষণ, স্থানীয় কারিগরি জ্ঞান ও গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে জনগনকে সচেতন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য দপ্তর ভিডিও ডকুমেন্টরী তৈরী, টিভি স্পট, নাটক, বিজ্ঞাপন, গণবিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রেখে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মা ইলিশ রক্ষা ও জাটকা সংরক্ষণ অভিযান সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন প্রজনন মৌসুমে ইলিশ নির্বিঘ্নে প্রজনন করতে পারছে তেমনি জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্মিলিত অভিযানের ফলে জাটকা বড় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিকভাবে ছোট আকারের ইলিশকে বড় হওয়ার সুযোগ

ইলিশ অভয়াশ্রম হচ্ছে জলাশয়ের কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা আবাসস্থল যেখানে জাটকা বা ইলিশ মাছ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে চলাচল ও বসবাস করতে পারে। অভয়াশ্রম ঘোষিত এলাকায় সারা বছর অথবা কোন নির্দিষ্ট মৌসুমে মাছ ধরা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। কোন জলাশয়ের মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সহজতম ও কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা। ইলিশসহ অন্যান্য মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাটকা মাছের প্রধান বিচরণক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত ৬ (ছয়টি) এলাকাকে ইলিশ অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। এতে জাটকার প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি সহ ইলিশের বড় হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইলিশ মাছের অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ

সহনশীল মাত্রার চেয়ে বাংলাদেশে ইলিশ মাছ অতিরিক্ত আহরণ নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। কোনো প্রাকৃতিক পপুলেশন হতে অতিমাত্রায় মাছ আহরণ করা হলে উৎপাদনের গতিধারা সঠিক থাকে না এবং দীর্ঘ সময় ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে ঐ পপুলেশন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অতি আহরণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইলিশ মাছ ধরার ব্যবহৃত জালের ফাঁসের আকার ৬.৫ সেমি পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও অতিমাত্রায় মাছ আহরণ নিয়ন্ত্রনে মৎস্য সংরক্ষণ আইন/বিধি সংশোধন করে ০১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ২৫ সেঃমি বা ১০ ইঞ্চি আকারের ছোট জাটকা ধরা, পরিবহন, সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং আইনত দন্ডনীয় অপরাধ করা হয়। পাশাপশি মা ইলিশ রক্ষায় গবেষক ও অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম বাংলা মধ্য আশ্বিন হতে মধ্য কার্তিক মাসের পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যার সময়ের আগে পরে পর্যায়ক্রমে মোট ২২ (বাইশ) দিন সকল প্রকার মাছ ইলিশ মাছ ধরা, পরিবহন, সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং আইনত দন্ডনীয় অপরাধ করা হয়।

ডিমওয়ালা ইলিশ ও ইলিশের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ

প্রতিবছর আগস্ট হতে অক্টোবর মাসে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে (৬০-৬৫%) ধরা পড়ে। উক্ত সময়ে প্রায় ৭০-৮০% মাছ পূর্ণমাত্রায় পরিপক্ব থাকে এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমার জো এর সময় ইলিশ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ডিম ছেড়ে থাকে। কাজেই প্রাকৃতিকভাবে ইলিশ মাছের অধিক ডিম উৎপাদনের জন্য অক্টোবর মাসে বড় পূর্ণিমার জোর সময় প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রে কিছুদিন মাছ আহরণ বন্ধ রাখা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে মেঘনা নদীর মোহনায় ইলিশ মাছের প্রধান প্রজনন এলাকায় (উত্তর তজমুদ্দিন / পশ্চিম সৈয়দ আওলিয়া পয়েন্ট: শাহের খালী/ হাইতকান্ধী পয়েন্ট, মীরসরাই লতা চাপালি পয়েন্ট, কলাপাড়া এবং উত্তর কুতুবদিয়া গন্ডামারা পয়েন্ট) প্রতি বছর অক্টোবর বা আশ্বিন-কার্তিক মাসের বড় পূর্ণিমা ও অমাবশার আগে পরে মোট ২২ দিন ইলিশ মাছ ধরা বা এ উদ্দেশ্যে যে কোনো প্রকার জাল ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ। এ আইন অমান্য করে ইলিশ মাছ ধরা হলে জাল-নৌকা বাজেয়াপ্ত এবং কারাবাস ও জরিমানার বিধান করা হয়েছে।

ইলিশ মাছের আবাসস্থল ও পরিবেশ উন্নয়ন

একসময় বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রধান নদ-নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে দেশের বাইরে এবং ভিতরে নানাবিধ বাঁধ নির্মাণের ফলে পানি প্রবাহ হ্রাস, পলিভরাট, জলজ পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণে ইলিশ মাছের ব্যাপক আবাসিক এলাকা ধ্বংস এবং অভিপ্রয়াণ পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ঋণাত্বক প্রভাব পড়ছে। ইলিশ মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত উপায়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

- ❖ নতুন কোনো বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের বাঁধ এবং নদীতে আড়াআ/ড়ি বাঁধ নির্মাণ বা ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে ইলিশসম্পদের ওপর এর প্রভাব বিবেচনা করে অভিপ্রয়াণ পথ মুক্ত রাখা;
- ❖ ইলিশ অন্যান্য মাছের অভিপ্রয়াণ, নৌ-চলাচল এবং সেচ কার্যক্রমের জন্য ধলেশ্বরী, মধুমতি, গড়াই ইত্যাদি নদীসমূহের তলদেশ খনন করে সংস্কার করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ;
- ❖ মৎস্য সম্পদ নৌ-চলাচল, সেচ কার্যক্রমের জন্য নদী শাসন ও পানি ব্যবহার সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন;
- ❖ পলিভরাট নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশব্যাপী বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- ❖ দূষণ মাত্রা বিশ্লেষণ এবং যথাযথ বর্জ্য শোধন প্রক্রিয়া ছাড়া নতুন কলকারখানা স্থাপন বা নিবন্ধন নিষিদ্ধ করা;
- ❖ পানি দূষণের ফলে মৎস্য সেক্টরের ক্ষতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে একত্রে কাজ করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতিরোধক স্মারক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা;

জাটকা ও মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন দরিদ্র জেলেদের মানবিক সহায়ত হিসেবে ভিজিএফ (চাল) প্রদান

জেলে সম্প্রদায় ঐতিহ্যগতভাবে দরিদ্র। প্রতিদিন তিন বেলা খাবার জোগাড় করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য। ফলে জীবন জীবিকার অন্বেষনে তারা ক্ষতিকর অবৈধ জাল ও সরাঞ্জামাদি বিশেষত কারেন্ট জাল, বেহুন্দি জাল ও বেড়জাল দিয়ে নির্বিচারে জাটকা ধরে। পূর্বে এত ব্যাপক পরিমান জেলেরা জাটকা আহরণ করত যে ইলিশ মাছের পুনসংযোগ বা প্রবেশন প্রক্রিয়া ব্যহত হত। ফলে ইলিশের উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছিল। মৎস্য অধিদপ্তর ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কৌশল হিসেবে জেলেদের জাটকা ধরা নিষিদ্ধ সময়ে মানবিক সহায়তা হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় জেলেদের জাটকা ধরা বন্ধ রাখতে ভিজিএফ এর মাধমে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০০৭-০৮ অর্থ বছওে ১,৪৫,৩৩৫টি জেলে পরিবারের মধ্যে ১০ কেজি হিসেবে মোট ৪,৩৬০.০০ মে,টন খাদ্য শস্য চাল বিতরণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে জাটকা সংরক্ষণ এলাকার্ আওতা বৃদ্ধি করে জাটকা সংরক্ষণ মৌসুম ফেব্রয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত ৪ মাস জেলেদের আর্থ সামাজিক অবস্হার কথা বিকবেচনা করে ২০১৩-১৪ সাল থেকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হিসেবে খাদ্যশস্য চাল বিতরণ করা হয়। ২০১৫-১৬ পর্যন্ত বিগত ৮ বছরে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে মোট ১,৯৬,৫৬৯ মে.টন। সেখানে ২০২-২১ অর্থ বছরে জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন চার মাসে ২০ টি জেলায় ৯৮ টি উপজেলায় ৩,৭৩,৯৯৬ টি জেলে পরিবারকে প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ২৯,৯১৯.৬৮ মে.টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় | এছাড়াও জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ের পাশাপাশি ২০১৬ সাল থেকে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে নিষদ্ধ সময়ে জেলেদের আহরণ থেকে বিরত রাখতে সরকার ২০ কেজি হারে ১৪টি জেলার ৭৬ টি উপজেলার ৩,৮৪,৪৬২ জেলে পরিবারকে ৭৬৮৯.২৪ মে.টন চাল বিতরণ করেন। পর্যায়ক্রমে এর আওতা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালে ৩৭ টি জেলার ১৫৩ টি উপজেলায় ৫,৫৫,৯৪৪ টি জেলে পরিবারকে ১১,১১৮.৮৮ মে,টন চাল বিতরণ করা হয় |

জাটকা ও ইলিশ জেলেদের পুনর্বাসন কার্যক্রম (বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি)

বাংলাদেশের জেলে সম্প্রদায় ঐতিহ্যগতভাবেই দরিদ্র জীবিকা নির্বাহ তথা বেঁচে থাকার জন্য তারা জাটকা আহরণ করতে বাধ্য হয়। কাজেই ইলিশ মাছের টেকসই উন্নয়নের জন্য ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন ও জাটকা মৌসুমে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। জাটকা আহরণকারী জেলেদের পুর্নবাসনের লক্ষে বিকল্প কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার প্রদান করে সরকার রাজস্ব খাত তৈরীর পাশাপাশি একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ০৭ বছর মেয়াদি রাজস্ব বাজেটে প্রথম "জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ইলিশ অধ্যুষিত ২০ টি উপজেলার ২০,০০০ টি জাটকা আহরণকারী জেলেসহ এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত আন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প থেকে মোট ৫৩,৩০৯ জন জেলেকে উপকরণ যেমন- রিক্সা, ভ্যান, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, খাঁচায় মাছচাষ, বৈধ জাল ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০,০০০ টি জেলে পরিবারকে বিকল্প কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে ২৫০০০.০০ টাকা মূল্যে মানের উপকরণ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ইলিশ মাছ পরিবহণ, বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণ

ইলিশ মাছসহ অন্যান্য মাছের গুণগতমান বিনষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে মাছ ধরার পর দীর্ঘ সময় খোলা অবস্থায় বা সূর্য কিরণে রাখা, ধৃত মাছ নৌকা জলযানে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা, প্রয়োজন অনুপাতে বরফ না মেশানো, বরফ প্রয়োগে বিলম্ব, তাপ অনিরোধক বাগ, ঝুড়িতে পরিবহণ, গাদাগাদিভাবে মাছ রাখা, রাফ হ্যান্ডলিং এবং খোলা গাড়িতে পরিবহণ করা ইত্যাদি। অধিকাংশ মাছের আড়ৎ এবং পাইকারি বাজার স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এ ছাড়া দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অপ্রতুল সংখ্যক বরফকল এবং দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য হাজার হাজার টন ইলিশ মাছ পচে নষ্ট হয়।

ইলিশ মাছের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য উপরিউক্ত অসুবিধাসমূহের প্রতিকার করাসহ ইলিশ জেলে ও ব্যবসায়ীদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করা আবশ্যক। মাছ পরিবহণের জন্য বাঁশ, হুগলার ঝুড়ি, কাঠের বাক্সের পরিবর্তে তাপ নিরোধক প্লাস্টিকের বাক্স বা আইস বক্স, তাপ নিরোধক ভ্যান গাড়ীর প্রচলন এবং রেলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বগি সংযোজন করা যেতে পারে। একই সাথে গুণগতমান সম্পন্ন অবতরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, উন্নতমানের বরফ উৎপাদন ও জেলে ব্যবসায়ীদেরকে উন্নত সুযোগ সুবিধা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। মাছ ধরার পর হতে বিক্রয় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ইলিশ মাছের গুণগত মান অক্ষুন্ন থাকলে জেলে, ব্যবসায়ীদের আর্থিক লাভসহ ভোক্তাগণ উপকৃত হবে এবং সার্বিকভাবে ইলিশ সম্পদের উন্নয়ন হবে।

এছাড়া ইলিশের স্থায়িত্বশীল উৎপাদনে নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে চলমান রয়েছেঃ

- **ইলিশ মাছের আহরণ পরিসংখ্যান উন্নয়ন**
- **প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন**
- **ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি**
- **ইলিশ ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা**
- **ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনবল**

ইলিশ মাছের রপ্তানি

ইলিশ মাছ ভারত, মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপের অন্যান্য দেশ অস্ট্রেলিয়া এবং মালয়েশিয়াতে রপ্তানি করা হয়। উল্লিখিত দেশসমূহে ইলিশ মাছের ব্যাপক চাহিদা এবং উচ্চ বাজার মূল্য আছে। বর্তমানে দেশের সকল মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালে রাখতে ইলিশ মাছের নিয়মিত রপ্তানি ২০১২ সাল থেকে সাময়িক বন্ধ রয়েছে তবে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেলে রপ্তানির সুযোগ তৈরী হবে।

ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বর্তমান সরকার দেশের মানুষের মাছের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইলিশসহ সবধরনের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট । ইলিশ মাছ উৎপাদন স্বাভাবিক ও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে যেসকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে তা বর্ণিত হলোঃ

- ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা ইলিশের প্রজনন নির্বিঘ্ন করতে বঙ্গোপসাগরের ৭০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্র ঘোষনা করা হয়েছে;
- এছাড়া ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২ দিন উপকূলীয় নদ-নদীসহ সারাদেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহন, মজুদ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিপনন বন্ধ রাখা হয়;
- এসময় ইলিশ আহরণে নিয়োজিত জেলেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ২০ কেজি হারে ভিজিএফ বিতরণ করা হয়, ২০২০ সালে ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৪২ টি জেলে পরিবারকে ১০৫৬৬.৮৮ মেট্রিক টন ভিজিএফ বিতরণ করা হয়েছে। বিগত ৫ বছরে (২০১৬-২০২০) এ কার্যক্রমের আওতায় ২০ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৬৫ টি জেলে পরিবারকে ৪১ হাজার ৪৭১ মেট্রিক টন ভিজিএফ বিতরণ করা হয়েছে;
- জাটকাসহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের পোনা রক্ষার্থে অবৈধ জাল (বেহন্দি, কারেন্ট জাল, চরঘেরা জাল, বেড় জাল ইত্যাদি) ২০১৬ সাল থেকে উপকূলীয় এলাকাসমূহে বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২১ সালে ১৭ টি জেলায় বিশেষ কম্বিং অপারেশন বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১নভেম্বর থেকে ৩০ জুন মোট আট মাস জাটকা আহরণ, পরিবহন, মজুদ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন নিষিদ্ধ করা হয়েছে;

- জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে ফেব্রুয়ারি থেকে মে মোট চার মাস মাসিক ৪০ কেজি হারে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ভিজিএফ বিতরণ করা হচ্ছে, বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে জাটকা আহরণে বিরত ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৯৯ টি জেলে পরিবারকে এ কর্মসূচির আওতায় ৫৬ হাজার ২২৫ মেট্রিকটন চাল বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০০৪-০৫ থেকে ২০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত মাত্র ৬৯০৬ মেট্রিকটন ভিজিএফ বিতরণ করা হয়েছিল, সেখানে ভিজিএফ এর পরিমাণ মাসিক ১০ কেজি থেকে বাড়িয়ে ৪০ কেজি করা হয়েছে এবং ২০১১-১২ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বিগত ১০ বছরে ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩৬৬ মেট্রিকটন চাল জেলেদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে;
- জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় এবং ক্ষতিকর বেহন্দি জালসহ কারেন্ট জাল এবং অন্যান্য ক্ষতিকর জাল নির্মূলে প্রতিবছর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, নৌ-পুলিশ এর সহযোগিতায় মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা করছে;
- মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বৎসর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ (পঁয়ষট্টি) দিন বঙ্গোপসাগরে সকল প্রকার ট্রলার কর্তৃক সকল প্রজাতির মৎস্য এবং ক্রাস্টেশিয়ানস আহরণ বন্ধ করা হয়েছে;
- সামুদ্রিক জলসীমায় ৬৫দিনের মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ সময়ের জন্য উপকূলীয় সকল জেলে পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে; এর আওতায় ২০২১ সালে মোট ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৮৬টি জেলে পরিবারকে মোট ৩৫ হাজার ৩৫০.৫৬ মে. টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- পদ্মা, মেঘনার উর্ধ্বাঞ্চল ও নিম্ন অববাহিকায়, কালাবদর, আন্ধারমানিক ও তেঁতুলিয়াসহ অন্যান্য উপকূলীয় নদীতে মোট ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন ও অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ করা হয়েছে।
- ইলিশসহ অন্যান্য সকল উপকূলীয় জলজ ফনা রক্ষায় নিঝুম দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ৩ হাজার ১৮৮বর্গ কিঃমিঃ আয়তনের সামুদ্রিক সংরক্ষিত (MPA) অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে।
- জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে ৩.৫ কোটি টাকার "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা তহবিল" গঠন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ তহবিল থেকে ৩০০ জন কমিউনিটি ফিশ গার্ডকে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে সহায়তা প্রদানের জন্য ১০০০ টাকা করে মোট ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক প্রণোদনা প্রদান এবং মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে স্থাপিত শরীয়তপুর জেলার হালইসার আদর্শ মৎস্য গ্রামের ১০ টি জেলে পরিবারকে ১০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে;
- ইলিশের পোনা জাটকা যেন ইলিশ ধরার জালে আটকে না যায় তাই সরকার ফাঁস জালের মেস সাইজ ৬.৫ সেমি নির্ধারণ করেছে যা জাটকা রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে।
- জাটকা ও ইলিশ রক্ষায় সর্বসাধারণকে সম্পৃক্ত করার জন্য দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরণের জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- প্রতি বছর জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে;
- জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় **'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ'** শীর্ষক বৃহৎ প্রকল্প এবং ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও এ সম্পদের উন্নয়ন টেকসইকরণের লক্ষ্যে "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" মৎস্য অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে, যার প্রত্যক্ষ সুফলভোগী জেলে ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়।
- ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসইকরণে "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের ২৯ টি জেলার ১৩৪ টি উপজেলায় নিম্নরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়িত করছে

  - ✓ ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ সভা, সমাবেশ, প্রচার-প্রচারনা
  - ✓ ইলিশ অভয়াশ্রম তীরবর্তী ২৩টি উপজেলার ১৫৪টি ইউনিয়নে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা সভা
  - ✓ জাটকা নিধন রোধকল্পে বিশেষ অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা
  - ✓ উপকূলীয় ১৪টি জেলার ৭১ টি উপজেলায় বিশেষ কম্বিং অপরেশান পরিচালনা
  - ✓ জাটকা আহরণ থেকে বিরত রাখতে ৩০,০০০টি অতিদরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে উপকরণ সহায়তা প্রদান
  - ✓ বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ১৮,০০০ জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান
  - ✓ উপকূলীয় ৭ টি জেলায় অবৈধ জাল নির্মূলে ১০,০০০টি জেলে পরিবারকে বৈধ জাল বিতরণ।

সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুফল

ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি

ইলিশ উৎপাদনের গতিধারা লক্ষ করলে দেখা যায়, এক সময় দেশের প্রায় সকল নদ-নদী এবং নদীসমূহের শাখা ও উপনদীতেও প্রচুর পরিমান ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। বন্যা বা প্লাবনের বছরে নদীর সাথে সংযোগ আছে এমন সব বিল ও হাওরেও ইলিশ মাছ কখনও কখনও পাওয়া যেত। গুরুত্বপূর্ণ এই মৎস্য সম্পদ আশির দশকে সংকটে পড়ে। আশির দশকের পূর্বে মোট মৎস্য উৎপাদনের ২০% ছিল ইলিশের অবদান। ২০০২-২০০৩ সালে ইলিশের অবদান দাঁড়ায় জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ৮% (১.৯৯ মে.টন)। ইলিশ উৎপাদনের গতিধারায় লক্ষ্য করা যায় যে, বিগত ২০০০-২০০১ সালে ইলিশের উৎপাদন ২.২৯ মে.টন থাকলেও ২০০১-০২ ও ২০০২-০৩ সালে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ২.২০ মে.টন এবং ১.৯৯ মে.টনে পৌঁছে। ২০১২-১৩ আর্থিক সাল থেকে মৎস্য অধিদপ্তর ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে যেমনঃ জাটকা সংরক্ষণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলেদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিকল্প লক্ষ্যে উপকরণ সহায়তা প্রদান, প্রতি বছর জাটকা আহরণ থেকে বিরত রাখতে চারমাস ব্যাপী পরিবার প্রতি ৪০ কোজি হারে এবং মা ইলিশ সংরক্ষণে ২২ দিন মাছ আহরণ বন্ধ থাকায় ২০ কেজি হারে প্রতি জেলে পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া অবৈধ জাল যেমন- কারেন্ট জাল, বেহন্দি জাল, বেড় জাল, চর ঘড়া জাল, মশারী জাল, পাইজাল ইত্যাদি অপসারণে বিশেষ অভিযান পরিচালনাসহ বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হয়। সারা বছর জেলেদের নিয়ে ইলিশের স্থায়ীত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ, গণসচেতনতা সভা, উদ্বুদ্ধকরন সভা, লিফলেট, পোস্টার, টিভি স্পট ও ভিডিও প্রচারসহ সভা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ফলশ্রুতিতে বিগত কয়েক বছরে ইলিশের আশানুরুপ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর ৩.৫% হারে বৃদ্ধি এবং ২০১৫ সালের পরে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৩.৫% হতে ৯.০% এ উন্নীত হয়েছে। ২০১৯-২০ সালে ইলিশের উৎপাদন ৫.৫০ লক্ষ মে.টনে দাড়িয়েছে যা ২০১৮-১৯ সালের চেয়ে ০.১৭ লক্ষ মে.টন বেশী।

ইলিশ মাছের গড় আকার এবং ওজন বৃদ্ধি

জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার ফলে ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে গড় আকার এবং ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জেলেদের আয় বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

ইলিশ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন বৃদ্ধি

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায় প্রতি বছর ইলিশ মাছের ডিম ছাড়ার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রতি বছর নদ-নদীতে জাটকার প্রাচুর্য (abundance) বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল জাটকা সফলভাবে রক্ষা করা সম্ভব হলে ইলিশ উৎপাদনে আগামী বছরসমূহেও ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে ধারণা করা যায়।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	অধিবেশন নং- ০৪	সময়: ১৪:০০-১৫:০০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: "মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে" জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণে বিদ্যমান আইন ও বিধি

অভীষ্ট দল: বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নির্বাচিত সুফলভোগী জেলে

লক্ষ্য: এ অধিবেশনে ইলিশ সংরক্ষণে প্রচলিত আইন, আইন ভঙ্গের শাস্তি, জাটকা রক্ষায় অভিযান সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে, যাতে অংশগ্রহণকারীগণ জাটকা ও ইলিশ সংরক্ষণে প্রচলিত আইন সর্ম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

উদ্দেশ্য *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –*

- জাটকা ও ইলিশ সংরক্ষণে প্রচলিত আইন বর্ণনা করতে পারবে;
- আইন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবে।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			১০ মিনিট
	• স্বাগত • পূর্ববর্তী অধিবেশনের আলোকপাত • বর্তমান অধিবেশনের সাথে সংযোগ • অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৪০ মিনিট
	• মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫ • ধারাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা • ধারাসমূহের ব্যাখ্যা • মৎস্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ • মা ইলিশ ও জাটকা রক্ষা সংক্রান্ত আইন ও ধারা • ইলিশ সংরক্ষণ আইন ও আইন ভঙ্গের শাস্তি • আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ • জাটকা রক্ষায় অভিযান পরিচালনা • অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি উদ্ভব ও মোকাবিলা • জালের ফাঁসের দৈর্ঘ্য পরিমাপ পদ্ধতি	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	• শিক্ষণীয় মূল বিষয়ের পুনরালোচনা; • অধিবেশনের উদ্দেশ্য যাচাই; • হ্যান্ড আউট বিতরণ ও পড়ানো; • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত এবং • ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫

(The Protection and Conservation of Fish Rules, 1985)

(মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ১৬ই অক্টোবর, ১৯৮৫ তারিখের এস, আর, ও নং ৪৪২-এল/৮৫)

মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের XVIII নং পূর্ব বাংলা আইন) এর ৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নলিখিত বিধিমালা প্রণয়ন করেন ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ

২। সংজ্ঞা ঃ

৩। স্থিরকৃত ইঞ্জিন (Fixed Engine) স্থাপন নিষিদ্ধ ঃ

(১) কোন ব্যক্তি নদ-নদী, খাল ও বিলে স্থিরকৃত ইঞ্জিন স্থাপন বা ব্যবহার করিতে পারবে না ;

(২) উপ-বিধি (১) লঙ্ঘন পূর্বক নির্মিত বা ব্যবহৃত স্থিরকৃত ইঞ্জিন এবং তদ্দ্বারা ধৃত মাছ জব্দ, অপসারণ এবং বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

৪। কতিপয় উদ্দেশ্যে বাঁধ, ইত্যাদি নির্মাণ নিষিদ্ধ ঃ

সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ অথবা পানি নিষ্কাশন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি নদ-নদী, খাল বা বিলে আড়াআড়িভাবে স্থায়ী বা অস্থায়ী বাঁধ বা অন্য কোনো কাঠামো নির্মাণ করিতে পারিবে না।

৫। বিস্ফোরক দ্রব্য প্রয়োগে মৎস্য নিধন নিষিদ্ধ ঃ

কোন ব্যক্তি অভ্যন্তরীণ বা সামুদ্রিক জলাশয়ে বিস্ফোরক দ্রব্য, বন্দুক, ধনুক এবং তীর দ্বারা মৎস্য নিধন করিতে বা এ মর্মে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৬। বিষ, ইত্যাদি প্রয়োগে মৎস্য নিধন নিষিদ্ধ ঃ

কোন ব্যক্তি পানিতে বিষ প্রয়োগ বা কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ বা অন্য কোন উপায়ে পানি দূষিত করে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য নিধন করিতে বা এ মর্মে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৭। নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট মাছ ধরা ও নিধন নিষিদ্ধ ঃ

কোন ব্যক্তি প্রতি বছর ১লা এপ্রিল হইতে ৩১ শে আগষ্ট পর্যন্ত নদ-নদী, খাল বা বিলে সাথে সাধারণত সরাসরি সংযুক্ত কোন জলাশয়ে দলবদ্ধভাবে বিচরণরত শোল, গজার ও টাকি মাছের রেণু/পোনা এবং ঐ গুলির পাহারাদার হিসাবে বিচরণরত মা মাছ ধরিতে পারিবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, পোনা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উপরে বর্ণিত জাতের পোনা এবং মা মাছ ধরার ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।

৮। নির্ধারিত জলাশয়ে কার্প জাতীয় মাছ ধরা ঃ

(১) কোন ব্যক্তি প্রথম তফসিলে বর্ণিত সময়কালের মধ্যে উক্ত তফসিলে বর্ণিত যে কোন আকারের কার্প জাতীয় মাছ অর্থাৎ রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ ও ঘনিয়া প্রভৃতি মাছ ধরিতে অথবা ধরিবার কোনো কারণ সৃষ্টি করিতে পারিবে না, যদি না তাহার এতদুপলক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কোন লাইসেন্স থাকে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মৎস্য চাষ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে উপরিবর্ণিত কার্প জাতীয় মাছ ধরিবার জন্য লাইসেন্স ইস্যু করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত লাইসেন্স প্রদর্শিত ফরমে এবং লাইসেন্সের গায়ে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে ইস্যু করিতে হইবে।

(৩) এই বিধি মোতাবেক ইস্যুকৃত প্রত্যেকটি লাইসেন্সের জন্য ১০০/- টাকা লাইসেন্স ফি আদায় করিতে হইবে।

৯। মাছ বিক্রয় নিষিদ্ধ ঃ

কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় তফসিলের ২ এবং ৩ নং কলামে বর্ণিত প্রজাতির ও আকারের মাছ উক্ত তফসিলের ৪ নং কলামের সময়কালের যে কোন সময় ধরিতে, পরিবহন করিতে, বিক্রির জন্য প্রদর্শণ করিতে অথবা দখল করিতে পারিবে না ঃ

তবে মৎস্য উৎপাদন সংক্রান্ত কারণে বা উদ্দেশ্যে মাছ ধরা, বহন করা, বিক্রি করা, পরিবহণ বা প্রদর্শণ করার ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।

১০। জব্দকৃত মাছ, ফিক্সড ইঞ্জিন, মাছ ধরার জাল, খাঁচা, যন্ত্রপাতি, ফাঁদ, নৌকা, যান্ত্রিক নৌকা, যানবাহন, ইঞ্জিন এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কৌশল নিষ্পত্তি ঃ (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ২৯ মে, ২০১৪ খ্রি. তারিখের এস, আর, ও নং ৯৮-আইন/২০১৪ দ্বারা সংযোজিত।)

(১) অত্র বিধিমালার কোন একটি বিধি লঙ্ঘনের কারণে মাছ আহরণ, ধ্বংস বা পরিবহনের জন্য জব্দকৃত মাছ, ফিক্সড ইঞ্জিন, মাছ ধরার জাল, খাঁচা, ফাঁদ, যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, নৌকা, যান্ত্রিক নৌকা, যানবাহন, পরিবহন সরঞ্জাম বা অন্যান্য সম্পর্কিত কৌশল নিম্নলিখিত পদ্ধতি দ্বারা নিষ্পত্তি হবে:

(ক) জব্দকৃত মাছ এলাকার দরিদ্র, নিপীড়িত জনগোষ্ঠী বা অনাথ এর মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে;

(খ) জব্দকৃত ফাঁদ, খাঁচা, যন্ত্রপাতি, ফিক্সড ইঞ্জিন, ইঞ্জিন, নৌকা, যান্ত্রিক নৌকা, যানবাহন বা পরিবহন সরঞ্জাম ইত্যাদি নিলামে বিক্রয় করিতে হইবে;

(গ) জব্দকৃত মাছ ধরার জাল ৩ (তিন) জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ধ্বংশ করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন নিলামে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত সরকরি হিসাব খাতে জমা দিতে হইবে।

১১। ব্যাঙ ধরা, বহন, পরিবহন, বিক্রয়, প্রদর্শন ও দখলে রাখা নিষিদ্ধ ঃ

অত্র বিধিমালায় যাহাই বলা থাকুক না কেন, সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া বর্ণিত সময় ও অঞ্চলে জীবিত বা মৃত ব্যাঙ শিকার, বহন, পরিবহন, বিক্রয়, প্রদর্শন ও দখলে রাখা নিষিদ্ধ করিতে পারবেন।

১২। মাছ ধরা জালের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং জলের ফাঁসের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ঃ

(১) অত্র বিধিমালা যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে-

(ক) যে কোন মৎস্য ধরিবার জালের ব্যবহার এবং প্রয়োগের পদ্ধতি নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন;

(খ) যে কোন মৎস্য ধরিবার জালের ফাসেঁর আকার (size) নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

(২) কোন সময়ের জন্য এবং কোন জলাশয়ে উক্ত বিধি-নিষেধ বলবৎ থাকিবে তাহা উপবিধি (১) মোতাবেক ইস্যুকৃত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) বা (২) এর বিধান লংঘন করিয়া ব্যবহৃত বা প্রয়াগকৃত মৎস্য শিকার জাল এবং অনুরুপ লংঘনের মাধ্যমে ধৃত মাছ আটক ও বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

(মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ২৯ মে, ২০১৪ খ্রি. তারিখের এস, আর, ও নং ৯৩-আইন/২০১৩ দ্বারা সংযোজিত।)

মৎস্য চাষের আওতায় ব্যবহার ব্যতিত, মাছ ধরিবার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সুতা(Cotton), নাইলন (Nylone) বা অন্য কোন সিনথেটিক (Synthetic) সুতার তৈরী-

(ক) সর্বোচ্চ ১(এক) সেন্টিমিটার পর্যন্ত ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের যে কোনো আকার বা আকৃতির মেস সাইজ (Mesh Size) বিশিষ্ট নিম্নবর্ণিত জালের ব্যবহার উহার পার্শ্বে উল্লিখিত সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করিল, যথা ঃ-

জালের প্রকার	প্রচলিত নাম	স্থানীয় নাম	ব্যবহার নিষিদ্ধ সময়
টানা জাল; কাঠি জাল	মশারী জাল; চট জাল	কাঁথা জাল, বেড় জাল; জগৎ বেড় জাল; ভীম জাল	প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাস থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত

খ) যে কোনো আকার, প্রকার, ধরন, ফাঁস বা মেশ সাইজ (Mesh Size) বিশিষ্ট নিম্নবর্ণিত জালের ব্যবহার দেশের সকল স্বাদু বা মিঠা পানির জলাশয়ে এরং সর্বোচ্চ জোয়ারে ১০(দশ) মিটার গভীরতা পর্যন্ত উপকূলীয় জলসীমায় বর্ণিত জালের পার্শ্বে উল্লিখিত সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করিল, যথাঃ-

জালের প্রকার	প্রচলিত নাম	স্থানীয় নাম	ব্যবহার নিষিদ্ধ সময়
স্থিরকৃত জাল (Fixed Net);	উপকূলীয় বেহুন্দি জাল (Estuarine Set Bag Net-ESBN);	বাঁধা জাল; পেকুয়া জাল; বিঙ্গি জাল, গাড়া জাল; চিংড়ি পোনা ধরা জাল; খুটি/খোটা জাল; টং জাল; বিন্দি জাল;	সারা বৎসর

গ) সামদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত সকল মাছ ধরার নৌযানে বড় ফাঁসের ড্রিফট নেট এর জালের নূন্যতম ফাঁস ২০০ মি.মি. এবং ছোট ফাঁসের ড্রিফট নেট এর জালের নূন্যতম ফাঁস ১০০ মি.মি.।

১৩। **ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় নির্ধারিত সময়ে আহরণ নিষিদ্ধকরণঃ** (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ খ্রি. তারিখের এস, আর, ও নং ৩০১-আইন/২০১১ দ্বারা সংযোজিত।)

(১) অত্র বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, কোনো ব্যক্তি ধরতে বা ধরার কারণ হতে পারবে না-

(ক) নিম্নের সারণির (৪) নং কলামে উল্লেখিত সময় এবং (২) নং কলামে উল্লেখিত ইলিশ মাছের অভয়াশ্রম এলাকার সব ধরনের মাছ :

সারণি

ক্রমিক নং	ইলিশ মাছের অভয়াশ্রম এলাকা	সীমানা পয়েন্ট	গময়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার (মেঘনা নদীর নিম্ন অববাহিকার ১০০ কি.মি. এলাকা)	ষাটনল পয়েন্ট (৯০°৩৭.১২'E এবং ২৩°২৮.১৯'N) চর আলেকজান্ডার পয়েন্ট (৯০°৪৯.৩০'E এবং ২২°৪০.৯২'N)	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
২	ভোলা জেলার চর ইলিশা হতে চর পিয়াল (মেঘনা নদীর একটি উপনদ, শাহবাজপুর শাখার ৯০ কি.মি. এলাকা)	চর ইলিশা মসজিদ পয়েন্ট (৯০°৩৮.৮৫'E এবং ২২°৪৭.৩০'N) চর পিয়াল পয়েন্ট (৯০°৪৪.৮১'E এবং ২২°৫.১০'N)	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
৩	ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তম (তেতুলিয়া নদীর ১০০ কি.মি. এলাকা)	ভেদুরিয়া ফেরিঘাট মসজিদ পয়েন্ট (৯০°৩৩.৮৯'E এবং ২২°৪২.৩১'N) মন্ডলবাজার (চর রুস্তম) পয়েন্ট (৯০°৩১.৪০'E এবং ২১°৫৬.৩২'N)	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল
৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কি.মি. এলাকা	গুলবুনিয়া পয়েন্ট (৯০°১৯.২০'E এবং ২১°৫৭.৬৮'N) বঙ্গোপসাগর ও আন্ধারমানিক নদীর সংযোগস্থল (৯০°৩.৯১'E এবং ২১°৪৯.৪৩'N)	প্রতি বছর নভেম্বর হতে জানুয়ারি
৫	পদ্মা নদীর নিম্ন অববাহিকার ২০ কি.মি এলাকা শরিয়তপুর জেলার নরিয়া-ভেদরগঞ্জ উপজেলার উত্তর এবং চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলা ও শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ	শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার কচিকাটা পয়েন্ট এর উত্তর-পূর্ব (৯০°৩২.৬'E এবং ২৩°১৯.৮'N) শরিয়তপুর জেলার নরিয়া উপজেলার ভুমকাটা পয়েন্ট এর উত্তর-পূর্ব (৯০°২৮.৮'E এবং ২৩°১৮.৪'N) চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার বেরারিপাড়া পয়েন্ট এর দক্ষিণ-পশ্চিম (৯০°৩৭.৭'E এবং ২৩°১৫.৯'N) শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার তারাবুনিয়া পয়েন্ট এর দক্ষিণ-পশ্চিম (৯০°৩৫.১'E এবং ২৩°১৩.৫'N)	প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল

(খ) নিম্নের সারণির (১) নং কলামে উল্লেখিত ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র এবং (২) নং কলামে উল্লেখিত প্রদান প্রজনন কাল এ সারাদেশে ইলিশ মাছ বহন, পরিবহন, প্রদান, বিক্রি, প্রদর্শন বা দখল-

সারণি

ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র	প্রধান প্রজনন কাল
১	২
মোয়ানি পয়েন্ট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম এর উত্তর-পূর্ব (৯১°৩২.১৫'E এবং ২২°৪২.৫৯'N) পশ্চিম সৈয়দ আওলীয়া পয়েন্ট, তাজুমদ্দিন, ভোলা এর উত্তর-পশ্চিম (৯০°৪০.৫৮'E এবং ২২°৩১.১৬'N) উত্তর কুতুবদিয়া পয়েন্ট, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার এর দক্ষিণ-পূর্ব (৯০°৫২.৫১'E এবং ২১°৫৫.১৯'N) লতা চাপালি পয়েন্ট, কলাপাড়া, পটুয়াখালী এর দক্ষিণ-পশ্চিম (৯০°১২.৫৯'E এবং ২২°৪৭.৫৬'N)	গবেষক ও অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম বাংলা মধ্য আশ্বিন হতে মধ্য কার্তিক মাসের পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যার সময়ের আগে পরে পর্যায়ক্রমে মোট ২২ (বাইশ) দিন সকল প্রকার মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ০৫ আগষ্ট, ২০২১ খ্রি. তারিখের এস, আর, ও নং ২২৩-আইন/২০২০ দ্বারা সংযোজিত।)

(২) উপ-বিধি (১) লংঘন করলে যে কোনো যন্ত্র দ্বারা ধৃত মাছ জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

১৪। হালদা নদীর কতিপয় অংশে নির্ধারিত সময়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ১৫ মে, ২০০৬ খ্রি. তারিখের এস, আর, ও নং ৭৫-আইন/২০০৬ দ্বারা সংযোজিত।)

১৫। মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা এলাকা ঘোষনা (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ১৫ মে, ২০০৬ খ্রি. তারিখের এস, আর, ও নং ৭৫-আইন/২০০৬ দ্বারা সংযোজিত।)

১৬। পিরানহা মাছের আমদানি, **বিক্রয় ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঃ** (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ খ্রি. তারিখের এস, আর, ও নং ৪১-আইন/২০০৮ দ্বারা সংযোজিত।)
কোন ব্যক্তি পিরানহা গ্রুপের মাছের প্রজাতি আমদানি, বহন, প্রজনন, চাষ, বিক্রয়, গ্রহণ, বাজারজাতকরণ, প্রদর্শণ ক ও ভোগ করিতে পারিবে না।

১৭। জলাশয় শুকিয়ে বা সেচে মাছ বিনাশ করা বা বিনাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা নিষেধঃ (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ২৯ মে, ২০১৪ খ্রি. তারিখের এস, আর, ও নং ৯৮-আইন/২০১৪ দ্বারা সংযোজিত।)
(১) কেউ জলাশয় শুকিয়ে বা সেচে মাছ বিনাশ করা বা বিনাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারিবে না:
তবে শর্ত থাকে যে, মাছ চাষের ক্ষেত্রে উক্ত নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।
(২) উপবিধি (১) লংঘন করিলে মাছ ধরার জাল, খাঁচা, ফাদ, যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, ফিক্সড ইঞ্জিন, নৌকা, যানবাহন বা অন্য কোনো কৌশল মাছ ধরার ক্ষেত্রে ব্যবহার বা পরিচালনা করলে তা জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

১৮। *Clarias gariepinus*(**আফ্রিকান মাগুর**) **মাছ আমদানি, প্রজনন, চাষ, বিক্রয় ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঃ** (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ২৯ মে, ২০১৪ খ্রি. তারিখের এস, আর, ও নং ৯৮-আইন/২০১৪ দ্বারা সংযোজিত।)
কোন ব্যক্তি*Clarias gariepinus* (স্থানীয় নাম-আফ্রিকান মাগুর) মাছ আমদানি, প্রজনন, চাষ, পরিবহন, বিক্রয়, গ্রহণ, বাজারজাতকরণ, মজুদ, প্রদর্শণ করা যাইবে না।

১৯) নতুন অভয়াশ্রম ঘোষণাঃ যমুনা নদীর অভয়াশ্রম (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ২২ফেব্রয়ারী, ২০২১ খ্রি. তারিখের এস, আর, ও নং ৪৬-আইন/২০২১ দ্বারা সংযোজিত)

ক্রমিক নং	মৎস্য অভয়াশ্রম এলাকা	সীমানা বিন্দু		সময়সীমা
১	চর পৌলি, সদর, টাঙ্গাইল হইতে দূর্গা মন্দির, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল (উত্তরে মোট দৈর্ঘ্য ১২.৫০ কি.মি. এলাকা দৈর্ঘ্য)	চর পৌলি, সদর, টাঙ্গাইল	দূর্গা মন্দির, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল	জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর
		২৪°৩৩'৯৯.৭৯" উ, ৮৯°৮১'৭৭.৩২" পূ.	২৪°৪৪'৭৬.৪৭" উ, ৮৯°৮২'৫৮.২০" পূ.	
২	মুকুন্দি, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ হইতে চায়না ড্যাম-০৩, কালিয়া, সদর, সিরাজগঞ্জ (উত্তরে মোট দৈর্ঘ্য ১২.৪৪ কি.মি. এলাকা)	মুকুন্দি, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	চায়না ড্যাম-০৩, কালিয়া, সদর, সিরাজগঞ্জ	
		২৪°৩৪'১২.০৫" উ, ৮৯°৭৬'২২.০৪" পূ.	২৪°৪৪'৫৪.৪২" উ, ৮৯°৭২'৮৫.৫৭" পূ.	
৩	চর পৌলি, সদর, টাঙ্গাইল হইতে মুকুন্দি, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ (যমুনা নদীর ৪.৬ কি.মি. প্রস্থ)	চর পৌলি, সদর, টাঙ্গাইল	মুকুন্দি, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	
		২৪°৩৩'৯৯.৭৯" উ, ৮৯°৮১'৭৭.৩২" পূ.	২৪°৩৪'১২.০৫" উ, ৮৯°৭৬'২২.০৪" পূ.	
৪	দূর্গা মন্দির, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল হইতে কালিয়া, সদর, সিরাজগঞ্জ (যমুনা নদীর ৯.৮৬ কি.মি. প্রস্থ)	দূর্গা মন্দির, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল	চায়না ড্যাম-০৩, কালিয়া, সদর, সিরাজগঞ্জ	
		২৪°৪৪'৭৬.৪৭" উ, ৮৯°৮২'৫৮.২০" পূ.	২৪°৪৪'৫৪.৪২" উ, ৮৯°৭২'৮৫.৫৭" পূ.	
গড় দৈর্ঘ্য ১২.৪৭ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৭.২৩ কি.মি. এবং মোট ৯০.১৪৮১ বর্গ কি.মি. এলাকা।				

➢ Marine Fisheries Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXV of 1983) এর Section 28 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, বাংলাদেশ মৎস্য জলসীমার (Bangladesh Fisheries Waters) অভ্যন্তরে নিম্ন তফসিলে বর্ণিত এলাকাকে 'নিঝুমদ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত (marine reserves) এলাকা' হিসাবে এতদ্বারা ঘোষণা করিল (এস. আর. ও. নং ২১১-আইন/২০১৯) যথা:-

➢ তফসিল

কৌণিক বিন্দু	দূরত্ব (কি.মি.) এবং সূত্র বিন্দু হইতে দিক	ভৌগোলিক অবস্থান (সীমান) জিপিএস কো-অর্ডিনেট	মোট আয়তন
১	মেরিন রিজার্ভ/ এমপিএ এর উত্তর পশ্চিম; পায়রা বন্দর হইতে ২৩.৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে	২১°৪৮'৪৯.০৬" উ, ৯০°২৪'১৭.২৯" পূ.	৩,১৮৮ বর্গ কিলোমিটার
২	মেরিন রিজার্ভ/ এমপিএ এর উত্তর ১নং কৌণিক বিন্দু হইতে ২০.০ কি.মি. পূর্বে; পায়রা বন্দর হইতে ৩৮.৩ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে	২১°৪৮'৪৯.০৬" উ, ৯০°৩৫'৫৬.৭২" পূ.	
৩	২নং কৌণিক বিন্দু হইতে উত্তর-পূর্বে; চরফ্যাশান সদর হইতে ১৪.৭ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে	২২°৩'১৪.২১" উ, ৯০°৪৭'২.৪৪" পূ.	
৪	৩নং কৌণিক বিন্দু হইতে ১৪.৫ কি.মি. পূর্বে; মনপুরা হইতে ২২.৯ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে	২২°৩'১৪.২১" উ, ৯০°৫৫'২৭.৫১" পূ.	
৫	৪নং কৌণিক বিন্দু হইতে ৭.৪ কি.মি. উত্তর-পূর্বে; মনপুরা হইতে ১৫.৯ কি.মি. দক্ষিণ- পূর্বে	২২°৬'৪৮.৫৭" উ, ৯০°৫৭'২১.৯৮" পূ.	
৬	৫নং কৌণিক বিন্দু হইতে ৪.৮ কি.মি. পূর্বে; মনপুরা হইতে ১৬.২ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে	২২°৬'৪৮.৭৮" উ, ৯০°০'৭.২৩" পূ.	
৭	৬নং কৌণিক বিন্দু হইতে নিঝুম দ্বীপ জাতিয় উদ্যান এর পশ্চিম-দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা/চৌহদ্দি ঘিরে (১১.২ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে) এবং জাহাজ মারা হইতে ৬.৯ কি.মি. দক্ষিণ- পূর্বে	২২°৪'২৭.৮৭" উ, ৯১°৬'৯.৯৭" পূ.	
৮	মেরিন রিজার্ভ/ এমপিএ এর সর্ব উত্তর-পূর্বকোণ হইল ৭ নং কৌণিক বিন্দু হইতে ১৮.৪ কি.মি. পূর্বে; জাহাজ মারার ২২.৯ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে	২২°৪'২৭.৮৭" উ, ৯১°১৬'৫৩.৪৮" পূ.	
৯	মেরিন রিজার্ভ/ এমপিএ এর সর্ব দক্ষিণ-পূর্বকোণ হইল ৮ নং কৌণিক বিন্দু হইতে ৪৬.০ কি.মি. দক্ষিণে; জাহাজ মারার ৫৬.৪ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে	২২°৩৯'৩২.৫৫" উ, ৯১°১৬'৫৩.৪৮" পূ.	
১০	মেরিন রিজার্ভ/ এমপিএ এর সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইল ৯ নং কৌণিক বিন্দু হইতে ৯১.০ কি.মি. পশ্চিমে; পায়রা বন্দর হইতে ৫৬.৪ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে	২২°৩৯'৩২.৫৫" উ, ৯০°২৪'১৭.২৯" পূ.	

দ্বিতীয় তফসিল

(বিধি ৯ দ্রষ্টব্য)

(মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর ২৯ মে, ২০১৪ খ্রি. তারিখের এস, আর, ও নং ৯৮-আইন/২০১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।)

ক্রমিক নং	মাছের প্রজাতি	আকার	গময়কাল
১	২	৩	৪
১	কার্পস, যেমন-কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবাউস এবং ঘনিয়া	২৩ (তেইশ) সেন্টিমিটার এর নিচে	প্রতি বছর জুলাই হতে ডিসেম্বর
২	ইলিশ (জাটকা হিসেবে পরিচিত)	২৫ (পচিশ) সেন্টিমিটার এর নিচে	প্রতি বছর নভেম্বর হতে জুন
৩	পাংগাস (*Pangasius pangasius*)	৩০ (ত্রিশ) সেন্টিমিটার এর নিচে	ঐ
৪	ডসলন	ঐ	প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি হতে জুন
৫	ভোলা	ঐ	ঐ
৬	আইড়	ঐ	ঐ

৭	বোয়াল	ঐ	প্রতি বছর এপ্রিল হতে আগস্ট

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ১২, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১০ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০২০।—যেহেতু Protection and Conservation of Fish Act, 1950 (East Bengal Act No. XVIII of 1950), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 3 এর sub-section (5) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক (Protection and Conservation of Fish Rules, 1985, অতঃপর উক্ত Rules বলিয়া উল্লিখিত, এর অধিকতর সংশোধনের লক্ষ্যে এতদসম্পর্কিত বিষয়ে আপত্তি বা পরামর্শ আহবানক্রমে ১৭ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০১ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ৬৫-আইন/২০২০ এর মাধ্যমে প্রাক-প্রকাশনা করা হইয়াছিল; এবং

যেহেতু, উক্ত প্রাক-প্রকাশনায় উল্লিখিত ২ (দুই) মাস সময় ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং প্রস্তাবিত সংশোধনের উপর প্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শ অনুযায়ী উক্ত প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, সরকার প্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শ বিবেচনাক্রমে উক্ত Rules অধিকতর সংশোধনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

সেহেতু, উক্ত Act এর section 3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত Rules এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত Rules এর rule 10 এর sub-rule (1) এর clause (a) এর পর নিম্নরূপ নূতন clause (aa) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(aa) the forfeited live fry of fish or post larvae of shrimp and prawns of any kind, shall be released into the nearest suitable natural water bodies."।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হাবিবুর রহমান
যুগ্মসচিব

মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন -১৯৫০ এবং এর ধারা ০৩ অনুযায়ী প্রণিত মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৮৫ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ধারা ও বিধি

- এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত ০৫ মাস খাল, বিল, নদীতে বা এদের সাথে যুক্ত কোন জলাশয়ে শোল, গজার, টাকি মাছের পোনার ঝাঁক এবং মা-বাবা মাছ ধরা এবং ধরার কারন সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। বিধি-০৭

- নভেম্বর হতে জুলাই মাস পর্যন্ত ০৯ মাস ৩০ সেন্টিমিটার/ ১২ ইঞ্চির ছোট আকারের পাঙ্গাস (*Pangasius pangasius*) ধরা, নিজের দখলে রাখা, বহন, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৯)
- নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত ০৮ মাস জাটকা (২৫ সেন্টিমিটারের ছোট আকারের ইলিশ) ধরা, নিজের দখলে রাখা, বহন, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৯)
- এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ০৫ মাস ৩০ সেন্টিমিটার/ ১২ ইঞ্চির ছোট আকারের বোয়াল মাছ ধরা, নিজের দখলে রাখা, বহন, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৯)
- ফেব্রুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত ০৫ মাস ৩০ সেন্টিমিটার/ ১২ ইঞ্চির ছোট আকারের আইর মাছ ধরা, নিজের দখলে রাখা, বহন, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৯)
- চাষের উদ্যেশ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিবছর জুলাই হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২৩ সেন্টিমিটারের (৯ ইঞ্চি) ছোট আকারের কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবউস, ঘনিয়া মাছ ধরা, নিজের দখলে রাখা, পরিবহন করা বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৯)
- আফ্রিকান মাগুর মাছের প্রজনন, চাষ , নিজের দখলে রাখা, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বিধি-১৮)
- পিরানহা মাছের প্রজনন, চাষ , নিজের দখলে রাখা, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। (বধি-১৬)
- নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য আহরণ করা নিষিদ্ধ। (বিধি -০৩)
- নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী/ অস্থায়ী বাঁধ বা কোন রকম অবকাঠামো নির্মান করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৪)
- বিষ প্রয়োগ, দূষণ, বানিজ্যিক বর্জ্য এর মাধ্যমে মাছ ধবংশের পদক্ষেপ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৬)
- উপকুলীয় অঞ্চলে মাছ ও চিংড়ির পোনা আহরণ ও আহরণের কারণ সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। (বিধি-০৮)
- ফিক্সড নেট/ স্থিরকৃত জাল (বেহুন্দী, বাঁধা, খুটা অন্যান্য) দিয়ে মাছ ধরা সারা বছর নিষিদ্ধ। (বিধি-১২ খ) ও বিধি-০৩।
- মশারী,বেড়, জগৎবেড়, কাথা, টানা জাল (০১ সে.মি. এর ছোট ফাঁস) দিয়ে মাছ ফাল্গুন থেকে শ্রাবন মাস নিষিদ্ধ। (বিধি-১২ ক)।
- ইলিশ আহরনের জন্য ৬.৫ সেমি (২.৬ ইঞ্চি) অপেক্ষা ছোট ফাঁসের জাল (ফাঁস জাল Gill net) যে নামেই অবহিত হোক না কেন তা ব্যাবহার নিষিদ্ধ ।
- সামদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত সকল মাছ ধরার নৌযানে বড় ফাঁসের ড্রিফট নেট এর জালের নূন্যতম ফাঁস ২০০ মি.মি. এবং ছোট ফাঁসের ড্রিফট নেট এর জালের নূন্যতম ফাঁস ১০০ মি.মি.।
- ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ ধরতে, বিক্রয় করতে, পরিবহন করতে, প্রদান করতে বা নিজস্ব এখতিয়ারে রাখতে পারবে না। (বিধি-১৩(১) বি)
- এই আইনের আওতায় বাজেয়াপ্ত মাছ এতিমখানা, গরীব, দুস্থদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে। (বিধি- ১০ (১) এ)
- আইনের আওতায় বাজেয়াপ্ত জীবিত মাছের পোনা, চিংড়ি পিএল নিকটস্থ উপযুক্ত natural wáter body এ অবমুক্ত করতে হবে। (বিধি- ১০ (১) (এএ)
- বায়েজাপ্তকৃত ফাদ, খাঁচা, নৌকা, যন্ত্রচালিত নৌকা, যানবাহন পাবলিক অকশনের মাধ্যমেবিক্রি করতে হবে। (বিধি- ১০ (১) বি)
- বায়েজাপ্তকৃত জাল তিনজন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে ধবংস করতে হবে। (বিধি-১০ (১) সি)
- মৎস্যঅফিসার বা সাব ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার নীচে নহেন এমন পুলিশ অফিসার এর রিপোর্ট বা অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনে অপরাধ আমলে নিবেন না । (ধারা ০৭)
- মাছচাষের উদ্দেশ্য ছাড়া উন্মুক্ত জলাশয় সম্পূর্ণ শুকিয়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ। (বিধি-১৭)

  উপরিউক্ত বিধি লংঘনের শাস্তি কমপক্ষে ০১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ০২ বছর সশ্রম কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ড। ধারা ৫(১)

- কোন ব্যাক্তি কারেন্ট জাল তৈরী, বুনন, আমদানি, বাজারজাত, মজুদ, বহন, পরিবহন, অধিকার, দখল, ব্যবহার করতে পারবেননা। (ধারা ০৪ ক (০১)

  কোন ব্যক্তি কারেন্টজাল তৈরী, বুনন, আমদানি, বাজারজাত বা মজুদ করলে কমপক্ষে ০৩ বছর থেকে সর্বোচ্চ ০৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড। ধারা ৫(২)ক।

  কোন ব্যক্তি কারেন্টজাল বহন, পরিবহন, অধিকার, দখল বা ব্যবহারকরলে কমপক্ষে ০১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ০৩ বছরের সশ্রম কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ০৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ড। ধারা ৫(২) খ।

ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে প্রচলিত আইন, আইন ভঙ্গের শাস্তি

জাটকা ইলিশ হচ্ছে ইলিশ মাছের নতুন প্রজন্ম। তাই জাটকা ধরা বন্ধ হলে বড় ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। মৎস্য সংরক্ষণ আইনে জাটকা (২৫ সে.মি আকারের ছোট ইলিশ- মুখের অগ্রভাগ থেকে লেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত) ধরা ১৯৫০ সাল থেকে নিষিদ্ধ থাকলেও অতীতে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও উপকরণগত সুবিধা না থাকায় এবং মৎস্য অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরের যৌথ প্রয়াস না হওয়ায় এ আইনটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণ এবং নির্বিচারে জাটকা আহরণের ফলে ইলিশের উৎপাদন ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেতে থাকে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং দেশে মৎস্য উৎপাদনের ইলিশের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে জাটকা রক্ষায় সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে। সরকার জাটকা রক্ষায় অভিযান পরিচালনা এবং জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন শীর্ষক দুটি আর্থিক খাত সৃষ্টি করে। এর আওতায় যে সব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলো হলো: জাটকা নিধন প্রতিরোধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা, জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি, ইলিশ অভয়াশ্রম ও ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন এবং জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও বিশেষ খাদ্য সহায়তা প্রদান। মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বিএফআরআই, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, বিভিন্ন সংস্থা, মৎস্যজীবী ও জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিগত ৫ বছর ধরে এ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ইলিশ উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ইলিশ সংরক্ষণ আইন ও আইন ভঙ্গের শাস্তি

সরকার ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য দি ইস্ট বেঙ্গল প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিস এ্যাক্ট, ১৯৫০ দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিস (এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২: দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিস (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০২ এবং দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিস রুলস, ১৯৮৫ এর অধীনে যথাক্রমে আইন এবং বিধি বিধান জারি করেছে। মৎস্য কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তার (সাব-ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার নিচে নয়) অভিযোগের ভিত্তিতে এ আইনের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এ আইন ভঙ্গ করা আমলযোগ্য অপরাধ (কগনিজিবল অফেন্স) এবং আইন ভঙ্গকারীকে ক্ষেত্র বিশেষে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করা যাবে। এ আইনের আওতায় সরল বিশ্বাসে গৃহীত কোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মেজিস্ট্রেটগণ এ আইন ভংগের বিচার করবেন। ইলিশ সংরক্ষণ আইনের বিভিন্ন ধারা ও আইন ভঙ্গের সাজা নিম্নরূপ

জাটকা ধরা, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ

জনপ্রিয়ভাবে জাটকা নামে পরিচিত ইলিশ মাছ ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সে.মি. এর নিচের আকার প্রতি বছর ১ নভেম্বর হতে পরবর্তী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত ধরা, ক্রয়-বিক্রয়, হেফাজতে রাখা এবং পরিবহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ফাঁস জালের (কারেন্ট জাল) ব্যবহার নিষিদ্ধ আইন

উপরিউক্ত ফিস এ্যাক্ট, রুল-১২ এর অধীনে ইলিশ মাছ ধরার জন্য ৬.৫ সে.মি বা তদপেক্ষা কম দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁস প্রচলিতভাবে কারেন্ট জাল/জাপানি কারেন্ট জাল/ ফান্দি জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বেহন্দি জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ

যে কোনো আকার, প্রকার, ধরন, ফাঁস বা মেশ সাইজ (Mesh Size) বিশিষ্ট নিম্নবর্ণিত জালের ব্যবহার দেশের সকল স্বাদু বা মিঠা পানির জলাশয়ে এবং সর্বোচ্চ জোয়ারে ১০(দশ) মিটার গভীরতা পর্যন্ত উপকূলীয় জলসীমায় বর্ণিত জালের পার্শ্বে উল্লিখিত সময়ের জন্য নিষিদ্ধঃ

জালের প্রকার	প্রচলিত নাম	স্থানীয় নাম	ব্যবহার নিষিদ্ধ সময়
স্থিরকৃত জাল (Fixed Net);	উপকূলীয় বেহুন্দি জাল (Estuarine Set Bag Net-ESBN);	বাঁধা জাল; পেকুয়া জাল; বিঙ্গি জাল, গাড়া জাল; চিংড়ি পোনা ধরা জাল; খুটি/খোটা জাল; টং জাল; বিন্দি জাল;	সারা বৎসর

জাটকার বিচরণ ক্ষেত্রে অভয়াশ্রম ঘোষণা ও প্রজনন মৌসুমে ২২ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ

উপরিউক্ত ফিস এ্যাক্ট, রুল ১৩ অধীনে জাটকা ইলিশ মাছের ৬টি অভয়াশ্রম ঘোষণা করে ৫টিতে প্রতিবছর মার্চ-এপ্রিল এবং একটিতে নভেম্বর-জানুয়ারি সকল প্রকার মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

একই আইনের বি তফসিলে ইলিশ মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে প্রতি বছর মধ্য আশ্বিন হতে মধ্য কার্তিক মাসের ২২ দিন প্রায় ৭,০০০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ইলিশ মাছ সহ সকল মাছ ধরা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত আইন ভঙ্গ করে মাছ ধরা হলে বা ধরার কারণ সৃষ্টি করা হলে ধৃত মাছ ও সরঞ্জাম আটক ও বাজেয়াপ্ত করা এবং আইন অনুযায়ী সাজা প্রদান করা যাবে।

আইন ভঙ্গের শাস্তি

উপরে বর্ণিত আইনসমূহ ভঙ্গ করা হলে আইন ভঙ্গকারীকে কমপক্ষে ১ থেকে ২ বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০০০/- টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ড প্রদান করা হবে।

সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এ আইনের অধীন ব্যবস্থা নেয়া যাবে। এ আইন ভঙ্গ করা আমলযোগ্য অপরাধ (কগনিজিবল অফেন্স) এবং আইন ভঙ্গকারীকে ক্ষেত্র বিশেষে বিনাওয়ারেন্টে গ্রেফতার করা যাবে। এই আইনের আওতায় সরল বিশ্বাসে গৃহীত কোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটগণ এই আইন ভঙ্গের বিচার করবেন।

জাটকা রক্ষায় অভিযান পরিচালনা

অভিযান শব্দের অর্থ আইন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ। জনসাধারণের স্বার্থে তথা দেশের উন্নয়নের জন্য সরকারের কোনো বিধিবদ্ধ আইন বা নীতিমালা বাস্তবে প্রয়োগের নিমিত্তে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহন করা হয় তাকে সাধারণভাবে অভিযান বলা যায়। অভিযান পরিচালনায় সরকারের স্বচ্ছ আইন-কানুন থাকবে এবং বাস্তবায়নকারীর ও উক্ত আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

জাটকা নিধনরোধে অভিযান পরিচালনায় গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ

ক। প্রচলিত মৎস্য সংরক্ষণ আইন যথাযথ প্রয়োগ

খ। ঘোষিত ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

গ। মৎস্য আইনের বাস্তবায়ন এবং এর পদ্ধতি মাত্রা, সুস্পষ্টতা পরিবীক্ষণ করা

ঘ। ইলিশের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সমূহে মাছ আহরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং এর বাস্তবায়ন

অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি উদ্ভব ও মোকাবিলা

প্রতিবছর নভেম্বর মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত জাটকা ইলিশ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়। তাছাড়া সারাবছর দেশের সর্বত্র কারেন্ট জাল উৎপাদন, পরিবহণ, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ রয়েছে। সরকার ঘোষিত ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় নির্ধারিত সময়ে মৎস্যজীবীরা জাটকাসহ কোনো ধরণের মাছ ধরতে না পারে এবং প্রতিবছর নভেম্বর মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত জাটকা ইলিশ ধরা এবং নিষিদ্ধঘোষিত জাল যাতে ব্যবহার করতে না পারে, সে বিষয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, উপজেলা প্রশাসন এবং মৎস্য অধিদপ্তর যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে থাকে। অভিযান সাধারনত কারেন্ট জাল বাজারজাতকরণ স্থানে এবং ব্যবহৃত স্থানে পরিচালনা করা হয়। নদীতে অভিযান পরিচালনার সময় ইঞ্জিনবোটে বা স্পীডবোটে স্বল্পসংখ্যক পুলিশ, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন। অভিযানের সময় নদীতে ব্যবহৃত কারেন্টজাল সহ জালে আটকানো সবধরনের ইলিশ মাছ জব্দ করে নিয়ে আসা হয়। ইলিশ বা জাল জব্দকালীন সময়ে মৎস্যজীবীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং অভিযান পরিচালনকারীগণের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে তারা নানারকম অশোভন আচরণ করে থাকে। অনেক সময় মৎস্যজীবীগণ অভিযান পরিচালনাকারীগণকে ঘেরাও অথবা তাদের লক্ষ করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে থাকে। এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে অভিযান পরিচালনাকারীগণকে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয় এবং তাদের সরকারি নীতিমালা ও আইন সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে ধারণা দিতে হয়। তাদের বুঝাতে হবে তারা জনগণের স্বার্থেই এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এবং সরকারের এই আইন

মেনে চললে মৎস্যজীবীগণ ভবিষ্যতে বড় বড় ইলিশ ধরতে পারবেন এবং তারা আরও অধিক লাভবান হবেন। মৎস্যজীবীদের নিকট আইন বাস্তবায়নে সহযোগীতা প্রার্থনা করতে হবে এবং জাটকা ধরার সুফল-কুফল সম্পর্কে তাদের ধারণা দিতে হবে। এতে মৎস্যজীবীগণ সহযোগিতা না করলে পরবর্তীতে আইনের আশ্রয় নিতে হয়।

জালের ফাঁসের দৈর্ঘ্য (Mesh size) পরিমাপ পদ্ধতি

মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রায়শ জালের ফাঁসের আকার (Mesh size) পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে সঠিক ধারণার অভাবে অনেক সময় বিভ্রান্তি দেখা দেয়। জালের ফাঁস সাধারণত বর্গাকৃতির এবং ৪টি বাহু দ্বারা গঠিত হয়। একটি বাহু দ্বারা একটি ফাঁস তৈরি হয় না। কাজেই জালের ফাঁসের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে দুটি বাহুর দূরত্ব, যা প্রকৃতপক্ষে তিনটি গিট এর দূরত্বের সমান বা ফাঁসটি টেনে সোজা করলে যে দূরত্ব পাওয়া যায় নিয়ে জালের ফাঁসের চিত্র এবং পরিমাপের পদ্ধতি দেয়া হলো :

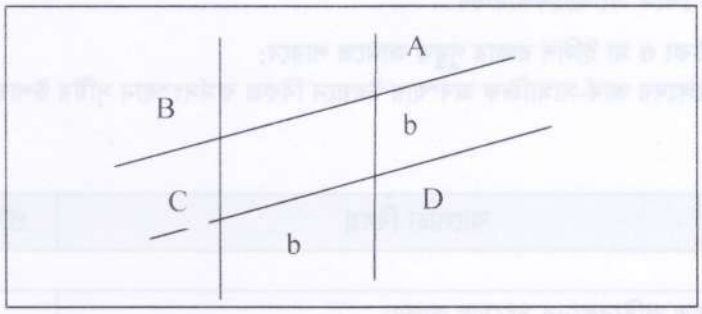

উপরের চিত্রে AB, BC, CD এবং DA চারটি বাহু দিয়ে একটি জালের ফাস গঠিত হয়েছে। এ পর্যায়ে জালের ফাঁসের দৈর্ঘ্য হবে AB+ BC অথবা AD + DC। জালের ফাঁসের A এবং B প্রান্ত অথবা B এবং D প্রান্ত ধরে টেনে লম্বা করলে একটি দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে যা AB+BC অথবা AD+CD এর সমান হবে। এ প্রেক্ষাপটে জালের ফাঁসের দৈর্ঘ্য হবে AC অথবা BD প্রান্তের সমান দূরত্ব বা b+b । এক্ষেত্রে b হচ্ছে দুটি গিরার সমান দূরত্ব যে কোনো সাধারণ স্কেল ব্যবহার করে জালের একটি ফাস টেনে লম্বা করে ফাঁসের দৈর্ঘ্য সহজেই পরিমাপ করা যেতে পারে।

আটককৃত জাল ও সরঞ্জামাদি বাজেয়াপ্ত ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

মৎস্য সংরক্ষণ আইন ২০০২ এর সংশোধনী (২১/৯/২০০২) তে আটককৃত জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি বাজেয়াপ্ত ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তবে ২০০২ সালের সংশোধনী ধারার ওপর রিট মামলা বিচারাধীন রয়েছে। উক্ত সংশোধনী ধারা মোতাবেক আটককৃত কারেন্ট জাল ও অন্য সরঞ্জামাদি জব্দ অথবা আটক করার ৩০ দিন পর ধ্বংস করা যাবে। বাস্তবে আটকৃত কারেন্ট জালগুলো নির্ধারিত স্থানে একত্রিত করে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে পোড়ানো হয়ে থাকে এবং আটককৃত অন্য সরঞ্জামাদি যথা- নৌকা, ট্রলার ইত্যাদি আটকের ৩০ দিন পর মালিকের বরাবরে মুচলেকা দিয়ে ফেরত দেয়া হয় নতুবা নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে বিক্রিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয় ।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০১	অধিবেশন নং- ০৫	সময়: ১৫:০০-১৬:০০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার গুরুত্ব এবং জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি

অভীষ্ট দল: বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নির্বাচিত সুফলভোগী জেলে

লক্ষ্য:
- এ অধিবেশনে জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার গুরুত্ব এবং সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপায় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দেয়া হবে, যাতে তারা ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দেশ্য *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –*
- জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার গুরুত্ব জানতে পারবে;
- জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপায় জানতে পারবে;

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			১০ মিনিট
	• গত অধিবেশনের সংযোগ স্থাপন; • বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা; • বর্তমান অধিবেশনের শিক্ষণ উদ্দেশ্যের বর্ণনা এবং • উদ্বুদ্ধকরণ।	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৪০ মিনিট
	• ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার গুরুত্ব; • জাটকা ও মা ইলিশ জেলেদের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ;	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	• শিক্ষণীয় মূল বিষয়ের পুনরালোচনা; • অধিবেশনের উদ্দেশ্য যাচাই; • হ্যান্ড আউট বিতরণ ও পড়ানো • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত এবং • ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষার গুরুত্ব

সাধারণত ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সে.মি. আকারের ছোট ইলিশের পোনা জাটকা নামে পরিচিত।

- আজকের জাটকা-ই আগামী দিনের ইলিশ
- প্রাকৃতিকভাবে ছোট আকারের ইলিশ প্রতিপালন করে ইলিশের উৎপাদন উৎপাদন বৃদ্ধি;
- প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশের নির্বিঘ্নে প্রজনন;
- ইলিশ মাছের প্রবেশন প্রক্রিয়া অব্যহত
- ইলিশের উৎপাদন কাঙ্খিত পরিমানে বৃদ্ধিকরণ;
- টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক জলজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ইলিশ উৎপাদন কাঙ্খিত পর্যায়ে বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস; এবং
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধিকরণ।

জাটকা

সাধারণত: কিশোর ইলিশই বাংলাদেশে জাটকা নামে পরিচিত। অনেক স্থানে জাটকাকে চাপিলা, চাপিলি ইত্যাদিও বলা হয়। ১০সেঃমিঃ অথবা ২৫ সেঃমিঃ পর্যন্ত আকারের কিশোর ইলিশকে জাটকা বলা হয়।জাটকা দেখতে অনেকাংশে চাপিলা মাছের মতো। চাপিলা মাছ Clupeiformes বর্গের Clupeidae পরিবারভুক্ত Gudusia এবং Gonialosa গণের মাছ।অপর দিকে ইলিশ বা জাটকা মাছ Clupeiformes বর্ণের Clupeidac পরিবারভূক্ত Tenualosa গণের মাছ। অর্থাৎ চাপিলা ও জাটকা মাছ দু'টি পৃথক গণের মাছ। মাঠ পর্যায়ে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমে অনেক সময় জাটকা ও চাপিলা মাছের পাথর্ক্য নির্ণয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। নিম্ন বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মাধ্যমে সহজে শনাক্তকরণ করা যায়।

জাটকা	চাপিলা
১. জাটকা মাছের পিঠে ও পেটের দিকে প্রায় সমভাবে উত্তল। ২. চাপিলার তুলনায় জাটকার দেহ পার্শ্বীয়ভাবে পুরু। ৩. আঁইশের আকৃতি অপেক্ষায় বড়, সংখ্যায় কম এবং নিয়মিত সারিতে সাজানো । ৪. চোখের আকৃতি অপেক্ষায় ছোট। ৫. মাথার আকৃতি অপেক্ষায় লম্বাটে ও অগ্রভাগ সূচালো । ৬. তাজা (Fresh) জাটকা মাছের গন্ধ ইলিশ মাছের গন্ধের মতো। ৭. জাটকা মাছ রান্না করার সময় বা রান্না পরে ইলিশ মাছের গন্ধ পাওয়া যায়।	১. চাপিলা মাছের পিঠের চেয়ে পেটের দিক অপেক্ষাকৃত বেশি উত্তল ও প্রশস্ত। ২. জাটকার তুলনায় চাপিলার দেহ পার্শ্বীভাবে পাতলা। ৩.আঁইশের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট, সংখ্যায় অনেক বেশি।পাশ্বরেখা বরাবর এক সারিতে আঁইশের সংখ্যা৮০-১২০। ৪. চোখের আকৃতি অপেক্ষাকৃত বড়। ৫. মাথার আকৃতি অপেক্ষাকৃত খাটো ও অগ্রভাগ ভোঁতা। ৬. চাপিলা মাছের গন্ধ ইলিশ মাছের মতো নয়। ৭. চাপিলা মাছ রান্না করার সময় বা রান্না করার পরে ইলিশ মাছের গন্ধ পাওয়া যায় না।

ইলিশ ও জাটকা আহরণে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী ও তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কমনওয়েলথ সাইন্টিফিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অর্গানাইজেশন এর এক যৌথ সমীক্ষায় দেখা যায়, ইলিশ মাছ ধরার স্থান হতে খুচরা বিক্রেতা এবং শেষ পর্যায়ে ভোক্তার (Consumer) নিকট পৌঁছা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে গড়ে প্রায় ২ জন হতে ৬ জন লোক প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে ইলিশ বিপণনে জড়িত থাকে। এ পর্যায়ে মাছ ধরা হতে ভোক্তার নিকট পৌঁছা পর্যন্ত প্রায় ২০ হতে ২৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের জন্য ইলিশ মাছের ওপর আংশিক বা সার্বক্ষণিকভাবে নির্ভরশীল।

ইলিশ ও জাটকা জেলেগণ দেশের অত্যন্ত গরিব শ্রেণীভুক্ত জনগোষ্ঠী। তাদের অধিকাংশেরই ভিটে মাটি নেই এবং তারা অন্যের জমিতে বসবাস করে। এমনকি অনেক জেলে পরিবার আছে যাদের কোনো স্থায়ী বসতবাড়িও নেই। তারা বছরের অধিকাংশ সময় মাছ ধরার নৌকায় বাস করে।

বাংলাদেশে সাধারণত তিন প্রকারের জাটকা ও ইলিশ জেলে রয়েছে। যথা নৌকার মালিক (Boat owner) প্রধান মাঝি (Head mazhi) এবং ক্রু/নাবিক জেলে (Crew)। সাধারণত নৌকার মালিক, নৌকা ও জালের স্বত্বাধিকারী সে প্রধান মাঝিকে মাছ ধরার জন্য নৌকা ও জাল দিয়ে থাকে। প্রধান মাঝি, সহকারী প্রধান মাঝি, নৌকা চালক ও নাবিক জেলেদের নিয়ে মাছ আহরণ করে থাকে। নৌকার মালিকগণ পরোক্ষভাবে ইলিশ আহরণের সহিত জড়িত। প্রকৃতপক্ষে মাঝি, নৌকাচালকসহ জেলেগণ ইলিশ ও জাটকা আহরণে জড়িত। ইলিশ ও জাটকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই দুর্বল। নিম্নে জেলে পরিবারের আকার ও গঠন, শিক্ষার স্তর, খামার আয়তন, পেশা, কাজের অভিজ্ঞতা, বাৎসরিক আয় ইত্যাদি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

- **পরিবারের আকারঃ** পরিবার বলতে সাধারণত একান্নভুক্ত সদস্যদেরকে বুঝায়। পরিবারের আকার ও গঠন নির্ভর করে পেশা ও আয়ের উপর বিভিন্ন তথ্যসূত্রে জানা যায় যে, জাটকা ও ইলিশ আহরণে সংশ্লিষ্ট জেলে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬-৮ জন। ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পরিবারের গড় আকার বংলাদেশের পরিবারের জাতীয় গড় আকার এর চেয়ে বেশ বড়।
- **শিক্ষার স্তরঃ** শিক্ষা পেশা নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। ইলিশ ও জাটকা জেলেদের একটি বড় অংশ নিরক্ষর। তথ্যসূত্রে জানা যায়, তাদের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষিতের হার মাত্র শতকরা ৩৫ ভাগ এবং মাধ্যমিক স্ত রের শিক্ষিতের হার শতকরা ১০ ভাগ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষিতের হার নেই বললেই চলে।
- **খামার বা জমির আয়তনঃ** প্রধান মাঝি ও নাবিকদের খামার বা জমির গড় আয়তন যথাক্রমে ১.০১ একর এবং ০.৯৪ একর, যার মধ্যে বাসস্থান যথাক্রমে ০.২১ একর এবং ০.০৭ একর। অবশিষ্ট অংশ বর্গা ও বন্ধক নেয়া এবং কিছু নিজস্ব জমি। যেসব ইলিশ ও জাটকা জেলে প্রধান পেশা হিসেবে মাছ আহরণের ওপর নির্ভরশীল তাদের ৬০ ভাগ জেলের নিজস্ব কোনো চাষ যোগ্য জমি নেই, বাসস্থানের গড় আয়তন মাত্র ০.০৭ একর। এমনকি অনেক জেলের নিজস্ব বাসস্থানও নেই। তারা রাস্তার পাশে, খাস জমিতে, অথবা ভাড়া জমিতে বাস করে। তাদের ৬০ ভাগেরও বেশি লোক নিরক্ষর, তারা সম্পদহীন ও নিম্নআয়ের শ্রেণীভুক্ত। বিকল্প কোনো কাজ থেকে আয় উপার্জনও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাদের জীবিকা নির্বাহ তথা বেঁচে থাকার জন্য ইলিশ ও জাটকা আহরণ করতে বাধ্য হয়। এ কারণে ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পুনর্বাসন করা অপরিহার্য।
- **অভিজ্ঞতাঃ** কোন পেশার মেয়াদই তার অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করে শতকরা প্রায় ৬৯ ভাগ প্রধান মাঝি এবং ৩৫ ভাগ নাবিকের গড় অভিজ্ঞতা ১০ বছরের বেশি এবং ২৫ ভাগ প্রধান মাঝি এবং ২৭ ভাগ নাবিকের গড় অভিজ্ঞতা ১০ বছরের নিচে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রধান মাঝিদের গড় অভিজ্ঞতা নাবিকের চেয়ে বেশি।
- **পেশাঃ** ইলিশ ও জাটকা জেলেদের পেশার ধরন দেশের সর্বত্র প্রায় একইরূপ। তবে তাদের পেশার বিশেষায়নের সাথে পেশার ধরনে তারতম্য ঘটতে পারে। প্রধান মাঝি সম্পূর্ণরূপে ইলিশ ও জাটকা মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত। তার অন্য পেশায় নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ নেই বা থাকলেও তা এর চেয়ে লাভজনক নয়। তবে জেলে/নাবিকদের মধ্যে পেশার কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। নাবিকগণ এ পেশার পাশাপাশি সুযোগমত অন্যান্য খন্ডকালীন পেশা যেমন কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দিনমজুরি ইত্যাদির সাথে জড়িত। তবে কিছু খন্ডকালীন পেশা লাভজনক হলেও মূলধন সমস্যার কারণে তারা সেগুলো করার সুযোগ পায় না।
- **বাৎসরিক আয়ঃ** কিছুসংখ্যক ইলিশ ও জাটকা জেলে বিভিন্ন ধরনের উপপেশায় নিয়োজিত থাকলেও তাদের আয়ের প্রধান উৎস হলো মৎস্য আহরণ। তবে তাদের বাৎসরিক আয় এলাকা ও মৎস্য প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। যেমন চট্টগ্রামের একজন প্রধান মাঝি ও একজন নাবিক বছরে যথাক্রমে গড়ে প্রায় ৪৮,০০০.০০ টাকা ও ১৯,০০০.০০ টাকা আয় করে সেখানে দেশের অন্য সকল এলাকার প্রধান মাঝি ও নাবিকগণ বছরে যথাক্রমে গড়ে প্রায় ৩৯,০০০,০০ টাকা এবং ১৪,৪০০.০০ টাকা আয় করে।

মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিকল্প কর্মসংস্থান

কর্মসংস্থান কী ?

কর্মসংস্থান হলো কর্মীর কর্ম সৃজন বা কাজের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি অর্থাৎ যে কর্ম বা কাজের দ্বারা কর্মী আয় উপার্জন করে। অর্থাৎ, কর্মীর নিজ উদ্দোগে বা অন্যের সহযোগিতায় এমন কর্মক্ষেত্র তৈরি হয় যেখানে কর্ম করে বা শ্রম দিয়ে কর্মী আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন।

কর্মসংস্থান কেন ?

জীবন ধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ বা যোগানের জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতার নিমিত্ত প্রত্যেক মানুষের অর্থের প্রয়োজন হয়। যার দ্বারা তিনি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ বা ক্রয় করতে সক্ষম হন। উক্ত অর্থ অর্জনের জন্য প্রত্যেক মানুষকে কোন না কোন কাজ করতে হয়। উক্ত কাজের বিনিময়ে অর্জিত হয় অর্থ। সুতরাং অর্থ উপার্জনের জন্য চাই কর্ম। আর কর্মের জন্য চাই কর্মক্ষেত্র। কর্মক্ষেত্র মানেই কর্মসংস্থান। মোটকথা জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের জন্য মানুষের কর্মসংস্থান আবশ্যক।

বিকল্প কর্মসংস্থান কী ?

জীবিকা নির্বাহের দৈনন্দিন সামগ্রী যোগানের তাগিদে প্রত্যেক মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য কোন না কোন কর্মে রত। হয় শারিরীক, নয় বুদ্ধিবৃত্তিক। এটিই ব্যক্তির মূল কর্ম। কোন কারণে মূল কর্ম স্থায়ী বা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে এরকম বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থার সহযোগিতায় যে কর্ম সৃজন বা সংস্থান করে থাকেন তাকে সাধারণভাবে বিকল্প কর্মসংস্থান (Alternate Income Generating Activities- AIGA) বলা হয়। যদি মূল বা বিকল্প কর্মে উপার্জিত অর্থে প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানো সম্ভব না হয় তখন আয়বর্ধক অন্য কোন কর্ম সৃজন বা সন্ধান করতে হয়। উক্ত কর্মকে বাড়তি আয়বর্ধক কর্মসংস্থান (Extra Income Generating Activities- EIGA) বলা যেতে পারে।

মৎস্যসম্পদ ও মৎস্যজীবী শ্রেণি:

বাংলাদেশ আদিকাল থেকেই উন্নততর জলজসম্পদে সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিকভাবেই বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যসম্পদে প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গতকারণে এ দেশের আপামর জনগোষ্ঠী মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। সিংহভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকাও মৎস্যসম্পদ নির্ভরশীল। আবহমানকাল থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই মাছ ধরা বা শিকারে অভ্যস্থ। তন্মধ্যে এক বিরাট অংশ সারা বছর মাছ ধরা, মাছ ধরার উপকরণ তৈরি, মাছ বিক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কাজে জড়িত যাদেরকে আমরা জেলে সম্প্রদায় বা মৎস্যজীবী শ্রেণি বলি। হাজার বছরের বংশ পরম্পরায় গড়ে উঠেছে এ সম্প্রদায়। যদিও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে প্রকৃতি প্রদত্ত এ মৎস্যসম্পদ বছরের পর বছর হ্রাস পাচ্ছে। তথাপি দেশের প্রায় শতকরা ১২ ভাগ লোকের জীবন-জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আজও মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল, যার প্রায় এক-চতুর্থাংশই মৎস্যজীবী।

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানা কারণ যেমন নদী ভরাট, নাব্যতা হ্রাস, শিল্পবর্জ্য দূষণ ও ফসলক্ষেতে নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহারের প্রভাব, ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মিটাতে নির্বিচারে মৎস্য আহরণ ইত্যাদির ফলে প্রকৃতি প্রদত্ত জলজসম্পদের উৎপাদনশীলতা বছরের পর বছর হ্রাস পায়। ফলে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে প্রয়োজন দেখা দেয় সরকার কর্তৃক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ। সে লক্ষ্যে ১৯৫০ সালে প্রণীত হয় মৎস্য সংরক্ষণ আইন। উক্ত আইন প্রধানত ডিমওয়ালা মাছ রক্ষা ও নির্দিষ্ট আকার পর্যন্ত কতিপয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে জাতীয় স্বার্থে প্রজাতিভিত্তিক সম্পদ সংরক্ষণে সংশোধিত হয় উক্ত আইন। যেমন ভরা প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণে নিষেধাজ্ঞা, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাটকা ধরা নিষিদ্ধ ইত্যাদি।

মৎস্যসম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন অপরিহার্য বলেই প্রতীয়মান। তবে মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের ফলে সাময়িকভাবে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় কর্মহীন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ইলিশ আহরণে জড়িত মৎস্যজীবী/জেলেগণকে ভরা প্রজনন মৌসুমে ২২ দিন এবং জাটকা সংরক্ষণ মৌসুমে ৮ মাস ইলিশ আহরণ থেকে বিরত রাখার বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়। এ সময় মৎস্য অধিদপ্তর স্থানীয় প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা বাহিনীর সহযোগিতায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের ফলে ইলিশ বা জাটকা ধরা থেকে নিষিদ্ধ করায় ইলিশ নির্ভর জেলেরা সাময়িকভাবে সংকটে পড়ে। ফলে মৎস্যজীবীগণ মাছ ধরতে না পারায় তারা কর্মহীন হয়ে পড়ে এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ইলিশ নির্ভর জেলেরা যাতে ভরা প্রজনন ও জাটকা মৌসুমে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকলেও পরিবার-পরিজন নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তজ্জন্য সরকার জেলেদের **আর্থসামাজিক উন্নয়নে** কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন আইডি কার্ডধারী জেলে পরিবারকে ভিজিডি, ভিজিএফ সহায়তা প্রদান, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন, বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ সহায়তা প্রদান, ইত্যাদি।

মৎস্য সেক্টরে বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসংস্থান

সামগ্রিক বিবেচনায় সরকার মৎস্যজীবীদের বিকল্প আয়বর্ধকমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। এ দেশের প্রেক্ষাপটে মৎস্যজীবী ও পরিবারের সদস্যরা বিকল্প যে সকল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হতে পারে, তা নিম্নরূপ:

১. জাল বুনন
২. বাঁশজাত সামগ্রী প্রস্তুত
৩. ক্ষুদ্র ব্যবসা

৪. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুটকি তৈরি
৫. হাঁস-মুরগী পালন
৬. বৃক্ষ নার্সারি স্থাপন
৭. গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ
৮. ছাগল/ভেড়া পালন
৯. পুকুরে মাছ চাষ ও নার্সারি পরিচালনা
১০. প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ
১১. খাঁচায় মাছ চাষ
১২. পেনে মাছ চাষ
১৩. রিক্সা/ভ্যান চালনা
১৪. সেলাই মেশিন, ইত্যাদি।

এছাড়াও স্থানীয় উপযুক্ততা ও চাহিদার ভিত্তিতে আরো অনেক বিকল্প কর্মক্ষেত্র তৈরি করা যায়। যা থেকেও পারিবারিক স্বচ্ছলতার লক্ষ্যে বর্ধিত আয় সম্ভব। **ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা** প্রকল্পের আওতায় ২৯ জেলার ১৩৪ টি উপজেলার ৩০,০০০০ জন ইলিশ আহরণকারী মৎস্যজীবী/জেলে সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ২৫,০০০০,০০ টাকা মূল্যমানের লাগসই বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে উপকরণ সহায়তা প্রদানের সংস্থান রয়েছে।

জেলেদের বিকল্প উপায়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য সহায়তা প্রদান (বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি)

আমাদের দেশের জেলে সম্প্রদায় বিশেষত: জাটকা ও ইলিশ জেলেরা সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণির সদস্য। মাছ ধরা ছাড়া তাদের জীবিকার আর বিকল্প কোনো উৎস নেই। আমরা জানি, মৎস্য সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ০১ নভেম্বর হতে ৩০ জুন পর্যন্ত দেশে সকল নদী, উপকূল ও সাগরে জাটকা ধরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও অক্টোবর মাসে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে সংশোধিত আইন অনুযায়ী ২২দিন সারাদেশব্যাপী ইলিশ আহরণ বন্ধ থাকে। এই নিষিদ্ধ সময়ে দরিদ্র জেলেরা তখন অর্ধাহারে অনাহারে তাদের দিন কাটায়। তখন সংসার চালানোর জন্য তারা মহাজন বা দাদনদার হতে টাকা ধার করে। তারা অনেকটা দিনমজুরের মতো মহাজনের নৌকা ও জাল নিয়ে মাছ ধরে। ফলশ্রুতিতে জেলেরা মহাজন বা দাদনদার আদেশ নির্দেশ শুনতে বাধ্য হয়। ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার জন্য জেলেরা নিষিদ্ধ সময়ে জাল ও নৌকা নিয়ে অবৈধভাবে মাছ আহরণে লিপ্ত হয়। জেলেদের এই অবস্থার উন্নয়নের জন্য **ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা** প্রকল্পে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নিরিহ জাটকা ও ইলিশ জেলেদের স্বাবলম্বী করা তথা নিষিদ্ধ সময়ে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এই লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে ইলিশসমৃদ্ধ ১৩৪টি উপজেলা হতে অতিদরিদ্র জেলেদের শনাক্ত করে তাদের চাহিদার ভিত্তিতে এলাকার জন্য উপযোগী বিকল্প অন্য পেশায় নিয়োজিত করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ সময়ে মৎস্যজীবিদের মাছ ধরা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কিন্তু গরীব মৎস্যচাষি/ মৎস্যজীবিগণ এ সময়ে অন্য কোন কার্যক্রমে জড়িত না থাকলে তাদের সংসার চলে না। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে গরীব নিবন্ধিত জেলেদের জন্য সেলাই মেশিন, ভ্যান/রিকসা, ছাগল/ভেড়া, হাঁস/মুরগি, ডিস্কেলিং মেশিন/ফিশ চপিং মেশিন ছাড়াও বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় সুফলভোগীদের চাহিদা মোতাবেক ব্যয় অপরিবর্তনীয় রেখে অন্যান্য উপকরণ যেমন জাল বুনন, বাঁশজাত সামগ্রি প্রস্তুত, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্য ব্যবসা, মাছ শুটকীকরণ, প্লাবনভূমি/বিলে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ, খাঁচায়/পেনে মাছ চাষ, গরু মোটা-তাজাকরণ, গাভী ও বকনা বাছুর পালন ইত্যাদি আয়বর্ধক কার্যক্রমের সংস্থান প্রকল্পে রাখা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের পর প্রত্যেক সদস্যকে আয়বর্ধক কাজের সহায়তা দেয়া হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার/উপজেলা মৎস্য অফিসার (১)মৎস্য অধিদপ্তরের জেলে কার্ডধারী (FID)/নিবন্ধিত প্রকৃত জেলে হতে হবে (২) দুস্থ, প্রান্তিক ও ভূমিহীন বা নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত জেলে অগ্রাধিকার প্রাপ্য হবেন (৩) যে সকল জেলের নিজস্ব জাল/নৌকা নেই এমন জেলে অগ্রাধিকার পাবেন(৪) সারা বছর প্রধানত ইলিশ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন জেলে এবং(৫) ইতোমধ্যে কোনো সরকারি/বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও থেকে বিকল্প কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রাপ্ত হননি এমন জেলে সুফলভাগী হিসেবে নির্বাচন করবেন। নির্ধারিত ফর্মে বেইজলাইন সার্ভে করে সুফলভোগীর একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অনুমোদিত প্রাথমিক তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত **"সুফলভোগী যাচাই-বাছাই কমিটি"**-এর মাধ্যমে সুপারিশসহ তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। প্রকল্প পরিচালক সুফলভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- বিকল্প কর্মসংস্থানের সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক আলোচনা (গাভী পালন)
- বিকল্প কর্মসংস্থানের সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক আলোচনা (উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা)
- বিকল্প কর্মসংস্থানের সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক আলোচনা (উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন)
- বিকল্প কর্মসংস্হান সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক মাঠ পরিদর্শন

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০২	অধিবেশন নং- ০১	সময়: ১২:০০-১৩:০০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: বিকল্প কর্মসংস্থানের সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক আলোচনা(গরু/গাভী/বকনা বাছুর পালন)

অভীষ্ট দল: বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নির্বাচিত সুফলভোগী জেলে

লক্ষ্য: এ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সংশ্লিষ্ট গাভী পালন সম্পর্ক ধারণা দেয়া হবে, যাতে অংশগ্রহণকারীগণ এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

উদ্দেশ্য *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ –*

- গরুর উন্নত জাত, বাসস্থান ব্যবস্থাপনা, গরুর স্বাস্থ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবে
- গাভীর কৃত্রিম প্রজনন, ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় (ইউ.এম.এস.) প্রক্রিয়াজাতকরণ, গর্ভকালীন পরিচর্যা ও বাছুরের পরিচর্যা সম্পর্কে জানতে পারবে
- বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বাছুরের বাসস্থান, বাছুরের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার সম্পর্কে বলতে পারবে

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			০৫ মিনিট
	• গত অধিবেশনের সংযোগ স্থাপন; • বিকল্প কর্মসংস্থানের সংশ্লিষ্ট ট্রেড সম্পর্কে ধারণা	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৪৫ মিনিট
	গরুর উন্নত জাত, উন্নত জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য ও বাসস্থান ব্যবস্থাপনা/ গরুর স্বাস্থ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা/ গাভীর কৃত্রিম প্রজনন, ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় (ইউ.এম.এস.) প্রক্রিয়াজাতকরণ/ গর্ভকালীন পরিচর্যা ও বাছুরের পরিচর্যা/ বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা/ বাছুরের বাসস্থান/ বাছুরের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
সার-সংক্ষেপ			১৫ মিনিট
	• শিক্ষণীয় মূল বিষয়ের পুনরালোচনা; • অধিবেশনের উদ্দেশ্য যাচাই; • হ্যান্ড আউট বিতরণ ও পড়ানো; • পরবর্তী অধিবেশনের ওপর আলোকপাত এবং • ধন্যবাদ জ্ঞাপন।	প্রশ্নোত্তর	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

১ম সেশনঃ

গরুর উন্নত জাত, উন্নত জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য ও বাসস্থানব্যবস্থাপনা সেশনে যা আলোচনা করা হবে ঃ

গরুর উন্নত জাত নির্বাচন ঃ

- আমাদের দেশে অধিক পরিমাণে দুধ উৎপন্ন করে এমন গরুর জাত হিসাবে শাহীওয়াল, সিন্ধি, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের গরু পরিচিত।
- দেশী জাতের মধ্যে শাহজাদপুর, পাবনা, মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর এবং চট্টগ্রাম এলাকার গরু দেশের অন্যান্য এলাকার গরু অপেক্ষা উন্নত ও দুধ বেশী দেয়।

খাঁটি জাতের শাহিওয়াল গরুর বৈশিষ্ট্য ঃ

- শাহিওয়াল গরুর দেহের রং হালকা লাল বা বাদামী রঙের।
- এদের কুঁজ কিছুটা উঁচু এবং গল কম্বল বড় ও ঝুলানো হয়। নাভীও বেশ ঝুলানো থাকে।
- এ জাতের গরুর মাথা খাটো, শিং ছোট, কপাল ও দুই শিং এর মধ্যবর্তী স্থানউঁচু হয়।
- এ জাতের একটি গাভীর ওজন ৪০০-৫০০ কেজি হয়ে থাকে।
- একটি গাভী বছরে ৩০০ দিন পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে।
- প্রতি গাভী হতে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১০ লিটার দুধ পাওয়া যায়।
- এ জাতের বকনা ২-২.৫ বছর বয়সে প্রথম প্রজনন উপযুক্ত হয়।

খাঁটি জাতের সিন্ধি গরুর বৈশিষ্ট্য ঃ

- সিন্ধি গাভীর গায়ের রং গাঢ় কালচে হলুদ বা গাঢ় বাদামী হয়।
- এদের কুঁজ কিছুটা উঁচু এবং গল কম্বল বড় ও ঝুলানো হয়।
- এ জাতের গরুর শিং মোটা, খাটো এবং পিছনের দিকে বাঁকানো থাকে।
- এ জাতের একটি গাভীর ওজন ৩০০-৪০০ কেজি হয়ে থাকে।
- গাভীর ওলান বেশ বড় হয়। একটি গাভী বছরে ২৮০-৩০০ দিন দুধ দেয় এবং বার্ষিক দুধ উৎপাদন ২০০০- ৩০০০ লিটার।
- এ জাতের বকনা ২-২.৫ বছর বয়সে প্রথম প্রজনন উপযুক্ত হয়।

খাঁটি জাতের ফ্রিজিয়ান গরুর বৈশিষ্ট্য ঃ

- ফ্রিজিয়ান জাতের গরু আকারে অনেক বড় হয়।
- এদের কুঁজ উঁচু হয় না।
- এদের গায়ের রং সাধারণত সাদা-কালো মিশানো হয়।
- এ জাতের একটি ষাঁড়ের ওজন ৮০০-৯০০ কেজি এবং গাভীর ওজন ৫০০-৬০০ কেজি, এমনকি আরও বেশী হয়ে থাকে। এ জাতের গরু থেকে মাংসও বেশী পাওয়া যায়।
- এ জাতের গাভী অনেক বেশী দুধ দেয়, একটি গাভী দিনে ২৫ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয় এবং বাচ্চা দেয়ার পর
- থেকে পরবর্তী বাচ্চা প্রদান পর্যন্ত একটানা দুধ দিয়ে থাকে।
- এ জাতের বকনা অল্প বয়সে অর্থাৎ প্রায় ২.৫ বছর বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয় এবং প্রতি বছর বাচ্চা দেয়।

সংকর জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য ঃ

- আমাদের দেশে প্রায় বেশীর ভাগই গরুই দেশী জাতের।
- দেশী জাতের গরু থেকে দুধ ও মাংস উৎপাদন পাওয়া যায় কম, কিন্তু এদের কাজ করার ক্ষমতা তুলনামূলক বেশী।
- বিদেশী উন্নত জাতের গাভী হতে অনেক বেশী দুধ পাওয়া যায়। কিন্তু এসব বিদেশী জাতের গাভী আমাদের দেশের জলবায়ু ও আবহাওয়ায় এবং গ্রামীণ ব্যবস্থাপনায় লালন উপযোগী নয়।
- আমাদের দেশে তাই বিদেশী ও দেশী জাতের সংমিশ্রণে সংকর জাতের গরু পালনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- সংকর জাতের গাভী আমাদের দেশের জলবায়ু ও আবহাওয়ায় এবং গ্রামীণ ব্যবস্থাপনায় উপযোগী।

ভাল দুগ্ধবতী গাভীর বৈশিষ্ট্য ঃ

- দেহের সম্মুখভাগ হালকা ও পেছনের অংশ ভারি হবে এবং শরীরের গঠন ঢিলে-ঢালা হবে, চামড়া পাতলা হবে, দেহে অপ্রয়োজনীয় চর্বি থাকবে না।
- ওলান বড় হবে এবং দেহের সাথে সুন্দরভাবে লেগে থাকবে। ওলানের গঠন সুন্দর এবং বাঁটগুলো একই আকারের এবং সুন্দরভাবে একই দূরত্বে সাজানো থাকবে। ওলানের গঠন দেখে দুধ উৎপাদন সম্পর্কে ধারণা করা যাবে।
- দুধের শিরাগুলো মোটা ও স্পষ্ট হবে এবং নাভির দু'পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকাভাবে ছড়িয়ে থাকবে। দুধের শিরাগুলো ওলানেও স্পষ্টভাবে দেখা যাবে।
- উন্নত জাতের গাভী প্রতিবছর বাচ্চা দেয়।

গরুর স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থাননির্মাণ ঃ

স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানসম্পর্কে যে সকল বিষয়ে আলোচনা করতে হবে ঃ

গাভীর ঘর নির্মাণের জন্য উঁচু সমতল ভূমি যেখানে বৃষ্টির পানি জমে না এবং পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থাআছে এমন স্থাননির্বাচন করতে হবে। গাভীর ঘর নির্মাণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে ঘর নির্মাণ করতে হবে ঃ

- গাভীর স্বাস্থ্য ও আরাম
- সহজ প্রাপ্য নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার
- উপযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত নিয়মাবলী পালন করার সুবিধা।

গরুর বাসস্থান (গোয়ালঘর) নির্মাণে যে সকল বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে-

- গোয়লঘর সাধারণত দক্ষিণমূখী হওয়া ভাল
- গোয়ালঘর সমতল ভূমি থেকে এক ফুট উঁচুতে শুকনা স্থানে হতে হবে
- মেঝে হালকা ঢালু থাকবে যাতে সহজেই গরুর চনা কিনারে চলে যায় এবং ঘর শুকনো থাকে
- এক চালা ঘরের উচ্চতা সধারণত ৮-১০ ফুট এবং দু'চালা ঘরে মধ্যবর্তী উভয় চালের শীর্ষদেশ ১৪ ফুট এবং ঢালু অংশের উচ্চতা ৭ ফুট হওয়া প্রয়োজন।
- ঘরের চাল এসবেসটস দ্বারা নির্মাণ করা হলে ভাল হয়, এতে ঘর শীত/গরম উভয় ক্ষেত্র গরুর বসবাসের জন্য আরামদায়ক হবে।
- ঘরের ভিতরে একটি বয়স্ক গরুর জন্য অন্তত ৩ ফুট প্রস্থ ও ৫ ফুট দৈর্ঘ্য জায়গা প্রয়োজন। তার সাথে ম্যানজারের জন্য ২ ফুট এবং ড্রেনের জন্য ১ ফুট প্রশস্ত জায়গা লাগবে।
- ৪/৫ টি গরু হলে এক সারিতে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এজন্য একচালা একটি ঘরই যথেষ্ট।
- ৮/১০ বা অধিক গরু হলে দু'চালা ঘর নির্মাণ করতে হবে এবং গরুকে ঘরে দুই সারিতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উভয় সারির গরুর সম্মুখে খাদ্য দেয়ার জন্য কমন খাবার পাত্র/ম্যানজার থাকবে। এ ক্ষেত্রে উভয় সারির গরুর পিছনের ভাগ বহির্মুখী এবং সামনের ভাগ অন্তর্মুখী হবে।
- সংকর জাতের গরু অধিক গরমে কাতর, তাই গোয়ালঘর শীতল রাখার জন্য ঘরে সিলিং, উত্তর-দক্ষিণে
- খোলা, আলো-বাতাস পূর্ণ এবং প্রয়োজনে ফ্যান এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- শীতকালে প্রয়োজনে গরুর গায়ে ছালার ব্যবস্থা ও মেঝেতে শুকনো খরের বিছানা করতে হবে।
- সম্ভব হলে বাছুর গরুর জন্য পৃথক বাসস্হানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাসস্থান নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২য় সেশনঃ

গরুর স্বাস্থ্য সেশনে যা আলোচনা করা হবেঃ

এই সেশনে প্রাণির বিভিন্ন রোগ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। উক্ত রোগসমূহের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে ভাইরাস জনিত রোগের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। উক্ত রোগে আক্রান্ত প্রাণি যাতে ব্যাকটেরিয়াজনিত জীবাণু দ্বারা দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হয়ে রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি না পায় সেজন্য ভাইরাস জনিত রোগেরও চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। তবে যেকোন রোগ হওয়ার অগেই প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উত্তম। তাই যে সকল সংক্রামক রোগ এর কারণে প্রাণির মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে সে সকল রোগের প্রতিকার হিসাবে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। টিকা প্রদানের সময় একটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তা হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে টিকা প্রদান করা। তা না হলে উক্ত টিকা থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। অসুস্থপ্রাণিকে অসুস্থনা হওয়া পর্যন্ত টিকা প্রদান করা ঠিক হবে না। তাছাড়া টিকা প্রদান এর পূর্বে প্রাণিকে কৃমি মুক্ত করতে হবে। তা করা হলে প্রদানকৃত টিকা থেকে উত্তম ফল (Antibody) পাওয়া যাবে। পানির প্রতি মহিষের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে, তাই নদী মহিষ পরিস্কার পানি ও জলাশয়ের মহিষ ডোবা-

নালার কর্দমাক্ত পানি গায়ে মেখে দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে নদী-ডোবা নেই সেখানে ছায়াযুক্ত স্থানে মহিষ রেখে পাইপের সাহায্যে দিনে অন্তত দু'বার পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে।

ক্ষুরা রোগ (Foot-and-mouth/hoof-and-mouth disease/FMD) ঃ

এ রোগ ভাইরাস জনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। গ্রামে কোথাও কোথাও এ রোগকে ক্ষুরাচল, চপচপিয়া,বাতা বা বাতনা রোগ বলা হয়ে থাকে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি দ্বিক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণি এ রোগে আক্রান্ত হয়।

রোগ বিস্তার ঃ

- রোগাক্রান্ত প্রাণি থেকে বাতাসের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি রোগ ছড়িয়ে পড়ে।
- ক্ষুরা রোগ জীবাণু দুষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমেও ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।
- মুখে, জিহ্বায় ও ক্ষুরায় ফোস্কা পড়ে। পরে ফোস্কা ফেটে ঘা হয়।
- মুখে ঘা হওয়ায় মুখ দিয়ে লালা ঝরে এবং এ অবস্থায় প্রাণি খেতে পারে না।
- পায়ের ক্ষুরায় ঘা হওয়ায় তীব্র ব্যথা হয় ও হাঁটতে/কাজ করতে পারে না এবং দুর্বল হয়ে যায়।
- দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমে যায়।
- এ রোগে বাছুরের মৃত্যুর হার বেশি।

রোগের প্রতিকার ঃ

- অসুস্থ প্রাণিকে সুস্থ প্রাণী থেকে আলাদা রাখা।
- রোগ হওয়ার আগেই অসুস্থ সকল প্রাণিদের ক্ষুরা রোগের টিকা দেয়া।
- প্রতিদিন গোয়াল ঘর জীবাণুনাশক যেমন ডেটল বা ফিনাইল দ্বারা ভালভাবে ধুয়ে দেওয়া।
- প্রাণিকে নরম খাদ্য সরবরাহ করা
- প্রাণির ক্ষতস্থানের চিকিৎসা।

তড়কা রোগ (Anthrax)

এ রোগ ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি অতি তীব্র ও মারাত্মক সংক্রামক রোগ। প্রাণির দেহে সাধারণত খাবারের সাথে এ রোগ প্রবেশ করে। মাটিতে এ রোগের জীবাণু বহু বছর বেঁচে থাকে।

রোগ বিস্তার ঃ

- সাধারণতঃ বর্ষাকালের প্রথম দিকে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।
- স্যাঁতস্যাঁতে জমির ঘাস খাওয়ালে এই রোগ হয়, কেননা সেখানে এ রোগের জীবানু থাকার সম্ভাবনা থাকে।
- বৃষ্টি ও বন্যার পানির সাহায্যে এই রোগ ছড়ায়, তাই ভিজে যাওয়া খড় খাওয়ালে এই রোগ হতে পারে।
- তড়কায় আক্রান্ত মৃত প্রাণি কুকুর ও শৃগাল খেয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে এই রোগ ছড়ায়।
- মৃত পশুর চামড়া থেকেও এই রোগ ছড়ায়।
- তড়কা রোগে আক্রান্ত প্রাণির মৃতদেহ যে মাঠে রাখা হয়, তার চতুর্দিকের ঘাস খেলেও এই রোগ হতে পারে।
- তড়কা রোগের জীবাণু দ্বারা দুষিত পুকুর, নালা ও ডোবার পানি পান করলেও এই রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- এর রোগ অতি তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণী দ্রুত নিঃশ্বাস নেয় ও কৃষক/খামারী কিছু বুঝার আগেই অসুস্থ প্রাণির দেহ মাটিতে ঢলে পড়ে এবং খিচুনি দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যায়।
- তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণীর দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। জ্বর হবে ১০৪°F -১০৭°F। এ সময়ে প্রাণির শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায় এবং বিভিন্ন মাংস পেশীর কম্পন শুরু হয়।
- প্রণির চোখের পর্দা লাল হবে এবং দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে থাবে (মিনিটে ৮০-৯০ বার)।
- এক পর্যায়ে অল্প সময়ে প্রাণিটি মাটিতে পড়ে যাবে এবং দ্রুত চিকিৎসা না করলে মারা যাবে।

তড়কা রোগে মৃত প্রাণির লক্ষণ ঃ

- মৃত প্রণির নাক, মুখ ও মল দ্বার দিয়ে আলকাতরার মত জমাটবিহীন রক্ত বাহির হবে।
- মৃত প্রাণির দেহ শক্ত হবে না।
- মৃত প্রাণির পেট খুব দ্রুত ফুলে যাবে।

রোগের প্রতিকার ঃ

- এ রোগের জীবাণু সহজে মরে না, তাই জীবাণুনাশক ব্যবহার করে মৃত প্রাণিকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।
- কোন অবস্থাতেই মৃত প্রাণি পানিতে ফেলা যাবে না এবং মুচিকে দেওয়া যাবে না।
- আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখতে হবে ও অসুস্থ প্রাণিকে তড়কা রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।
- তড়কা রোগে আক্রান্ত এলাকায় এ রোগ ছাগল/ভেড়াতেও হতে পারে, তবে ছাগল/ভেড়ায় এ রোগের টিকা প্রদান করলে মারাত্মক সমস্যাও হতে পারে। কেননা এ টিকা প্রদান স্থানে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভব হয়, তখন ছাগল/ভেড়া লাফালাফি শুরু করে দেয় এবং কখনও মারাও যেতে পারে। তাই অতি প্রয়োজন হলে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে ছাগল/ভেড়াকে এ রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।

বাদলা রোগ (Black Quarter/B.Q.) ঃ

এ রোগ ব্যাকটেরিয়া জনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। বাংলাদেশে এ রোগ বৃষ্টি বাদলের মৌসুমে বেশী হয় বলে এ রোগকে বাংলায় বাদলা রোগ বলা হয়। সাধারণত ৬ মাস থেকে ২ বৎসর বয়সের যে সমস্ত প্রণির স্বাস্থ্য ভাল, তাদের এ রোগ বেশী হতে দেখা যায়। এ রোগে মৃত্যুর হার বেশী হয়।

রোগ বিস্তার ঃ

- সাধারণত: বর্ষাকালের প্রথম দিকে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।
- স্যাঁতস্যাঁতে জমির ঘাস খাওয়ালে এই রোগ হয়, কেননা সেখানে এ রোগের জীবাণু থাকার সম্ভাবনা থাকে।
- বৃষ্টি ও বন্যার পানির সাহায্যে এই রোগ ছড়ায়, তাই পানিতে ডোবা ঘাস খাওয়ালে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- বাদলা রোগের জীবাণু দ্বারা দুষিত পুকুর, নালা ও ডোবার পানি পান করলেও এই রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- অতি তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণীর আকস্মিক মৃত্যু হতে পারে।
- তীব্র প্রকৃতির হলে ক্ষুধামন্দা দেখা দিবে।
- জ্বর হবে এবং তা ১০৪°F-১০৭°F পর্যন্ত হতে পারে।
- এই রোগে সাধারণত প্রাণির উড়ু, ঘাড়, কাঁধ ও কোমরের মাংশ আক্রান্ত হয়ে ফুলে উঠে।
- আক্রান্ত ফুলা স্থান কালচে দেখাবে এবং ফুলা স্থান গরম ও বেদনাদায়ক হবে।
- আক্রান্ত মাংস পেশীতে চাপ দিলে পচ্ পচ্ শব্দ হবে যা দ্বারা সহজেই বাদলা রোগ বুঝা যাবে।
- প্রাণি হাঁটতে পারে না ও খুঁড়িয়ে হাঁটবে।
- চিকিৎসায় বিলম্ব হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৮-৭২ ঘন্টার মধ্যে পশু মারা যাবে।

রোগের প্রতিকার ঃ

- আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখতে হবে।
- মৃত প্রাণিকে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে।
- স্যাঁতস্যাঁতে এলাকা চারণভূমি বা বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- পঁচা পুকুর, নালা এবং ডোবার পানি খাওয়ানো যাবে না।
- পঁচা ঘাস এবং পানির নিচের ঘাস খাওয়ানো যাবে না।
- বর্ষার ২ মাস পূর্বে ৬ মাস থেকে ২ বছরের অসুস্থ সকল প্রাণিকে বাদলা রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

গলাফুলা রোগ (Hemorrhagic septicemia/HS) ঃ

এ রোগ ব্যাকটেরিয়া জনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। বাংলাদেশে প্রায় সকল ঋতুতে এই রোগ হয। তবে বর্ষাকলে যখন গো/মহিষকে দিয়ে বেশি কাজ করানো হয় তখন এ রোগ বেশি হয়। বর্ষার শুরু এবং শেষে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। এ রোগ ডুবো অঞ্চলে বেশি হয় এবং মৃত্যুর হারও অনেক বেশী।

রোগ বিস্তার ঃ

- অসুস্থ প্রাণি আক্রান্ত প্রাণির মলমূত্র দিয়ে দূষিত খাদ্য ও পানি খেয়ে এ রোগে আক্রান্ত হয়।
- প্রাণির দেহে এই রোগের জীবাণু স্বাভাবিক অবহস্থাতে ও বিদ্যমান থাকতে পারে। কোন কারণে যদি ঐ প্রাণিটি পীড়নের সম্মুখীন হয় যেমন, ঠান্ডা, অধিক গরম, ভ্রমনজনিত দুর্বলতা থাকে, তখন প্রাণির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে প্রাণিটি এই রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়।
- দীর্ঘদিন পুষ্টিহীনতায় ভুগলে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।।
- বর্ষার শুরুতে বৃষ্টিতে ভিজলে এবং ঠান্ডা লাগলে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।।

- প্রাণিকে কষ্টের সাথে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করলে এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
- গরম এবং স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশেও এই রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- অতি তীব্র প্রকৃতির হলে, হঠাৎ করে প্রাণির জ্বর আসে, তাপমাত্রা বেড়ে যায় (জ্বর ১০৫°F -১০৭ °F)।
- ক্ষুধামন্দা হয়, নাক, মুখ দিয়ে লালা ঝরে ও ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাণী মার যায়।
- তীব্র প্রকৃতির হলে উপরের লক্ষণ ছাড়াও প্রথমে গলার নিচে, পরে চোয়াল, বুক, পেট ও কানের অংশ ফুলে যায়। এ অবস্থাতে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং প্রণি গলা বাড়িয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়।
- গলা ও গল কম্বল ফুলে যাবে, ফুলা জায়গায় টিপ দিলে ব্যাথা পাবে এবং বসে যাবে। গরম ও শক্ত হবে।
- শ্বাস নেয়ার সময় ঘাড় ঘাড় আওয়াজ হবে।
- কখনও কখনও পাতলা পায়খানা হতে পারে।

রোগের প্রতিকার ঃ

- আক্রান্ত প্রাণিকে আলাদা রাখতে হবে।
- মৃত প্রাণিকে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে।
- স্যাঁতস্যাঁতে এলাকা চারণভূমি বা বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- সব সস্থ প্রাণিকে অসুস্থ অবস্থায় নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।

গাভীর ওলান ফুলা রোগ বা ওলান প্রদাহ (Mastitis) ঃ

বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস ও মাইকোপ্লাজমা দ্বারা এই রোগ হয়। গাভীর জন্য এ রোগ একটি মারাত্মক রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা না হলে গাভীর ওলান নষ্ট হয়ে যাতে পারে।

রোগ বিস্তার ঃ

- ওলান বা বাঁটে যে কোন প্রকার আঘাত বা ক্ষত থাকলে সেখান দিয়ে ব্যাকটেরিয়া সহজেই প্রবেশ করে এ রোগ সৃষ্টি করে।
- অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে, ময়লা, গোবর ইত্যাদির উপর গাভী শয়ন করলে।
- বাচ্চা প্রসবের পর ওলানে ময়লা লাগলে এবং তা সময়মত পরিস্কার করা না হলে।
- ঘাসের চটা ওলানে প্রবেশ করালে।
- গোয়ালার অপরিষ্কার হাত ও বড় নখ দ্বারা গাভীর ওলানে ক্ষত হলে।
- বাছুর ওলানে জোরে গুতো মারলে।

রোগের লক্ষণঃ

- অতি তীব্র রোগের ক্ষেত্রে দুধের পরিবর্তন লক্ষণীয়, দুধ পাতলা ও কিছু জমাট বাঁধা হবে।
- দুধের রং পরিবর্তন হবে, দুধের সাথে রক্ত বের হবে।
- ওলান ফুলে যাবে, গরম থাকবে এবং শক্ত হয়ে যাবে।
- প্রাণির ওলানে ব্যাথা অনুভব করে, ফলে ওলানের মধ্যে হাত দিতে দেবে না।
- দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির হলে দুধের পরিমাণ কমে যাবে ও ক্রমান্বয়ে দুধ ছানার মত ছাকা ছাকা হবে।
- ক্ষুধামন্দা, অবসাদভাব, জ্বর ইত্যাদি হবে।
- গাভী হাঁটতে চাইবে না, ধীরে ধীরে হাঁটবে।

রোগের প্রতিকার ঃ

- আক্রান্ত গাভীকে আলাদা করে চিকিৎসা করতে হবে।
- গাভীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হবে।
- ওলানে ঘাসের চটা প্রবেশ করান চলবে না।
- ময়লা যেন ওলানে না লাগে সেদিকে প্রসবোত্তর খেয়াল রাখতে হবে।
- গাভীকে খালি পেটে দুধ দোহন করাতে হবে, কেননা ঘাস পানি খেয়ে ভরা পেটে দুধ দোহন করা হলে ওলান ফুলা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,
- দুধ দোহনের পর জীবানু নাশক ঔষধ পানির সহিত মিশিয়ে দুধের বাট পরিস্কার করলে ওলান ফুলা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
- এ রোগ প্রতিরোধ করা খুব কঠিন, কারণ ওলানে কোন এন্টিবডি তৈরি হলে তা দুধের মাধ্যমে বের হয়ে যায়।

- তবে দুধ দোহনের পর জীবানু নাশক ঔষধ পানির সহিত মিশিয়ে দুধের বাট পরিস্কার করলে ওলান ফুলা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

নাভীতে ঘাঁ রোগ (Neval ill)ঃ

এ রোগ ব্যাকটেরিয়া জনিত কারণে ঘটে। সময়মত চিকিৎসা করা না হলে বাছুরের সাস্থ্যহানী হবে যা পরবর্তীতে বাছুরের সাভাবিক বৃদ্ধিতে ব্যঘাত ঘটবে।

রোগ বিস্তার ঃ

- বাচ্চা প্রসবের পর বাচ্চার নাভী জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে না ধুলে, কাঁচা নাভীতে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করলে।
- প্রণির ময়লাযুক্ত জায়গায় বাচ্চা গুলে।
- নাভী শুকাতে কয়েকদিন সময় লাগে, এ সময়ের মধ্যে নাভীতে মাছি বসলে।
- অনেক সময় গাভী বাচ্চার নাভী চেটে ক্ষত করে ফেলে এবং সেখান থেকে এই রোগের সৃষ্টি হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- নাভীর চারদিকে লাল হয়ে যাবে।
- নাভীর চারদিকে ফুলে যাবে।
- নাভীতে ব্যথা হবে এবং পুঁজ হবে।
- অনেক সময় নাভীতে পোকা পড়ে।
- বাছুর গাভীর দুধ খেতে চাবে না।
- গায়ে জ্বর থাকবে।

রোগের প্রতিকার ঃ

- বাচ্চা প্রসবের পর নাভী জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে ধৌত করে দিতে হবে।
- গাভী যাতে নাভী না চাটতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পেটের গোলকৃমি রোগঃ

এসকারিয়া নামক এক প্রকার গোলকৃমি দ্বারা এ রোগের কারণ ঘটে। এ রোগের চিকিৎসা না করা হলে প্রাণির, বিশেষ করে বাছুরের স্বাস্থ্যহানীসহ মৃত্যুও ঘটেতে পারে।

রোগ বিস্তার ঃ

- আক্রান্ত প্রাণির মল দিয়ে কৃমির ডিম বের হয়ে ঘাসকে দূষিত করে। সেই ঘাস খেলে এই রোগ হয়।
- আক্রান্ত গাভীর দুধ খেয়ে বাছুরের এই রোগ হয়।
- গাভীর জরায়ুতে ভ্রুণের ভিতরেও এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- আক্রান্ত প্রাণির ডায়রিয়া দেখা দেবে।
- অনেক সময় পায়খানা শক্ত হয়ে যাবে।
- ক্ষুধামন্দা দেখা দেবে।
- প্রাণি দিন দিন শুকিয়ে যাবে ও দুর্বল হয়ে যাবে।
- বাছুরের পেট বড় হয়ে যাবে।
- লোমের চাকচিক্য নষ্ট হয়ে যায়।
- মহিষের বাচ্চার ক্ষেত্রে চোখের পর্দা লাল হয়।
- বাড়ন্ত প্রাণির বৃদ্ধি কমে যায়। বয়স্ক প্রাণির উৎপাদন কমে যায় ও রক্ত শূণ্যতা দেখা যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- গবাদিপশুর গোবর যেখানে-সেখানে না ফেলে এক জায়গায় ফেলতে হবে।
- গোয়াল ঘর, আশপাশের জায়গা ও চারণভূমি পরিস্কার রাখা।
- গোয়াল ঘরে নিয়মিত চুন ব্যবহার করা ও জলাবদ্ধ জমিতে প্রাণিকে চরাণো যাবে না।

কলিজার পাতা কৃমি রোগ ঃ

প্রাণির একটি মারাত্মক কৃমি রোগ। সাধারণত ছাগল, গরু, মহিষ ও ভেড়ার এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগ বিস্তার ঃ

কলিজা কৃমির লার্ভা শামুকের স্যাঁতস্যাঁতে বা নিচু জলাভূমির ঘাসের পাতায় লেগে থাকে। এই ঘাস খেলে পশু কলিজা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- বদহজম এবং মাঝে মাঝে ডায়রিয়া দেখা দেবে।
- থুতনীর নিচে পানি জমে ফুলে যাবে, এ অবস্থা হলে একে "বটল জ" বলে।
- রক্তশূণ্যতা হবে, ফলে চোখের পর্দা সাদা হয়ে যাবে।
- প্রাণিটি দিনে দিনে শুকিয়ে যাবে।
- তীব্র আক্রমণের ক্ষেত্রে পশু হঠাৎ মারা যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- ডোবা, নালা ও বিলের ঘাস খাওয়ানো যাবে না। খাওয়াতে হলে রৌদ্রে একটু শুকিয়ে খাওয়াতে হবে।
- গবাদিপশুর গোবর এক জায়গায় জমা করে রাখতে হবে।
- মাঠের শামুক ধ্বংস করতে হবে।

উকুন; আঁটুলি; মেঞ্জ

লক্ষণ ঃ

- অল্প আক্রমণে তেমন লক্ষণ বোঝা যায় না । তবে মাঝারি প্রকৃতিতে দীর্ঘমেয়াদী চর্ম প্রদাহ হয়। চুলকানি, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, ওজন হ্রাস ও বাছুরের লোম পড়ে যায়।
- অ্যানিমিয়া, অস্বস্তি বোধ, খাদ্য গ্রহণ হ্রাস, দৈহিক ওজন হ্রাস ও দুধ উৎপাদন কমে যায়। চুলকানি, রক্ত জমাট বাঁধা দাগ দেখা যায়, আঁটুলি বিভিন্ন রোগের বাহক হয়।
- চর্ম প্রদাহ, চুলকানি, লোম পড়া, খাদ্য গ্রহণ কমে যাওয়া, দুর্বল, স্বাস্থ্যহানী, চামড়া নষ্ট হয় ও পুঁজ সৃষ্টি হয়।

প্রতিকার ঃ

- প্রাণির দেহ ব্রাশ করা, গোসল করানো, উকুন হাত দিয়ে মেরে ফেলা
- গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দেয়া।
- প্রতিদিন গো/মহিষকে ভালভাবে গোসল করালে শরীর সুস্থ থাকে এবং দেহের পরজীবি, যেমন- উকুন,আঁঠালি, মাছি, মাইটস, ফ্লি আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে।

রক্ত আমাশয় রোগ ঃ

আইমেরিয়া নামের এক জাতীয় পরজিবী (ককসিডিয়া) দিয়ে এই রোগ হয়। সময়মত চিকিৎসা না করা হলে বাছুর মারা যেতে পারে।

রোগ বিস্তার ঃ

- প্রাণির শোবার জায়গা ময়লা থাকলে এই রোগ হয়।
- গোবর মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ালে এই রোগ হয়।
- গাভী দোহন করবার সময় ওলান পরিষ্কার না করলে ময়লাযুক্ত ওলানের দুধ খেয়ে বাছুরে এই রোগ হয়।
- আক্রান্ত প্রাণির মলদ্বারা দূষিত খাদ্য ও পানি অন্য প্রাণি খেলে এই রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- আক্রান্ত প্রাণি রক্ত মিশ্রিত পায়খানা করে এবং অনেক সময় শুধু রক্ত পায়খানা করে।
- আক্রান্ত প্রাণি পায়খানা করার সময় কোৎ দেয় ও ডাকে।
- লেজের গোড়ায় রক্ত মিশ্রিত গোবর লেগে থাকে।
- ঘন ঘন পানি পান করে, দেহের তাপ বৃদ্ধি পায় এবং অরুচি দেখা দেয়।

প্রতিকার ঃ

- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে এ রোগের প্রধান প্রতিকার
- সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

পেট ফাঁপা রোগ

এ রোগ প্রাণির একটি সাধারনণ রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা হলে প্রাণিটি সহজেই অসুস্থহয়ে যায়।

রোগ বিস্তার ঃ

- অধিকমাত্রায় ঘাস/খাদ্য, পানি খেলে এই রোগ হয়।
- অনেকদিন খরা হওয়ার পর হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ার পর কচি ঘাস হয়। সেই ঘাস যদি প্রাণি অধিক পরিমাণে খায় তাহলে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে ।
- যে সমস্ত প্রাণি খেসারীর ভূষি, মাসকালাইয়ের ভূষির সাথে প্রচুর পরিমাণ পানি খায় তাদের পেট অতিরিক্ত ভর্তির ফলে এই রোগ হয়।
- যে জমিতে ইউরিয়া সার সদ্য ব্যবহার করা হয়েছে, সেই জমির ঘাস খেলে এই রোগ হয়।
- গলায় কোন জিনিস/খাদ্য আটকিয়ে গেলে, অসাধারণ খাদ্য বেশি পরিমাণে খেলে এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণঃ

- পেটের ভিতরে গ্যাস জমা হওয়ার ফলে পেটফুলে যায়।
- পেট ফুলে যাওয়ার সাথে সাথে প্রাণির অস্থিরতা ও চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়।
- পেট ব্যাথার জন্য অনেক প্রাণি প্রায়ই মাটিতে শোয় ও উঠে।
- অনেক সময় পিছনের পা দিয়ে প্রাণি পেটে লাথি মারতে থাকে।
- প্রাণি খুব ঘন ঘন শ্বাস নেয়।
- জিহ্বা বের হয়ে যায় এবং মুখ দিয়ে লালা পড়তে থাকে।
- নিঃশ্বাসের গতি খুব বেশি হয় এবং হৃদস্পন্দন খুব বেড়ে যায়।
- পেটের বাম পার্শ্বে থাপ্পড় দিলে ধপ ধপ শব্দ করে।
- প্রাণির খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।
- প্রাণির পায়খানা বন্ধ হয়ে যায়।
- ঐ ক্ষেত্রে পশুর জ্বর থাকে না।

রোগ প্রতিকার ঃ

- প্রাণির খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।
- সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

বদহজম রোগ ঃ

এ রোগ প্রাণির একটি সাধারণ রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা হলে প্রাণিটি সহজেই অসুস্থ হয়ে যায়।

রোগ বিস্তার ঃ

- হঠাৎ প্রাণির খাদ্য পরিবর্তন করলে এই রোগ হয়। যেমন-এক অঞ্চলের গরু অন্য অঞ্চলে নিয়ে গেলে, বাজার হতে গরু কিনে আনলে এইরূপ হয়ে থাকে।
- নষ্ট হয়ে যাওয়া খাদ্য খাওয়ালে এই রোগ হয়।
- গাভীর গর্ভফুল অনেক সময় গাভী খেয়ে ফেললে এই রোগ হতে পারে।
- প্রাণিকে পরিমাণ মত পানি না খাওয়ালে এই রোগ হয়।
- অনেকদিন যাবৎ শুধু খড় খাওয়ালে বা অন্য কোন খাদ্য না দিলে এই রোগ হয়।

রোগের লক্ষণঃ

- পশুর ক্ষুধা হঠাৎ কমে যায়।
- দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমে যায়।
- প্রাণির মল কঠিন ও পরিমাণ অল্প হয়।
- কোন কোন প্রাণির মাজল শুকনা থাকে।

রোগ প্রতিকার ঃ

- প্রাণির খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।
- সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ডাইরিয়া (Diarrhoea) ঃ

এ রোগ প্রাণির একটি সাধারণ রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা হলে প্রাণিটি সহজেই অসুস্থহয়ে যায়। তবে চিকিৎসায় দেরী হলে পানি স্বল্পতায় প্রাণিটি মারা যেতে পারে।

রোগ বিস্তার ঃ

- পঁচা ও বিনষ্ট হয়ে যাওয়া খাদ্য প্রাণিকে খাওয়ালে ডায়রিয়া হয়।
- ঘাসের সাথে বালি মিশ্রিত থাকলে সেই ঘাস প্রাণি খেলে এই রোগ হয়।
- গাভীর বাচ্চা প্রসবের পর প্রথমে যে শাল দুধ বাহির হয় সেই দুধ বাছুরকে না খাওয়ালে সহজেই ডায়রিয়া হয়।
- অধিক পরিমাণ খাদ্য খাওয়ালে এই রোগ হয়।
- খাদ্য ও পানির পাত্র দীর্ঘদিন যাবৎ পরিষ্কার না করে সেই পাত্রে খাদ্য ও পানি খাওয়ালে এই রোগ হয়।
- প্রসবের পর প্রাণির শরীর পরিষ্কার না করলে এই রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- পাতলা পায়খানা হয় এবং পায়খানার সাথে রক্ত ও আম থাকে।
- পায়খানা দুর্গন্ধযুক্ত হয়।
- কখনও কখনও হজম না হওয়া খাদ্যবস্তু পায়খানার সাথে বের হয়ে আসে।
- পায়খানার রং কালো বা হলুদ হতে পারে।
- ঘন ঘন পায়খানা হতে পারে।
- মলত্যাগের সময় অনেক সময় প্রাণি কোৎ দিতে পারে।
- পাতলা পায়খানার কারণে প্রাণির দেহে শুষ্কতা দেখা দেয়।
- প্রাণির পেটের ভিতরে কল কল শব্দ শোনা যায়।
- ক্ষুদামন্দা দেখা দেয়।
- প্রাণি নিস্তেজ হয়ে যায়।

রোগ প্রতিকার ঃ

- প্রাণির খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।
- নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘাস বা খড় খাওয়ানো যাবে না।
- প্রাণির খাবারের ও পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে।
- প্রাণিকে পুকুর, ডোবা, নালার পানি খাওয়ানো যাবে না। সর্বদা নির্দিষ্ট পরিষ্কার পাত্রে বিশুদ্ধ পানি পান করাতে হবে।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সকল সময় শুকনা রাখতে হবে।
- সময়মত চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা।

গর্ভফুল আটকে যাওয়া ঃ

এ রোগ প্রাণির একটি সাধারনণ রোগ। সময়মত চিকিৎসা করা হলে প্রাণিটি সহজেই অসুস্থ হয়ে যায়।

রোগ বিস্তার ঃ

- অপরিণত বাচ্চা প্রসব (সময়ের পূর্বেই বাচ্চা হওয়া)
- সংক্রামক রোগ, যেমন ব্রুসেলোসিস।
- দৈহিক দুর্বলতা, ক্যালসিয়ামের অভাব।

রোগের লক্ষণ ঃ

- গর্ভফুল যোনী মুখে ঝুলে থাকে।
- গর্ভফুল ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাহির হয় না।
- খাদ্য গ্রহণে অনীহা।
- জ্বর হতে পারে।

প্রতিকার ঃ

- ২৪ ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল না পড়লে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করা।
- কোন অবস্থাতেই ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড় গর্ভফুল হাত দিয়ে টেনে বের করা যাবে না। কারণ এর ফলে গাভী বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।

দুধ জ্বর রোগঃ

রোগের কারণ ঃ

- রক্তে ক্যালসিয়ামের অভাব হলে এই রোগ হয়।
- মাথা ও পা কাঁপতে থাকে এবং পশু একস্থানেই দাঁড়িয়ে থাকতে চায়।
- চলতে গেলে টলতে থাকে, বিশেষ করে পিছনের পায়ে জোর কমে যায়।
- প্রাণি নিস্তেজ হয়ে দেহের একপাশে মাথা গুজে শুয়ে থাকে।
- মাজল শুকনা থাকে।
- শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়।
- হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের গতি কমে যায়।

প্রতিকার ঃ

- প্রাণির খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।
- সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

সময় পাওয়া গেলে গাভীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সেশনে অন্যান্য যে সকল রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারেঃ

- তড়কা
- বাদলা
- ক্ষুরা
- কৃমি
- ওলান ফুলাঃ গাভীকে খালি পেটে দুধ দোহন করাতে হবে।
  ঘাস পানি খেয়ে ভরা পেটে দুধ দোহন করা হলে ওলান ফোলা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
  দুধ দোহনের পর জীবানু নাশক ঔষুধ পানির সহিত মিশিয়ে দুধের বাট পরিস্কার করলে ওলান ফোলা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম ।

৩য় সেশন

গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

আমাদের দেশীয় গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা র প্রতি সাধারণত তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে এদের নিকট থেকে আশানুরূপ উৎপাদনও পাওয়া যায় না। অথচ গরুকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস, পরিমিত প্রক্রিয়াজাত খড়, দানাদার খাদ্য (কুড়া, গমের ভূষি, চাউলের খুদ, খৈল, কলাই, মটর, খেশারী, কুড়া ইত্যাদি), পর্যাপ্ত পরিমানে পরিস্কার পানি (নলকুপের টাটকা পানি) সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা, নিয়মিত কৃমিনাশক চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থানেয়া হলে এদের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যায়। আমাদের দেশে গবাদি পশুর সবচেয়ে সহজলভ্য ও সাধারণ খাদ্য হল খড় যার ভিতর আমিষ, শর্করা ও খনিজের ব্যাপক অভাব রয়েছে। বর্তমানে খড়কে ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করলে তার খাদ্যমান বহুগুণে বেড়ে যায়।

খাদ্য উপকরণে যে পুষ্টি উপাদান অধিক পরিমানে থাকে তাকে সে জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন-

- শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভুট্টা, গম, কাওন, চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি, ইত্যাদি)।
- আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, তিলখৈল, শুটকিমাছ, মিটমিল, ইত্যাদি)।
- চর্বি জাতীয় খাদ্য (এনিমেল ফ্যাট, ভেজিটেবল অয়েল, সার্কলিভার ওয়েল, ইত্যাদি)।
- ভিটমিন জাতীয় খাদ্য (শাকসব্জি ও কৃত্রিম ভিটামিন)
- খনিজ জাতীয় খাদ্য (ঝিনুক , ক্যালশিয়াম ফসফেট, রকসল্ট, লবন, ইত্যাদি)।
- পানি ঃ দেহ কোষে শতকরা ৬০- ৭০ ভাগ পানি থাকে। তাই কোন প্রাণি খাদ্য না খেয়েও কিছু দিন বাঁচতে পারে, কিন্দ পানি ছাড়া সামান্য কিছু দিনের বেশী বাঁচে না।
  - সাধারণত দেহ থেকে পানির ক্ষয় হয় মলমূত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ।

- অপরদিকে পানি আহরিত হয় পানি পান করে, রসালো খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেহের ভিতর বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।
- দেহের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।
- **প্রণির দেহে পানির কাজ ঃ**
  - খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য বস্তু নরম ও পরিপাকে সহায্য করে।
  - খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টি উপাদান তরল করে দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহণ করে।
  - দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও দেহকে সতেজ রাখে।
  - দেহের ভিত্তিতে দুষিত পদার্থ অপসারণ করে।
  - দেহের গ্রন্থি' হতে নিঃসৃত রস, হরমোন,এনজাইম এবং রক্ত গঠনে ভূমিকা রাখে।

গবাদিপ্রাণির খাদ্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন ঃ

১ আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য, যেমন ঃ খড়, সবুজ ঘাস বা কাঁচা ঘাস, ইত্যাদি
২ দানাদার জাতীয় খাদ্য, যেমন ঃ চালের কুঁড়া, গমের ভূষি, খেসারি ভাঙ্গা, তিল বা বাদাম খৈল, ইত্যাদি
৩ সহযোগী অন্যান্য খাদ্য যেমন ঃ খনিজ উপাদান, ভিটামিন, ইত্যাদি

- **শুকনা খড় ঃ** একটি দেশী গাভীকে দৈনিক ৩ কেজি খড় খাওয়াতে হয়। উন্নত সংকর জাতের একটি গাভীর জন্য দৈনিক ৪ কেজি খড় প্রয়োজন হয়। খড় কেটে ও কাটা খড়ের সহিত ১০% চিটাগুর মিশিয়ে খাওয়ালে পুষ্টির মান বেড়ে যায়। খড়ে প্রোটিনের ভাগ বাড়ানোর জন্য ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়াতে হবে,

- **সবুজ কাঁচা ঘাস ঃ** গাভীর সুষম খাদ্যের প্রধান অংশ সবুজ কাঁচা ঘাস। কাঁচা ঘাস গাভীর দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে। তাই দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্যে প্রতিদিন ১০-১২ কেজি কাঁচা ঘাস অবশ্যই যোগ করতে হবে। একটি উন্নত সংকর জাতের গাভীকে দৈনিক ১৫ কেজি সবুজ কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হয়।

- **বিভিন্ন জাতের সবুজ কাঁচা ঘাস ঃ**
  - স্হায়ী ঘাস ঃ গ্রীষ্মকালীন স্থায়ী ঘাস যেমন- নেপিয়ার, পারা, গিনি, জার্মান ইত্যাদি।
  - অস্থায়ী ঘাস ঃ শীতকালীন ঘাস যেমন- ওটস, ভুট্টা ইত্যাদি।
  - শুটি জাতীয় ঘাস ঃ খেসারী,মাসকলাই, কাউপি, সেন্ট্রোশিমা, বারশিম, লুসার্ন ইত্যাদি।

- **দানাদার খাদ্য মিশ্রণ ঃ** গাভীর প্রথম ৩ লিটার দুধের জন্য ৩ কেজি এবং পরবর্তী ৩ লিটারের জন্য ১ কেজি করে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। দানাদার খাদ্য মিশ্রণের তালিকা ঃ

দানাদার খাদ্য মিশ্রণের তালিকা	
(ক) চালের কুঁড়া	২ কেজি
(খ) গমের ভূষি	৫ কেজি
(গ) খেসারি ভাঙ্গা	১.৮ কেজি
(ঘ) তিল বা বাদাম খৈল	১ কেজি
(ঙ) লবণ	০.১ কেজি
(চ) খনিজ মিশ্রণ	০.১ কেজি
মোট	১০.০০ কেজি

- **পানি সরবরাহ ঃ** গাভীকে প্রচুর পরিমানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। একটি দুধাল গাভীকে দৈনিক ৩৫-৪০ লিটার পানি সরবরাহ করতে হবে।

গাভীর দৈনন্দিন খাদ্য প্রস্তুত করার সময় নিম্নে বর্ণিত বিষয় বিবেচনায় এনে খাদ্য তৈরী করতে হবে ঃ

১ গাভীর খাদ্য সুষম হতে হবে, অর্থাৎ খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ সঠিক মাত্রায় থাকতে হবে।
২ খাদ্য অবশ্যই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক হতে হবে। অর্থাৎ সহজ প্রাপ্য এবং দাম কম এরূপ উপকরণ দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে।

৩ একটি দেশী গাভীর চেয়ে উন্নত জাতের একটি গাভী অনেক বড় হয়। দুধও বেশী দেয় এবং সেজন্য খায়ও বেশী। তাই খাদ্য প্রদানের সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে গাভীর পেট ভরে এবং পুষ্টির অভাবও পুরণ হয়।

৪ গাভীর খাদ্যদ্রব্য টাটকা ও পরিস্কার হতে হবে। ময়লা, কাঁকড়, পাথর, বালু, মাটি, ছাতাপড়া দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য, গাভীকে খেতে দেওয়া যাবে না।

৫ কাঁচা ঘাসে প্রচুর খনিজ উপাদান ও ভিটামিন থাকে যা সহজে হজম হয়। তাই গাভীকে দৈনিক প্রয়োজনীয় কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে।

৬ গাভীর দেহ গঠনে, দুধ উৎপাদনে, গর্ভধারণে, বাচ্চা উৎপাদনে এ উপাদানটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্যে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ ও খাদ্য উপাদান সরবরাহ করতে হবে।

৭ দানাদার খাদ্যের সাথে নিয়মিত ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ মিশিয়ে খাওয়ালে এগুলোর অভাব হবে না।

৮ আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য যেমন ঃ খড়, কাঁচা ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি আস্ত না দিয়ে ছোট ছোট করে কেটে গাভীকে খাওয়াতে হবে। এতে খাদ্য দ্রব্যের অপচয় হবে না। গাভীর খেতে সুবিধা হবে এবং হজমেও সহায়ক হবে।

৯ খড় কুচিকুচি করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে অন্যান্য দানাদার মিশ্রণ ও চিটাগুড় মিশিয়ে দিলে গাভী খেতে অধিক পছন্দ করবে এবং সহজ প্রাচ্যও হবে।

১০ খাদ্য উপকরণ হঠাৎ করে পরিবর্তন করা উচিত নয়। খাদ্য উপকরণের পরিবর্তন প্রয়োজন হলে আস্তে আস্তে করতে হবে।

গবাদি প্রাণীর খাদ্যে দৈনিক খড়, কাঁচা ঘাস ও ইউ.এম.এস সরবরাহের পরিমান ঃ

- কেজি কাঁচা ঘাষ = ১ কেজি খড়।
- প্রাপ্ত বয়স্ক একটি গরুকে ৮ কেজি খড় সরবাহ করা প্রয়োজন।
- ১-৩ বছরের একটি গরুকে ২ কেজি খড় সরবাহ করা প্রয়োজন।
- ১ বছরের নিচে একটি গরুকে ১ কেজি খড় সরবাহ করা প্রয়োজন।
- প্রাপ্ত বয়স্ক একটি গরুকে ১৫-২০ কেজি কাঁচা ঘাষ সরবাহ করা প্রয়োজন।
- ১-৩ বছরের একটি গরুকে ১০ কেজি কাঁচা ঘাষ সরবাহ করা প্রয়োজন।
- ১ বছরের নিচে একটি গরুকে ৩ কেজি কাঁচা ঘাষ সরবাহ করা প্রয়োজন।
- প্রাপ্ত বয়স্ক একটি গরুকে ২-৩ কেজি ইউ.এম.এস (প্রক্রিয়াজাত খড়) সরবাহ করা প্রয়োজন।

দুগ্ধবতী গাভীকে দৈনিক দানাদার খাদ্য সরবরাহের পরিমান ঃ

- একটি গাভীকে প্রথম ৫ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য ৩ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- পরবর্তী প্রতি এক লিটার দুধ দুধ উৎপাদনের জন্য ০.৫০ কেজি হারে সর্বমোট ৮ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় (ইউ.এম.এস) প্রক্রিয়াজাতকরণ ঃ

ইউ.এম.এস তৈরীর প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ.এম.এস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস (চিটাগুড়) এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। এ হিসাব মতে ১০০ কেজি শুকনা খড়, ঘনত্বের উপর নির্ভর করে ১৫-২০ কেজি মোলাসেস (চিটাগুড়) ও ৩ কেজি ইউরিয়া মিশালেই চলবে । খড় ভিজা বা মোলাসেস পাতলা হলে উভয়ের পরিমাণই বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে। এর পর পানিতে ইউরিয়া ও চিটাগুড় মিশিয়ে উহা ভালভাবে খড়ের সাথে মিশাতে হবে। পানি বেশী হলে দ্রবণটুকু খড় চুষে নিতে পারবে না আবার কম হলে দ্রবণ ছিটানো সমস্যা হবে। শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে অস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবেএবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয় ।

এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে । ওজন করা খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ মিশিয়ে নিলেই ইউ.এম.এস প্রাণিকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়ে যাবে। প্রস্দতকৃত ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে গরুকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরীখড় সংরক্ষণকরে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে কোন অবস্াতেই খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখাউচিৎ নয়। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেস এর পরিমাণ কমতে থাকবে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে সুবিধা ঃ

- ইউ.এম.এস ৬ মাসের উর্দ্ধে বাছুর গরু থেকে শুরু করে সকল বয়সের গরুকে তাদের চাহিদা মত খাওয়ানো যায়।
- শুধু ইউ.এম.এস খাওয়ালেও গরুর ওজন বৃদ্ধি পায়।
- ইউ.এম.এস তৈরীর পদ্ধতি সহজ। একজন শ্রমিক প্রায় ৫০০-৬০০ কেজি খড় তৈরী করতে পারেন।
- গবেষণা করে দেখা গাছে যে, এ পদ্ধতিতে খড়ের সঙ্গে ১.০০ টাকার মোলাসেস খাইয়ে প্রায় ৫.০০ থেকে ৭.০০ টাকার গরুর মাংস উৎপাদন সম্ভব।
- যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে, তাই প্রাণির বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা মত খড় প্রস্তুতকরে প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন। তবে প্রক্রিয়াজাত খড় তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করে রাখা যাবে না। কেননা তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করলে এর গুণগত মান কমে যাবে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে অসুবিধা

ইউ.এম.এস পদ্ধতিতে ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানোর তেমন কোন অসুবিধা নেই। তবেছয় মাসের কম বয়সের বাছুরকে ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়াতে সাবধনতা অবলম্বন ঃ

- ইউ.এম.এস তৈরী করার সময় অবশ্যই ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে।
- ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। ইউ.এম.এস এর গঠন পরিবর্তন করলে কাংখিত ফল পাওয়া যাবে না।

প্রাণিকে কোন কোন অবস্থায়ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না ঃ

নিম্ন বর্ণিত অবস্থায়প্রণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না -

- ৬ মাসের কম বয়সের বাছুর গরুকে।
- অসুস্থ গবাদি প্রাণিকে।
- প্রণিকে সালফার জাতীয় ঔষধ খাওয়ানোর পর অন্ততঃ পরবর্তী ১৫-৩০ দিন।
- গর্ভবতী গাভীর গর্ভকালীন অবস্থার শেষের দিকে।
- যে সকল প্রাণি ইউ.এম.এসখাওয়ালে প্রায়ই অসুবিধা বোধ করে বা এলার্জি দেখা দেয়।

খাদ্য ব্যবস্থাপনায় পশুর অন্যান্য যত্ন ঃ

খাদ্য পরিবেশনার উপরও গরুর খাদ্য গ্রহণের তারতম্য হয়। যেমন ঃ

- নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহ করা।
- গরুর সম্মুখে সর্বদা খাদ্য রাখা।
- খাদ্য সরবরাহের আগে অবশ্যই পাত্র পরিষ্কার করা।
- দানাদার খাদ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মেপে ২ বারে (সকালে ও বিকালে) পরিবেশন করা।
- দানাদার খাদ্য আধা ভাঙ্গা অবস্থায় ভিজিয়ে খেতে অভ্যস্ত হলে সেভাবে দেয়া।
- শুকনা দানাদার খাদ্য দিলে খাদ্য গ্রহণের পরপরই পানি দেয়া।
- খড় কেটে ভিজিয়ে পরিবেশন করলে কম নষ্ট হয় এবং খাদ্যের গ্রহণ হারও বাড়ে ।
- খাদ্য অবশ্যই মাটি/বালি মুক্ত থাকা, খাদ্য পচা, বাসি, অতি পুরাতন না হওয়া।

প্রাণিকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস খাওয়ালে উপকারিতা ঃ

- অধিক দুধ পাওয়া যাবে।
- খাদ্য খরচ কম হবে।
- গাভী সুস্-সবল বাছুর জন্ম দেবে।
- সঠিক বয়সে যৌন পরিপক্কতা আসবে।
- জন্মের সময় বাচ্চার মৃত্যু হার খুবই কম হবে, ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা কম হবে।
- গাভীর মৃত্যু হার খুবই কম হবে, ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা কম হবে।
- দানাদার খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কম হবে, ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে যাবে।
- জন্ম নেয়া বাছুরের দৈহিক ওজন কাংখিত মাত্রায় পাওয়া যাবে।
- রোগ-ব্যাধি কম হয় ফলে ঔষধ খরচ কমে যাবে এবং চিকিৎসা খরচ খুবই কম হবে।
- দুধ উৎপাদন বেশী হলে গরিব কৃষক দধু বিক্রয়ের পাশাপাশি নিজেরাও দুধ খেতে পারবেন এবং নিজেরাও অসুস্থসবল থাকবেন।
- এক একর জমিতে ধান চাষ করে যে লাভ পাওয়া যায়, ঘাস চাষ করলে তার চেয়েও বেশী লাভ পাওয়া যাবে।

প্রাণিকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস না খাওয়ালে অপকারিতা ঃ

- দুধ উৎপাদন কম হবে।
- প্রণি অপুষ্টিতে ভোগে এবং রোগ-ব্যাধি বেশী হবে।
- গাভির প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং ঘন ঘন প্রজনন করতে হবে।
- গভর্পাতের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।
- দুর্বল ও কম ওজনের বাছুরের জন্ম হবে। ফলে বাছুরের মৃত্যু হার বেড়ে যাবে।

- যৌন পরিপক্কতা দেরিতে আসবে।
- দুর্বলতার কারণে রোগ-ব্যাধি বেশী হওয়াতে চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যাবে।
- রোগ হলে উৎপাদন কমে যাবে ফলে কৃষক আর্থিকভাবে গ্রতিগ্রস্ত হবে।
- বাছুরের পরবর্তীতে আশাতিত ওজন পাওয়া যাবে না এবং উক্ত বাছুর থেকে আশানুরূপ উৎপাদনও পাওয়া যাবে না।
- দানাদার খাদ্য বেশী দরকার হয় ফলে গাভী পালনের খরচ বেড়ে যায়।

৪র্থ সেশনঃ

গাভীর প্রজনন, গর্ভকালীন পরিচর্যা ও নবজাত বাছুরের পরিচর্যা ঃ

গবাদি পশুর বংশ বিস্তারের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যাঘাত ঘটলে বাচ্চা ও দুধ উৎপাদন ব্যাহত হবে। বাংলাদেশে দুগ্ধ খামারে প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা য় অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো বন্ধ্যাত্ব। বন্ধ্যাত্ব হলে গাভী সময়মত গরম হবে না, বীজ দিলে গর্ভধারণ করবে না, একবার বাচ্চা দিলে ঋতুচক্র প্রদর্শন করতে সময় বেশি লেগে যাবে ইত্যাদি। দুগ্ধ খামারে এ সকল সমস্যার যে কোন একটি দেখা দিলে উক্ত দুগ্ধ খামার থেকে লাভ করা অতন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। তাই গাভী/বকনা এর প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খামার মালিকদের সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

একটি আদর্শ বকনা/গাভীর বৈশিষ্ট্য ঃ

- একটি আদর্শ বকনা/গাভীর জন্য জন্মের পর থেকেই বাছুরকে সুষ্ঠু পরিচর্যা করা হলে দেশী জাতের বকনা বাছুর ২৪-৩৬ মাস এবং সংকর জাতের বকনা বাছুর ১০-১৮ মাস বয়স থেকেই ডাকে আসে। তবে বকনা বাছুরকে প্রথম প্রজননের জন্য তার বয়স ১৮-২২ মাস না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম।
- স্বাভাবিক অবস্থায় বকনা/গাভীর ডাক থাকে ১২-২৪ ঘন্টা, তবে ১২-১৮ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করা উত্তম।
- বকনা/গাভী গর্ভধারন না করলে দুই ঋতুচক্রের ব্যবধান হবে ২১ দিন।
- বকনা/গাভী গর্ভধারণের/গর্ভকালীন সময় হবে ২৮০ (±/১০) দিন।
- জন্মের সময় বাছুরের ওজন হবে ১৫-১৮ কেজি।
- বাচ্চা প্রসবের পর গাভীর দুধ প্রদানের সময়কাল হবে ২৮৫-৩০৫ দিন।
- বাছুর এর দুধ সেবনকাল হবে ১৮০ দিন।
- প্রসব পরবর্তী প্রথম প্রজননের সময় হবে ৬০-৯০ দিন।
- বাচ্চা প্রসবের পর গাভীর পরবর্তী বাচ্চা উৎপাদনকাল হবে ৩৭৫-৪০০ দিন।

বকনা/গাভী ডাকে আসা/গরম হওয়ার লক্ষণ ঃ

- বকনা/গাভী অস্থির থাকবে এবং এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে ছটফট করবে।
- বকনা/গাভীকে খুব সর্তক মনে হবে এবং কান খাড়া রেখে সর্তকা প্রকাশ করবে।
- ঘন ঘন হাম্বা হাম্বা করে ডাকবে।
- ডাকেআসা বকনা/গাভী অন্য গরুর উপর লাফিয়ে উঠার প্রবণতা দেখা দেবে।
- ঘন ঘন ও অল্প অল্প প্রস্রাব করবে।
- খাদ্য গ্রহনের প্রতি অনিহা ভাব থাকবে।
- বার বার লেজ নাড়া বা লেজ ডানে/বায়ে সরিয়ে নেবে।
- যোনি মুখ হালকা ফুলে যাবে বা ঈষৎ লাল হবে।
- যোনির পথ দিয়ে জেলীরমত স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বা মিউকাস বের হবে।
- দুধাল গাভী ডাকে আসার সময় হঠাৎ করে দুধ কম দেবে।

গাভীর প্রজনন কার্যক্রম ঃ

যে কোন প্রাণির বংশ বিস্তার ঘটে প্রজননের মাধ্যমে। এই প্রজনন প্রক্রিয়া দু'টি পদ্ধতিতে করা যেতে পারে -

১ প্রাকৃতিক প্রজনন পদ্ধতি - এই পদ্ধতিতে ষাঁড়ের দ্বারা গাভীকে সরাসরি প্রজনন করা হয়।

২ কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি - এই পদ্ধতিতে ষাঁড় থেকে সরাসরি বীজ সংগ্রহ করে গবেষণাগারে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে গাভী গরম হলে উক্ত বীজ দিয়ে কৃত্রিমভাবে গাভীকে প্রজনন করা হয়।

কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা ঃ

- উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন/বীজ দিয়ে দ্রুত এবং ব্যাপক ভিত্তিতে প্রাণীর উন্নত জাত তৈরী করা সম্ভব হয়।
- এ পদ্ধতিতে শুক্রানুর গুণাগুণ পরীক্ষা করা সম্ভব হয় এবং অনুর্বর ষাঁড় বাতিল করতে সহজ হয়।

- ষাঁড়ের জন্মগত ও বংশগত রোগ বিস্তার প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।
- একটি ষাঁড় থেকে একবার সংগৃহীত সিমেন/বীজ দ্বারা ১০০-৪০০ গাভী প্রজনন করানো যায়, ফলে বাড়তি ষাঁড় পালনের প্রয়োজন হয় না।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে কম খরচে অনেক বেশী গাভীকে পাল দেয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে একটি ষাঁড়ের সারা জীবনের সংগৃহীত সিমেন/বীজ দ্বারা প্রায় ১-১.৫ লক্ষ গাভীকে প্রজনন করা সম্ভব হয়।
- প্রজনন কার্যক্রম সহজ হয়, অর্থাৎ যে কোন সময় যে কোন স্থানে কৃত্রিম প্রজনন করা যায়।
- প্রাকৃতিক উপায়ে প্রজননে ষাঁড়ের মাধ্যমে একটি গাভী থেকে অন্যান্য গাভীর মধ্যে বিভিন্ন যৌন রোগ সংক্রামিত হতে পারে। কিন্তু কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গাভীর যৌন রোগ সংক্রমন সহজেই রোধ করা সম্ভব হয়।
- নির্বাচিত ষাঁড়ের সিমেন/বীজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনমত যে কোন সময় ব্যবহার করা যায়।
- বিদেশ থেকে উন্নত জাতের ষাঁড় না এনে প্রয়োজনে অল্প খরচে উক্ত ষাঁড় এর সিমেন/বীজ আমদানী করা যায়।
- প্রাকৃতিক প্রজননে অক্ষম উন্নত জাতের ষাঁড় থেকেও সিমেন সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করা যায়।
- ষাঁড় ও গাভীর দৈহিক ও অসামঞ্জস্যতার কারণে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সংগঠিত দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

কৃত্রিম প্রজননের উপকারিতা ঃ

- প্রাকৃতিক প্রজননে সম্ভাব্য যৌন রোগ থেকে গাভীকে রক্ষা করা যায়।
- সহজেই উন্নত জাতের বাছুর উৎপাদন করে অধিক দুধ/মাংশ উৎপাদন করা যায়।

কৃত্রিম প্রজননের সীমাবদ্ধতা ঃ

- সুষ্ঠু প্রজননের জন্য সিমেন/বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণও ব্যবহরে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হয়।
- গর্ভবতী গাভীকে ভুলক্রমে জরায়ুর গভীরে প্রজনন করালে গভর্পাত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।
- গাভীর উত্তেজনা কাল সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করতে হয়।
- প্রজননের জন্য রক্ষিত ষাঁড়ের জন্য বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয়।
- কৃত্রিম প্রজনন কাজের জন্য সহায়ক গবেষণাগারের প্রয়োজন হয়।

প্রজনন পরবর্তী নজরদারী ঃ

বকনা/গাভীকে প্রজনন করার পর পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। প্রজননকৃত প্রাণীটি যদি গর্ভধারণ করে থাকে তাহলে এক ধরণের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করবে। আর যদি গর্ভধারণ না করে থাকে তা হলে ২১ দিন পর পুণরায় ডাকে আসার সকল বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করবে। অনেক সময় বকনা/গাভী গর্ভধারণ ও করেনা আবার হিটেও আসেনা, বরং গর্ভধারণের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করে। তাই বকনা/গাভী গর্ভধারণ করেছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রজননকৃত বকনা/গাভীকে ৩ মাস পর ভেটেরিনারি হাসপাতালে নিয়ে গর্ভ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে। গর্ভধারণ না করলে খাবার এবং চিকিৎসার মাধ্যমে পুনরায় হিটে আনার ব্যবস্থাকরতে হবে। আর গর্ভধারণ করলে গর্ভবতী বকনা/গাভীর সুষ্ঠু পরিচর্যা করতে হবে।

গর্ভবতী বকনা/গাভীর পরিচর্যা ঃ

- গর্ভবতী বকনা/গাভীকে সুষ্ঠু পরিচর্যা করা হলে তার স্বাভাবিক প্রসব, পূর্ণ মাত্রায় দুধ উৎপাদন ও পরবর্তীতে সময়মত ডাকে আসা ও গর্ভধারণ করার সম্ভাবনা থাকে।
- গর্ভধারণের ৭ মাস পর্যন্ত তার খাদ্য, দুধ দোহন ও অন্যান্য পরিচর্যা স্বাভাবিক নিয়মে চলবে।
- গর্ভধারণের ৭ মাস পর থেকে গর্ভবতী বকনা/গাভীকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করে পর্যাপ্ত আলো বাতাসপূর্ণ ঘরে রাখতে হবে যাতে প্রাণীটি উক্ত ঘরে সহজেই নড়াচড়া করতে পারে।
- গর্ভবতী বকনা/গাভী যেন পড়ে গিয়ে আঘাত না পায় বা তার উপর অন্য কোন প্রাণি লাফিয়ে না উঠে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- গর্ভবতীর প্রাণীর স্বাভাবিক প্রসব ও দুধ উৎপাদনের জন্য ভেটেরিনারী ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে গর্ভবতী বকনা/গাভীর অবস্থার উপযোগী খাদ্য, দুধ দোহন ও অন্যান্য পরিচর্যার ব্যবস্থাকতে হবে।
- অতিরিক্ত ঠান্ডা ও গরম থেকে গর্ভবতী বকনা/গাভীকে রক্ষা করতে হবে।
- ঘরের মেঝেতে শুকনা পরিস্কার খড় সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিতে হবে, যাতে প্রণীটি আরাম করে শুতে পারে। ঘরের মেঝেতে এ জন্য প্রয়োজনে ফ্লোর ম্যাট ব্যবহার করা যেতে পারে।
- মশামাছির উপদ্রব হতে প্রাণীকে রক্ষা করতে হবে।
- গর্ভবতী বকনা/গাভীকে প্রত্যহ সবুজ কাঁচা ঘাস, দানাদার খাদ্য ও প্রচুর পরিমান পরিস্কার পানি খাওয়াতে হবে।
- গর্ভবতী বকনা/গাভীকে শীতের সময় পানি কুসুম গরম করে খেতে দিতে হবে এবং গরমের দিন হলে প্রতিদিন গোসল করাতে হবে

গর্ভধারণের শেষের দিকে গাভীর দোহন বন্ধ করণ ও উহার সুফল ঃ

- দুগ্ধবতী গাভীকে গর্ভধারণের ৮মাস পর্যন্ত দুধ দোহনের পর দোহন বন্ধ করতে হবে।

- এ সময়ে দুধের প্রবাহ বন্ধ না হলে দানাদার খাদ্য কিছুটা কমিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে দুধ দোহন বন্ধ করার প্রথম ১-২ দিন খাদ্য তালিকায় মিশ্রিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। তাহলে ওলানে দুধ প্রবাহে বন্ধ হতে সহায়তা করবে।
- দুধ দোহন বন্ধ করা না হলে নবজাত বাছুর অত্যন্ত নিস্তেজ ও দুর্বল হওয়া এবং গাভীর পরবর্তী দোহনে দুধ উৎপাদন হ্রাস পাবে।
- দুধ বন্ধ হলে পুনরায় পূর্বের ন্যায় মিশ্রিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তবে প্রসবের প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব হতে গাভীর খাদ্যের পরিমান আস্তে আস্তে হ্রাস করতে হবে এবং সহজে হজম হয় এমন খাদ্য খাওয়াতে হবে ও পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাকরতে হবে।
- গাভীর প্রতি প্রসবের ২/৩ দিন আগে থেকে ২৪ ঘন্টা তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে।

গাভীর প্রসবকালীন লক্ষণ ঃ

- গাভীর ওলান বড় হয়ে যাবে ও বাঁট দিয়ে দুধ জাতীয় তরল পদার্থ বের হবে।
- যোনিমুখ বড় হয়ে ঝুলে যাবে এবং নরম ও ফোলা থাকবে।
- পেট ঝুলে পড়বে ও লেজের গোড়ার দুই পাশের স্থানেগর্তের মত হবে।
- যোনিমুখ দিয়ে আঠাল তরল পদার্থ নির্গত হবে ও গাভী ঘন ঘন প্রস্রাব করার চেষ্টা করবে।
- চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে বাছুরের সামনের দুই পা ও নাক দেখা যাবে।

গাভীর প্রসবকালীন পরিচর্যা ঃ

- গাভীর যখন বাচ্চা প্রসবের সময় হয় তখন গাভীকে একটি উন্মুক্ত নিরিবিলি স্থানেরাখতে হবে।
- গাভীর প্রসবের স্থানপরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং পরিস্কার শুকনা খড় বিছিয়ে দিতে হবে।
- গাভীকে লোক চোখের আড়ালে নিরিবিলি স্থানেরাখতে হবে এবং অন্য গরুর সাথে যেন মারামারি না করে তা খেয়াল রাখতে হবে।
- প্রসবের সময় যেন কুকুর, বিড়াল, শিয়াল ইত্যাদি কাছে না আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- স্বাভাবিক প্রসবের সময় প্রসূত বাচ্চার সামনের দু'পা তার মধ্যে মাথাসহ বেরিয়ে আসবে। তারপর সমস্ত শরীর বেরিয়ে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে।
- প্রসবকালীন সময়ে গাভী বারবার উঠা-নামা করবে। এ সময় অতি সাবধানে বাছুরের সামনের দু'টি পা ও মাথাকে ধরে আস্তে আস্তে টেনে ভূমিষ্ঠ করাতে হবে।
- স্বাভাবিক প্রসব না হলে সাথে সাথে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রসব হয়ে গেলে বাছুরকে গাভীর সামনে দিতে হবে, যাতে গাভী বাছুরের শরীর চেটে পরিস্কার করতে পারে।

প্রসবোত্তর গাভীর যত্ন ও পরিচর্যা

- প্রসবের পর গাভীর পিছনের অংশ জীবানুনাশক মিশ্রিত পানি দিয়ে ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে।
- আবহাওয়া বেশী ঠান্ডা হলে গাভী ও বাছুরের জন্য উষ্ণতার ব্যবস্থাকরতে হবে।
- প্রসবের পরপরই একটি বালতিতে কুসুম গরম পানির সাথে দেড় কেজি গমের ভূষি, আধাকেজি চিটাগুড়, ৫০ গ্রাম লবন মিশিয়ে গাভীকে খেতে দিতে হবে। এরূপ খাদ্য খাওয়ালে গাভীর গর্ভফুল তাড়াতাড়ি পড়ে যেতে সহায়তা করবে। তাছাড়া কুসুম গরম পানিতে শুধু ঝোলাগুড় মিশিয়েও গাভীকে খাওয়ানে যেতে পারে।
- প্রসবের পরপরই ওলান ঈষৎ উষ্ণ পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে বাছুরকে শাল দুধ খাওয়াতে হবে।
- গাভীর শাল দুধে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। শাল দুধের সাথে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম বের হয়ে যাওয়ার ফলে গাভীর ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগ মিল্ক ফিভার হতে পারে। এজন্য গাভীকে প্রচুর কাঁচা সবুজ ঘাস এবং খনিজ সমৃদ্ধ দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।
- সাধারণত বাচ্চা জন্মানোর ৬-১২ ঘন্টার মধ্যে প্রসবকৃত গাভীর ফুল (Placenta) বের হয়ে যায় ।
- স্বাভাবিকভাবে গর্ভফুল না পড়লে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
- প্রসবের ২/১ দিন আগে থেকে রাত্রে পাহারা দিতে হবে, কেননা রাত্রে প্রসব হয়ে গেলে গর্ভফুল পড়া মাত্র গাভী তা খেয়ে ফেলতে পারে। গাভী গর্ভফুল খেলে গাভীর স্বাস্থ্যহানী হবে ও দুধ উৎপাদন কমে যাবে। সময়মত ফুল পড়লে সাথে সাথে তা সরিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের ২ দিন পর থেকে গাভীকে নিয়মিত দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।

গাভীর দুধ দোহন ঃ

- গাভী দোহনের আগে ও পরে গাভীর ওলান, তলপেট ও আশ-পাশ ঈষৎ উষ্ণ গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দ্বারা মুছে দিতে হবে।
- বাছুরকে দুধ চুষে খেতে দিতে হবে, এতে গাভী দেরীতে দুগ্ধহীনা হয় । বাছুর বাঁট চুষলে এক ধরনের স্টিমুলেশন হওয়ায় দুগ্ধ দানের হরমোন নি:সৃত হয়।

- গাভীকে খালি পেটে দুধ দোহন করতে হবে। কেননা ঘাস পানি খেয়ে পেট পূর্ণ হওয়ার পর দুধ দোহন করলে গাভী ওলান ফুলা রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
- দুধ দোহনের পর জীবানু নাশক ঔষধের পানি দিয়ে গাভীর বাট স্পঞ্জ করলে ভাল হয়। এতে সহজে ওলান ফুলা রোগ হয়না।
- গাভীর ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ও শোবার জায়গায় পরিষ্কার শুকনা খড়ের নরম বিছানা করে দিতে হবে। ঘরের মেঝেতে প্রয়োজনে ফ্লোর ম্যাট ব্যবহার করা যেতে পারে।

বকনা/গাভীর বন্ধ্যাত্ব ও প্রতিকার ঃ

বাচ্চা উৎপাদনের অক্ষমতাকে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা বলে। বিভিন্ন কারণে বকনা/গাভীর বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যেতে পারে। যেমন-

- শারীরিক গঠন জনিত কারণ ঃ শরীরের অনেক জন্মগত বা বংশগত ত্রুটিজনিত কারণে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা হতে পারে, যেমন- ডিম্বাশয়, সার্ভিক্স ইত্যাদির অস্বাভাবিকতা।
- দূর্ঘটনা জনিত কারণ ঃপ্রজনন তন্ত্রে যে কোন ধরনের আঘাতের ফলে অথবা জরায়ুর বহির্গমন, যোনীর বহির্গমন ইত্যাদির কারণে গাভী বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বর হতে পারে।
- শরীরবৃত্তীয় কারণ ঃ বিভিন্ন হরমোনের অভাব ও অনিয়মিত ক্ষরণের ফলে গাভীর বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা দেয়। যেমন- ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন, লিউটিনাইজিং হরমোন, প্রোজেষ্টেরন হরমোন ইত্যাদি। এছাড়াও ডিম্বাশয়ের বিভিন্ন রোগ যেমন- পারসিস্টেন্ট করপাস লিউটিয়াম, সিষ্ট, ফলিকুলার এট্রফি ইত্যাদি।
- পুষ্টিগত কারণ ঃসুষম খাদ্যের অভাবে বকনা/গাভীর বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যায়। যেমন- ভিটামিন-এ, ডি, ই ও খনিজ পদার্থের মধ্যে ফসফরাস, কপার, কোবাল্ট ইত্যাদির অভাব। সবুজ/কাঁচা ঘাস না খাওয়ালেও বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা হতে পারে।
- মনস্তাত্বিক কারণ ঃ ভয় বা স্নায়ুবিক উত্তেজনার ফলে প্রাণির গর্ভধারণ বিঘ্নিত হতে পারে। বিশেষ করে বকনার ক্ষেত্রে প্রজনন ভিতি বা অস্থিরতা অথবা মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনার কারণে বকনা/গাভীর বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা দিতে পারে।
- রোগ জনিত কারণ ঃবিভিন্ন সংক্রামক যৌন রোগ যেমন- ব্রুসেলোসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ভিব্রিওসিস, লেপটোসপাইরোসিস ইত্যাদি অথবা প্রজননতন্ত্রের অন্যান্য রোগ যেমন- মেট্রাইটিস, সার্ভিসাইটিস, পায়োমেট্রা, সালফিনজাইটিস ইত্যাদির কারণে বকনা/গাভী বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বর হতে পারে। এ সমস্ত রোগ প্রজনন ষাঁড় থেকেও বকনা/গাভীতে সংক্রামিত হতে পারে।
- বংশগত কারণ ঃ অনেক সময় বংশগত কারণে প্রাণীর বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যায়।
- ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ঃ লালন-পালন ও ব্যবস্থাপনা য় ত্রুটির কারণে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা দিতে পারে। যেমন- অযত্ন- অবহেলা, ত্রুটিপূর্ণ বাসস্থান, অপর্যাপ্ত খাদ্য, সবুজ/কাঁচা ঘাস না দিলে, অনিয়মিত দুধ দোহান, প্রসবকালীন অবহেলা ইত্যাদি। অদক্ষ হাতে/অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কৃত্রিম প্রজনন বা বাচ্চা প্রসব করানোর ফলে গাভীর জরায়ু সংক্রামিত হয়ে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা দিতে পারে।
- অন্যান্য কারণ ঃ বিভিন্ন বিষয় যেমন- প্রাণির বয়স, ঋতু, তাপমাত্রা, আলো ইত্যাদি প্রাণির উর্বরতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণত: ৪ বছর বয়স পর্যন্ত গাভীর উর্বরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ও ৬ বছর পর্যন্ত তা বিরাজমান থাকে। কিন্দ ৬ বছর পর থেকে উর্বরতা হ্রাস পেতে থাকে।

গাভীর বন্ধ্যাত্বের লক্ষণ ঃ

- বাচ্চা প্রসবের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে গাভী গরম না হওয়া।
- সব সময় গরম থাকা বা অনিয়মিতভাবে গরম হওয়া।
- ১৫ দিনের কম সময় বা ২৮ দিনের বেশি সময় পর পর গরম হওয়া।
- দীর্ঘদিন অর্থাৎ এক বছর বা অধিক সময়কাল গরম না হওয়া।
- স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র থেকে ঘোলা, পুজ বা রক্ত মিশ্রিত মিউকাস নির্গত হওয়া।
- গর্ভপাত হওয়া।
- তিন বারের অধিক প্রজননের পরও গর্ভধারণ না করা।
- গর্ভফুল না পড়া, জরায়ুর বহির্গমন ইত্যাদি।

বন্ধ্যাত্ব প্রতিকারের উপায় ঃ

- স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন করতে হবে।
- গাভীকে সুষম খাদ্য ও সবুজ ঘাস খাওয়াতে হবে।
- সঠিকভাবে গাভীর গরমকাল নির্ধারণ করে সময়মত প্রজননের ব্যবস্থাকরতে হবে।
- প্রজনন তন্ত্রে কোন অসুখ থাকলে সময়মত তার চিকিৎসার ব্যবস্থাকরতে হবে।
- প্রসবের সময় সঠিক যত্ন নিতে হবে।
- প্রসবের পর ৬০-৯০ দিন পর গাভীকে পুনরায় প্রজনন করাতে হবে।

বাছুরের পরিচর্যাঃ

ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে বাছুরকে যথাযথভাবে লালন-পালন করতে হবে। বাছুরের যত্ন মূলত গাভী গর্ভবতী থাকা অবস্থা থেকেই হরতে হবে। এক্ষেত্রে গাভীকে অন্তত গর্ভের শেষ তিনমাস পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করতে হবে। বাছুরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগমুক্ত রাখার জন্য বিশেষ কয়েকটি নিয়মের প্রতি খেয়াল রাখলে ভবিষ্যতে অসুখ- বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

- অপরিষ্কার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে বাছুর প্রসব করলে বাছুরের বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। তাই গাভী প্রসবের প্রাক্কালে গাভীকে অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন ও শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।
- স্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ ব্যতীত অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেলে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।
- জন্মের পর পরই বাছুরকে শুকনো খড়কুটো বা ছালার উপর রাখতে হবে। বাছুরের নাক ও মখু মন্ডল হতে লালা বা ঝিল্লি পরিষ্কার করতে হবে। নতুবা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই গাভী যেন তার নবজাত বাছুরকে চাটতে পারে সে সুযোগ করে দিতে হবে,
- যদি বাছুরের শ্বাস- প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তবে বুকের পাঁজরের হাড়ে আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পর পর কয়েক বার চাপ প্রয়োগ করতে হবে। বাছুরের নাকে, মুখে, নাভীতে ফুঁ দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।
- জন্মের সাথে সাথে বাছুরের নাভীতে কিছু এন্টিসেপটিক যেমন টিংচার আয়োডিন, ডেটল বা সেভলন লাগাতে হবে। ফলে ধনুষ্টংকর, নাভী ফুলা ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা থাকে না।
- গাভী যেন তার বাছুরকে চাটতে পারে সে সুযোগ করে দিতে হবে অথবা শুকনা খড় বা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বাছুরের শরীর ভাল ভাবে মুছে দিতে হবে। এ অবস্থায়বাছুরকে পানি দিয়ে ধৌত করা সমীচিন হবে না। কারণ, পানির সংস্পর্শে আসলে বাছুরের ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এবং নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে।
- নবজাত বাছুরকে ১-২ ঘন্টার মধ্যে শাল দুধ খাওয়াতে হবে, এই শালদুধ খাওয়ালে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এই দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' যা বাছুরের জন্য অত্যন্ত উপকারী।
- বাছুরকে দুই সপ্তাহ পর দুধ সরবরাহের সাথে সাথে অল্প পরিমাণ কচি ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাওয়ানো উচিত। নতুবা এর হজম ক্ষমতা কমে যাবে এবং পাকস্লির পরিপক্কপতা দেরীতে আসবে।
- বাছুরের প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সময় মত খাদ্য ও পানি সরবরাহ দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে।

বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

- বাছুরের জন্মের পর থেকে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরকে যতটুকু পুষ্টিসাধন করা হবে পরবর্তী জীবনকালের বৃদ্ধি ও উৎপাদন তার উপর সিংহভাগ নির্ভর করবে।
- জন্মের প্রথম দিন থেকে সাধারণতঃ ৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধি ও ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ সময় যদি শরীরে পুষ্টির অভাব হয় তবে এর যৌনাঙ্গের বিকাশ ও যৌবন প্রাপ্তি দেরীতে আসবে। ফলে ভবিষ্যতে গর্ভ ধারণ ও বাচ্চা উৎপাদনও কম হবে। অনেক ক্ষেত্রে বাছুর পুষ্টির অভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে মারাও যেতে পারে। এসব কারণে জন্মের পর থেকেই পরিমিত খাদ্য সরবরাহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।
- জন্মের পরপরই বাছুরকে মায়ের শাল দুধ খাওয়াতে হবে। অর্থাৎ বাছুর জন্মানোর আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যে শাল দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে। শাল দুধ খাওয়ানোর নিয়ম হলো, বাছুরের ওজন ১০কেজি হলে ১ কেজি শাল দুধ, বাছুরের ওজন ২০-২৫ কেজি হলে ১.২-১.৫ কেজি শাল দুধ খাওয়াতে হবে।
- বাচ্চাকে গাভী থেকে দুধ চুষে খেতে দিতে হবে । এতে গাভী বেশী দুধ দিবে এবং গাভী দেরীতে দুধ দেয়া বন্ধ করবে।
- সাধারণতঃ বাছুরকে দু'বেলা দুধ খেতে দিতে হবে এবং নিয়মিত একই সময়ে দুধ খাওয়াতে হবে।
- বাছুরকে দুই সপ্তাহ পর দুধ সরবরাহের সাথে সাথে অল্প পরিমাণ কচি ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন। তা করা না হলে বাছুরের হজম ক্ষমতা কমে যাবে এবং পাকস্লির পরিপক্কপতা দেরীতে আসবে।
- জন্ম থেকে দুধ ছাড়া পর্যন্ত বাছুরকে দুধ, দানাদার ও ঘাস সরবরাহ এর পরিমান ঃ

বয়স	দৈনিক	দানাদার ও ঘাস সরবরাহ
০-৭ দিন (১ম সপ্তাহ)	২ লিটার	এ বয়সে দানাদার ও খড় ঘাসের প্রয়োজন নেই।
২য় সপ্তাহ	৩ লিটার	দানাদার খাদ্য অর্থাৎ কাফ স্টার্টার (২০% আমিষ সমৃদ্ধ) এবং কিছু কচি সবুজ ঘাস বাছুরকে সরবরাহ করতে হবে।
৩য়-১২ সপ্তাহ (৩ মাস)	৪ লিটার	• দৈনিক ০.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ১ কেজি হারে উচ্চমানের কচি নরম সবুজ ঘাস দিতে হবে। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।

১৩-১৬ সপ্তাহ (৪ মাস)	৩ লিটার	• দৈনিক ০.৭৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৩ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।
১৭-২০ সপ্তাহ (৫ মাস)	২ লিটার	• দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৭ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।
২১-২৪ সপ্তাহ (৬ মাস)	১ লিটার	• দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৭ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে। ৬ মাস এর পর থেকে বাছুরকে • দুধ খায়োনোর প্রয়োজন হয় না। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।

- বাছুরকে অতিরিক্ত দুধ সরবরাহ করা হলে বাছুরের পেট খারাপ হবে এবং বাছুর দুর্বল হয়ে পড়বে। এ সময়ে বাছুরের চিকিৎসা না করলে বা বাছুরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি না রাখলে বাছুর অন্যান্য জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ খাওয়ানো সুধু পেট খারাপ নয়, অপচয়ও বটে। ছয় মাসের উর্দ্ধে বাছুরকে দুধ পান করানো থেকে বিরত রাখতে হবে। তবে এ সময়ে তাদেরকে পরিমানমত দানাদার খাদ্য, সবুজ ঘাস ও খড় সরবরাহ করতে হবে।
- ছয় মাসের উর্দ্ধে বাছুরকে দুধ, দানাদার, সবুজ ঘাস ও খড় সরবরাহ এর পরিমাণ

বয়স	দৈনিক	দানাদার ও ঘাস সরবরাহ
২৫-৩৫ সপ্তাহ	দুধ পান বন্ধ করতে হবে।	• দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৭ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস ও কিছু খড় দিতে হবে। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না। • বাছুর গরুর বয়স ছয় মাস পার হলে তার ওজনের ১% ইউএমএস দানাদার খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
৩৬-৫০ সপ্তাহ	-	• দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ১০-১২ • কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস ও ১-২ কেজি খড় দিতে হবে। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না। • বাছুর গরুর ওজনের ১% ইউএমএস দানাদার খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

বাছুরের জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ ফরমূলাঃ

১. গমের ভুষি	৪০%
২. ডালের ভুষি	১৫%
৩. ছোলা ভাংগা	১০%
৪. তিলের খৈল	১৫%
৫. মাটি কলাই ভাংগা	১০%
৬. ভুট্টা ভাংগা	৫%
৭. খনিজ দ্রব্য	৪%
৮. লবণ	১%
মোট	১০০%

বাছুরের বাসস্থানঃ

বাছুরকে রোগমুক্ত রাখার জন্য তাদেরকে আলাদা আলাদা ঘরে রাখতে হবে এবং এর ফলে প্রতিটি বাছুরের রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হবে। অনেক বাছুর একসাথে থাকলে দুর্বল বাছুরগুলো আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ দূর্বলগুলো সবলদের সাথে প্রতিযোগীতা করে প্রয়োজন মত খেতে পারে না।

- বাছুরের ঘর ঢালু এবং শুকনো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন।
- বাসস্থানেপর্যাপ্ত আলো বাতাসের সরাসরি প্রবেশের ব্যবস্থাথাকতে হবে।
- গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম ও শীতকালে প্রচন্ড ঠান্ডা দ্বারা বাছুরগুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ঘরের মেঝেতে শুকনো খড় বা ছালার চট বিছিয়ে দিতে হবে।
- গ্রামীণ পর্যায়ে বাঁশ ও কাঠের সাহায্যে অতি সহজেই ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে।
- ঘরে খাদ্য ও পরিষ্কার পানি সরবরাহের জন্য পাত্র রাখতে হবে।
- বাছুরের ঘর স্যাঁতস্যাঁতে ময়লা আবর্জনাময় হলে বাছুরের শ্বাস কষ্ট হয়।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা র জন্য বাছুরকে তিন দলে ভাগ করে বাছুরের বাসস্থানকরা প্রয়োজন ঃ

১. এক বছরের কম বয়সী।
২. এক বছরের বেশী বয়সী বকনা বাছুর।
৩. এক বছরের বেশী বয়সী এঁড়ে বাছুর।

বাছুরের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার ঃ

১) সংক্রামক রোগ ঃ

➢ সাদা বাহ্য বা কাফ স্কাওয়ার, নেভাল ইল বা নাভীর রোগ, সালমোনেলোসি, নিউমোনিয়া, বাদলা, তড়কা, ধনুস্টংকার, ক্ষুরা, জলাতংক, ইত্যাদি। এ সকল রোগ দমনে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী ব্যবস্থানিতে হবে।

২) কৃমি বা পরজীবীজনিত রোগঃ পরজীবী সাধারনত দুই ধরনের

➢ দেহাভ্যন্তরের পরজীবী/কৃমি ঃ গোল কৃমি; ফিতা কৃমি; পাতা কৃমি। এসকল রোগ দমনে বাছুরকে দু'মাস বয়স হলে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো আরম্ভ করতে হবে।

➢ বহিঃদেহের পরজীবী ঃ এগুলোকে দেহের পোকা বলা হয়। এরা বাছুরের ত্বকে বাস করে ত্বকের যথেষ্ট ক্ষতি কওে থাকে। বহিঃদেহের পরজীবীর মধ্যে বাছুরে আঁঠালি, উকুন, মাছি, মাইটস বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বহিঃদেহের পরজীবী দমনে বাছুরের শরীর ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।

➢ বাছুরের বয়স ৬ মাস হলে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী বহিঃদেহের পরজীবী ধ্বংসকারী ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

৩) প্রোটজোয়াজনিত রোগ ঃ

➢ প্রোটোজোয়া এক প্রকার এককোষী প্রাণী। বাছুর বিভিন্ন ধরনের প্রোটোজোয়া রয়েছে, যেমন- বেবেসিয়া, এনাপ্লাজমা, ককসিডিয়া, ইত্যাদি। তবে বাছুরে সাধারণতঃ ককসিডিয়া নামক প্রোটোজোয়ার আক্রমণ বেশী হতে দেখা যায়।

➢ এ রোগ দমনে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী ব্যবস্থানিতে হবে।

৪) সাধারণ রোগ-ব্যাধি ঃ

➢ নবজাত বাছুরের সাধারণ রোগ ঃ নবজাত বাছুরের সাদা উদরাময় রোগ (ঈধষভ ঝপড়ঁৎং), বাছুরের নাভি ফোলা রোগ।

৫) অন্যান্য বাছুরের সাধারণ রোগ ঃ বিষক্রিয়াজনিত রোগ, অপুষ্টিজনিত রোগ, পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ যেমন- পেট ফাঁপা, উদারাময়, কোষ্ঠকাঠিণ্য এবং বিপাকীয় রোগ।

এ সকল রোগের চিকিৎসাও ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী করতে হবে

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০২	অধিবেশন নং- ০২	সময়: ০৯:৩০-১০:৩০	মেয়াদকাল: ৯০ মিনিট

শিরোনাম : বিকল্প কর্মসংস্থানের সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক আলোচনা (উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা)

অভীষ্ট দল: বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নির্বাচিত সুফলভোগী জেলে

লক্ষ্য: অংশগ্রহণকারীদের উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল-ভেড়া পালন বিষয়ে ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা নিজেরা এ কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে পারেন।

উদ্দেশ্য: *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-*

- ছাগল পালনের সুবিধা-অসুবিধা এবং গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রতিপালনযোগ্য উন্নত জাতের ছাগলের জাত সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- লাভজনকভাবে ছাগল পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ছাগল পালনে রোগ, স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচর্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	গময়
ভূমিকা			১৫ মিনিট
	১. স্বাগত জানানো, কুশল বিনিময় ২. পূর্ববর্তী অধিবেশনের সূত্র ধরে বর্তমান অধিবেশনের অবতারণা (প্রধান শিক্ষণ বিষয়: উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল-ভেড়া পালন) ৩. বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত (শিরোনাম) ৪. বর্তমান অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ	প্রশ্নোত্তর পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৬৫ মিনিট
	- ছাগলের জাত - ছাগল পালনের সুবিধা - ছাগল পালনের পদ্ধতি - ছাগল নির্বাচন - ছাগলের ঘর তৈরি - পরিচর্যা - খাদ্য ব্যবস্থাপনা - ছাগলের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা - ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা - ছাগল বাজারজাতকরণ - আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন	প্রশ্নোত্তর প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট	
সার-সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	১. মূল বিষয়ের পুনরালোচনা (প্রধান শিক্ষণ বিষয়গুলি) ২. উদ্দেশ্য যাচাই (অধিবেশনের উদ্দেশ্য); ৩. হ্যান্ড আউট বিতরণ ও পড়ানো; ৪. ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং পরবর্তি অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা দেয়া।	প্রশ্নোত্তর/ পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : পাওয়ার পয়েন্ট/ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে দেশে পোল্ট্রি এবং মৎস্য উৎপাদন দ্রুত বাড়লেও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে প্রাণিসম্পদ বিশেষ করে ছাগল/ভেড়া উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। এদেশে প্রাপ্ত ২০ মিলিয়ন ছাগলের প্রায় ৯৩% পালন করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের খামারীগণ। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্য, বিশেষ করে আমিষ জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি মিটাতে ছাগল/ভেড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। মাংস ছাড়াও বাংলাদেশের ছাগলের চামড়ার মান অত্যন্ত উন্নত এবং বিদেশে এর চাহিদা থাকায় চামড়া রপ্তানির মাধ্যমে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও ভেড়ার লোম সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। একটি ছাগল বা ভেড়ার স্বাভাবিক জীবন কাল ৮-১০ বছর।

গৃহপালিত প্রাণির মধ্যে ছাগল অত্যন্ত পরিচিত প্রাণী। ছাগলের জাতভেদে ১-৪টি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে থাকে। একটি ছাগী স্বাভাবিক গর্ভধারণকাল ১৪৮-১৫৬ দিন হয়। বয়স ও লিঙ্গভেদে এরা বিভিন্ন নামে পরিচিত; যেমন-

ছাগল ঃ ছাগল বলতে স্ত্রী, পুরুষ, বয়স্ক, বাচ্চা সবাইকে বুঝায়।
কিড ঃ সব ধরণের ছাগল ছানাকে কিড বলে।
বাকলিং ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বাচ্চা ছাগলকে বলা হয় বাকলিং।
গোটলিং ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী বাচ্চা ছাগলকে বলা হয় "গোটলিং"।
ছাগী ঃ পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলকে বলা হয় "ডো বা ছাগী"।
পাঁঠা ঃ পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ছাগলকে পাঁঠা বা বাক বলা হয়। এরা সাধারণত প্রজননক্ষম হয়।

ছাগলের জাত

উন্নত ও চাষযোগ্য ছাগলের উল্লেখযোগ্য জাতগুলো হলো:

- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল;
- যমুনাপারী জাতের ছাগল;
- বিটাল জাতের ছাগল

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল: বাংলাদেশের প্রধান জাতের ছাগল এই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল। এ জাতের ছাগলকে কালো বেঙ্গল ছাগল বলা হলেও এদের গায়ের রং কালো ছাড়াও বাদামী, সাদা ও সাদা কালো মিশ্রিত হতে দেখা যায়। এ জাতের ছাগল বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গ আসাম এবং ভারতের কোন কোন স্থানে পালন করতে দেখা যায়। বেঙ্গল জাতের ছাগলের কান সোজা ও খাড়া কিন্তু শিং বাঁকানো থাকে। এরা আকারে খুব ছোট হয়। পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী ছাগলের ওজন ১৫-২০ কেজি এবং পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ ছাগলের ওজন ২৫-৩০ কেজি হয়ে থাকে। এ জাতের ছাগলের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও জনপ্রিয়। এদের চামড়ার মান উনড়বত বিধায় বিশ্বব্যাপী চাহিদা রয়েছে। আফ্রিকার কমন জাতের ছাগলের মত এরা অত্যাধিক কষ্টসহিষ্ণু। বেঙ্গল জাতের ছাগল দ্রুত বংশ বিস্তার ঘটাতে পারে। স্ত্রী ছাগল ৯-১০ মাস বয়সে প্রথম প্রজননের যোগ্য হয় এবং ১৪-১৫ মাস বয়সে প্রথম বাচচা প্রসব করে থাকে। এ জাতের ছাগল বছরে দু'বার এবং প্রতিবার ১টি থেকে ৪টি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তবে এ জাতের ছাগী দুধ দেয় খুব কম। দু'এর অধিক বাচ্চা হলে দুধের ঘাটতি হয়।

যমুনাপারী জাতের ছাগল: এ জাতের ছাগলের উৎপত্তি মূলত ভারত। তবে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে এ জাতের ছাগল কিছু কিছু পালন করা হয়ে থাকে। এদের শারীরিক রং কালো, বাদামী, সাদা বা বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে হয়ে থাকে। যমুনাপারী জাতের ছাগলের পা খুব লম্বা এবং কান লম্বা ও ঝুলানো থাকে। শরীরের লোম লম্বা হয়। পিছনের পায়ের লোম বেশী লম্বা থাকে। এরা আকারে বেশ বড় হয়। পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ ছাগলের ওজন ৭০-৭৫ কেজি এবং পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী ছাগলের ওজন ৫০-৬০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে এদের চামড়া এবং মাংস তত উনড়বত নয়। স্ত্রী ছাগল বছরে একটি করে বাচ্চা দেয়। এদের দুধ উঃপাদন বেশি। একটি ছাগী প্রতিদিন ২-৩ লিটার পর্যন্ত দুধ দিতে পারে। এ জাতের ছাগলের সাথে এংলোনুবিয়ান জাতের ছাগলের সাদৃশ্য রয়েছে। আবদ্ধ অবস্থায় বা খামারে পালনের জন্য এ জাতের ছাগল উপযোগী। আমাদের দেশে এ জাতের ছাগল রাম ছাগল নামে পরিচিত।

বিটল জাতের ছাগলঃ পাকিস্তান ও ভারত এ জাতের ছাগলের উৎপত্তিস্থল। বাংলাদেশে এ জাতের ছাগল কিছু কিছু পালন করা হয়ে থাকে। এরা কালো, সাদা, বাদামী বা কালো ও বাদামীর মধ্যে সাদা ফুটফুটে হয়ে থাকে। এদের কান বড় ও ঝুলানো অনেকটা যমুনাপারী ছাগলের মত। এদের শিং পিছনের দিকে বাঁকানো থাকে। এরা আকারে বেশ বড় হয়। পা লম্বা হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৬০-৭০ কেজি এবং একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ৪০-৫০ কেজি হয়ে থাকে। স্ত্রী ছাগলের দাড়ি থাকে না। কিন্তু পুরুষ ছাগলের বা পাঁঠার দাড়ি থাকে। একটি ছাগী দৈনিক ৪-৫ লিটার দুধ দেয়।

ছাগল/ভেড়া পালনের সুবিধা

আমাদের দেশে ছাগল পালনে নানাবিধ সুবিধা রয়েছে। ভেড়া বা ছাগলের জন্য বড় পশুর মত চারণভূমির প্রয়োজন হয় না। তবে ভেড়া সবসময় দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে। খেতের আইলে, রাস্তার ধারে বাড়ির আশ-পাশের জায়গায় ঘাস, লতা, গুল্ম খেয়ে এরা জীবন ধারণ করতে পারে। বাড়ির আশ পাশের গাছ গাছড়ার পাতা ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ছাগলের জন্য গরু- মহিষের মত অধিক খাদ্য, উন্নত বাসস্থান বা বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। ছোট প্রাণি বলে ছাগল বা ভেড়ার দাম কম। ফলে অল্প পুঁজিতে ছাগল বা ভেড়া পালন করা যায়। অল্প পুঁজিতে অল্প জায়গায় কয়েকটি ছাগল বা ভেড়া পালন করা যায়। তাই গরীব বিশেষ করে ভূমিহীন প্রান্তিক চাষী, যুবক যুবতী, দুস্থ মহিলাদের জন্য গাভীর পরিবর্তে ছাগল পালন অধিক সুবিধাজনক। এজন্য আমাদের দেশে ছাগলকে গরিবের গাভী বলা হয়। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটি ছাগল পালন করে পড়াশুনার খরচ চালাতে পারে। বর্তমানে খরা, বন্যা, অনুর্বরতা এবং বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে শস্যহানী ঘটে তার পরিপ্রেক্ষিতে ছাগল পালন লাভজনক। বাংলাদেশের আবহাওয়া দেশি জাতের ভেড়া পালনের জন্যও অত্যন্ত উপযোগী।

দারিদ্র্য বিমোচনে ছাগল পালন

বাংলাদেশে প্রাপ্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস যেমন সুস্বাদু, চামড়া তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে উন্নতমানের বলে স্বীকৃত। তাছাড়া ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অধিক এবং তারা দেশিয় জলবায়ুতে বিশেষভাবে উৎপাদন উপযোগী। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল প্রধাণত মাংস ও চামড়া উৎপাদনকারী জাত হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃত। ছাগল পালনের মাধ্যমে একজন ভূমিহীন বা প্রান্তিক খামারী কিভাবে বাড়তি আয় করতে পারেন তার লক্ষ্যেই মডেলটি উদ্ভাবিত।

মডেলের ধরন

একজন খামারী একবার বা দু'বার বাচ্চা দিয়েছে এরূপ দু'টি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগী ক্রয় করতে পারে। একটি এলাকায় ১০-১৫টি মডেল খামারীর জন্য ২টি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা ধারে সরবরাহ করা যায় যার দায়িত্বে থাকবেন একজন খামারী। তিনি সরবরাহকৃত পাঁঠার সাহায্যে মডেল খামারীগণের ছাগী সহ অন্যান্য ছাগীর প্রজনন করাবেন। খামারীগণ তাদের খামারের আয়তন ১০-১২টি ছাগলের মধ্যে রাখবেন। এজন্য তারা খাসীকৃত ছাগলকে ৮-১২ মাসের এবং পাঁঠা বাচ্চাকে ৬ মাসের মধ্যে বিক্রি করবেন। এতে একজন খামারী বছরে দুইটি ছাগী থেকে গড়ে ৪টি খাসী ও ৩টি পাঁঠা বিক্রি করতে পারবেন।

খামারী নির্বাচন

একটি এলাকায় ১০-১৫ খামারী নিম্নোক্ত যোগ্যতায় বাছাই করা হবে।

- দুঃস্থ মহিলা/বেকার যুবকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- ছাগল/ভেড়া পালনে আগ্রহী ও পূর্বাভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- এমন খামারী নির্বাচন করা যিনি খামারের যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করতে এবং দেয়া শর্তসমূহ মেনে চলতে আগ্রহী।

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালন

বাংলাদেশে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে সাধারণত ছাগলকে ছেড়ে বা মাঠে বেঁধে খাওয়ানো হয়। গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিজ্ঞানভিত্তিক বাসস্থান, খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসারে ছাগল পালনের প্যাকেজ প্রযুক্তিকে স্টল ফিডিং পদ্ধতি বলা হয়।এ পদ্ধতিতে করণীয় হলো:

ছাগল নির্বাচন: এ পদ্ধতিতে ছাগল খামার করার উদ্দেশ্যে ৬-১৫ মাস বয়সী স্বাভাবিক ও রোগমুক্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা/ছাগী সংগ্রহ করতে হবে। পাঁঠার বয়স ৫-৭ মাস হতে পারে।

ছাগলের ঘর তৈরি: স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে প্রতিটি বয়স্ক ছাগলের জন্য প্রায় ১০ বর্গফুট ঘরের জায়গা প্রয়োজন। ঘরটি বাঁশ, কাঠ বা ইটের তৈরি হতে পারে। শীতের রাতে ঘরের বেড়া চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং মেঝেতে খড় বিছিয়ে দিতে হবে।

ছাগলকে ঘরে থাকতে অভ্যস্থ করানো: ছাগল সংগ্রহের সাথে সাথেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা উচিত নয়। প্রথমে ছাগলকে দিয়ে ৬-৮ ঘন্টা চরিয়ে বাকি সময় আবদ্ধ অবস্থায় রেখে পর্যাপ্ত খাদ্য (ঘাস ও দানাদার খাদ্য) সরবরাহ করতে হবে। এভাবে ১-২ সপ্তাহের মধ্যে চরানোর সময় পর্যায়ক্রমে কমিয়ে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে। তবে বাচ্চা বয়স থেকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখলে এ ধরণের অভ্যস্থতার প্রয়োজন নেই।

বাচ্চার পরিচর্যা: জন্মের পরপরই বাচ্চাকে পরিস্কার করে শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এক মাস পর্যন্ত বাচ্চাকে দিনে ১০-১২ বার দুধ খাওয়াতে হবে। বাচ্চার চাহিদার তুলনায় কম দুধ থাকলে প্রয়োজনে অন্য ছাগী থেকে দুধ খাওয়াতে হবে। তাছাড়া দুধ না পাওয়া গেলে বাচ্চাকে মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়াতে হবে। দুধ খাওয়ানোর আগে ফিডার, নিপলসহ আনুসাংগিক জিনিসপত্র পানিতে ফুটিয়ে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে। ১-১.৫ কেজি ওজনের একটি ছাগলছানার দৈনিক ২৫০-৩৫০ গ্রাম দুধ প্রয়োজন। ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। বাচ্চার বয়স ৬০-৯০ দিন হলে দুধ ছেড়ে দেবে। সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীকে প্রয়োজনমত খাওয়ালে বাচ্চার প্রয়োজনীয় দুধ পাওয়া যায়। বাচ্চার ১মাস বয়স থেকেই ধীরে ধীরে কাঁচা ঘাস এবং দানাদার খাদ্যে অভ্যস্থ করতে হবে।

ছাগলকে খাওয়ানো: ছাগল সাধারণত তার ওজনের ৪-৫% হারে খেয়ে থাকে। এর মধ্যে ৬০-৮০% আঁশ জাতীয় খাবার (ঘাস, লতা, পাতা, খড় ইত্যাদি) এবং ২০-৪০% দানাদার খাবার (কুড়া, ভূষি, চাল, ডাল ইত্যাদি) দিতে হবে। একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ১-১.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ২০০-২৫০ গ্রাম দানাদার খাবার দিতে হবে। দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ছাগীর দৈনিক প্রায় ১.৫-২.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ৩৫০-৪৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন হয়। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠার দৈনিক ১.৫-২.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ২০০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন।

ছাগলের জন্য ঘাস চাষ

ঘাস সরবরাহের জন্য বিভিন্ন জাতের দেশি ঘাস খাওয়ানো যায়। ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, খেসারী, মাসকলাই, দুর্বা, বাকসা ইত্যাদি দেশি ঘাসগুলো বেশ পুষ্টিকর। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল নেপিয়ার, স্পেনডিডা, এন্ড্রো পোগন, পিকাটুইস ইত্যাদি ঘাস আবাদ করা যেতে পারে।

ছাগলকে খড় খাওয়ানো

ঘাস না পাওয়া গেলে খড়কে ১.৫-২.০ ইঞ্চি (আঙুলের দুইকর) পরিমানে কেটে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো যেতে পারে। এ জন্য ১ কেজি খড়ের সাথে ২০০ গ্রাম চিটাগুড়, ৩০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬০০ গ্রাম পানির সাথে মিশিয়ে ইউ এম এস তৈরি করে খাওয়ানো যেতে পারে। এর সাথে এলজি উৎপাদন করে দৈনিক ১-১.৫ লিটার পরিমাণে খাওয়াতে হবে। একটি ছাগল দৈনিক ১.০-২.০ লিটার পানি খায়। এজন্য পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।

ব্যবস্থাপনা

যে সব পাঁঠা বাচ্চা প্রজনন কাজে ব্যবহৃত করা হবে না, তাদেরকে জন্মের ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে খাসী করানো উচিত। পাঁঠাকে যখন প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয় না তখন তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুধু ঘাস খাওয়ালেই চলে। তবে প্রজনন কাজে ব্যবহারের সময় ওজন ভেদে ঘাসের সাথে ২০০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দিতে হবে। প্রজননক্ষম রাখার জন্য প্রতিদিন পাঁঠাকে ১০ গ্রাম পরিমাণ গাঁজানো ছোলা দেয়া উচিত। পাঁঠাকে কখনই চর্বিযুক্ত হতে দেয়া যাবে না।

ছাগলের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

সব ছাগলকে বছরে দু'বার (বর্ষার শুরু এবং শীতের শুরুতে) কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। ছাগলের মারাত্মক রোগ, যেমন-পিপিআর, গোটপক্স হলে অতি দ্রুত নিকটস্থ প্রাণি হাসপাতালে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া ছাগলের তড়কা, হেমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া, এন্টারোটক্সিমিয়া জাতীয় রোগ এবং বিভিন্ন কারণে পাতলা পায়খানা এবং নিউমোনিয়া হতে পারে। সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসার মাধ্যমে এ সকল রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে সুস্থ ছাগলের জন্য একথাইমা রোগের ভ্যাকসিন জন্মের ৩য় দিন ১ম ডোজ এবং ২য় ডোজ জন্মের ১৫-২০ দিন পর দিতে হবে। পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন ৪ মাস বয়সে এবং গোট পক্সের ভ্যাকসিন ৫ মাস বয়সে দিতে হবে।

জৈব নিরাপত্তা

খামারে কোন নতুন ছাগল আনতে হলে অবশ্যই রোগমুক্ত ছাগল সংগ্রহ করতে হবে এবং ১৫ দিন খামার থেকে দূরে অন্যত্র রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোন রোগ দেখা না দিলে ১৫ দিন পর পিপিআর ভ্যাকসিন দিয়ে ছাগল খামারে নেয়া যাবে। অসুস্থ ছাগল পালের অন্য ছাগল থেকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। ছাগলের ঘর নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে। সকল ছাগলকে বছরে ৫-৬ বার ০.৫% ম্যালথায়ন দ্রবণে চুবিয়ে চর্মরোগ মুক্ত রাখতে হবে।

ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা

পাঁঠী ১২-১৩ কেজি ওজন (৭-৮ মাস বয়স) হলে তাকে পাল দেয়া যেতে পারে। পাঁঠী বা ছাগী গরম হওয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পর পাল দিতে হয়। অর্থ্যাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে এবং বিকেলে হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে। পাল দেওয়ার ১৪২-১৫৮ দিনের মধ্যে সাধারণত বাচ্চা দেয়। পাল দেওয়ার জন্য নির্বাচিত পাঁঠা সব সময় নিরোগ, ভাল বংশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের হতে হবে। ইনব্রিডিং এড়ানোর জন্য ছাগীর বাবা বা দাদা বা ছেলে বা নাতীকে দিয়ে প্রজনন করানো যাবে না।

ছাগল বাজারজাতকরণ

সুষ্ঠু খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় ১২-১৫ মাসের খাসী ২০-২২ কেজি ওজনের হয়। এ সময় খাসী বিক্রি করা যেতে পারে। অথবা খাসির মাংস প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করা যেতে পারে।

আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন

এদেশে প্রাপ্ত ২০ মিলিয়ন ছাগলের ৯৩ ভাগ পালন করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারী ধরনের খামারীরা। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস যেমন সুস্বাদু চামড়া তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে উন্নত মানের বলে স্বীকৃত। তাছাড়া ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অধিক এবং তারা দেশিয় জলবায়ুতে বিশেষভাবে উৎপাদন উপযোগী। এসব গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাণিজ্যিক উৎপাদন এদেশে এখনো প্রসার লাভ করেনি। এর অন্যতম কারণ ইন্টেনসিভ বা সেমি ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের ব্যবহার যোগ্য প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।

ঘর নির্মাণ

ছাগল সাধারণত পরিস্কার, শুষ্ক, দুর্গন্ধমুক্ত, উষ্ণ, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলকারী পরিবেশ পছন্দ করে। গোবরযুক্ত, স্যাঁতসেঁতে, বদ্ধ, অন্ধকার ও পুতিগন্ধময় পরিবেশে ছাগলের রোগ বালাই যেমন: নিউমোনিয়া, একথাইমা, চর্মরোগ, ডায়রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় সংক্রামক ও পরজীবি রোগ হতে পারে। সেই সাথে ওজন বৃদ্ধির হার, দুধের পরিমাণ ও প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

ঘর নির্মাণের সময় পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বী ও দক্ষিণ দিকে খোলামেলা স্থানে ঘর নির্মাণ করা উচিৎ। খামারের তিন দিকে ঘেরা পরিবেশ বিশেষ করে উত্তর দিকে গাছপালা লাগাতে হবে। ছাগল খামারের স্থান নির্বাচনে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং উত্তম পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক ছাগলের জন্য গড়ে ৮-১০ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য গড়ে ৫ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। ছাগলের ঘর ছন, গোলপাতা, খড়, টিন বা ইটের তৈরী হতে পারে। তবে যে ধরনের ঘরই হউক না কেন ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরী করে তার উপর ছাগল রাখতে হবে। মাচার উচ্চতা ১.৫ মিটার (৫ ফুট) এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা ১.৮-২.৪ লিটার (৬-৮ ফুট) হবে। গোবর বা প্রস্রাব পড়ার সুবিধার্থে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ সেঃমিঃ (২.৫৪ ইঞ্চি) ফাঁকা রাখতে হবে। মাচার নিচ থেকে সহজে গোবর ও প্রস্রাব সরানোর জন্য ঘরের মেঝে মাঝ ঘরের দেয়াল, মাচার নিচের অংশ ফাঁকা এবং মাচার উপরের অংশ এম,এম ফ্ল্যাক্সিবল নেট হতে পারে। বৃষ্টি যেন সরাসরি না ঢুকে সে জন্য ছাগলের ঘরের চালা ১-১.৫ মিঃ (৩.১৮-৩.৭৭ ফুট) ঝুলিয়ে দেয়া প্রয়োজন। শীতকালে রাতের বেলায় মাচার উপর চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। শীতের সময় মাচার উপর ১০-১২ সেমি. (৪-৫ ইঞ্চি) পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরণের ছাগলকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রাখা উচিত। পাঁঠাকে সব সময় ছাগী থেকে পৃথক করে রাখা উচিত। দুগ্ধবতী, গর্ভবতী ও শুষ্ক ছাগীকে একসাথে রাখা যেতে পারে। তবে তাদের পৃথক খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। শীতকালে বাচ্চাকে রাতের বেলা মায়ের সাথে ক্রুডিং পেনে রাখতে হবে। ক্রুডিং পেন একটি খাঁচা বিশেষ যা কাঠের বা বাঁশের তৈরি হতে পারে। এর চার পার্শ্বে চটের বস্তা দিয়ে ঢাকা থাকে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাই খামারের অন্যতম প্রধান বিষয়। নিবিড় ও আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগতমান নির্ভর করে চারণভূমিতে প্রাপ্ত ঘাসের পরিমাণ ও তার গুনগতমানের উপর।

ক. ছাগলের বাচ্চাকে শাল দুধ খাওয়ানো: সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চার ওজন ০.৮-১.৫ কেজি (গড়ে ১.০০ কেজি) ওজন হয়। বাচ্চা জন্মের পরপরই পরিস্কার করে আধা ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের শালদুধ খেতে দিতে হবে। ছাগলের বাচ্চার প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম শাল দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। এই পরিমাণ দুধ দিনে ৮-১০ বারে খাওয়াতে হবে। শাল দুধ বাচ্চার শরীরে এন্টিবডি তৈরি করে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে। দুই বা ততোধিক বাচ্চা হলে প্রত্যেকেই যেন শাল দুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ছানা সাধারণত ২-৩ মাসের মধ্যেই দুধ ছাড়ে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দুধ উৎপাদন কম হওয়ায় ২-৩ ছানা বিশিষ্ট ছাগীর দুধ কখনো বাচ্চার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারে না। এক্ষেত্রে ছানাকে পরিমাণমত ৩৭-৩৮° সে. তাপমাত্রায় অন্য ছাগলের দুধ বা মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ানো উচিত। ছাগলের বাচ্চার দানাদার খাদ্য মিশ্রণ কম আঁশ, উচ্চ প্রোটিন, উচ্চ বিপাকীয় শক্তি সম্পন্ন হতে হয়।

খ. ছাগলের বাচ্চাকে দানাদার খাদ্য খাওয়ানো: ছাগল ছানা প্রথমে মায়ের সাথেই দানাদার খাবার খেতে অভ্যস্থ হয়। ছাগলের বাচ্চাকে জন্মের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঘাসের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে। সাধারণত শুরুতে মায়ের সাথেই বাচ্চা ঘাস খেতে শিখে। অভ্যস্থ করলে সাধারণত দুই সপ্তাহ থেকেই বাচ্চা অল্প অল্প ঘাস খায়। বাচ্চাকে কচি ঘাস যেমনঃ দুর্বা, স্পেনডিডা, রোজী, পিকাটুলাম, মেন্টো সোমা, এন্ড্রোপোগন প্রভৃতি ঘাস খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, ধইনচা ইত্যাদি পাতা খাওয়ানো যেতে পারে।

গ. বাড়ন্ত ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা: ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ৩-১১ মাস সময় কালকে মূল বাড়ন্ত সময় বলা যায়। এ সময়ে ছাগল প্রজনন বা মাংস উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হবে তাদের খাদ্য পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। দুধ ছাড়ানোর পর থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত সময়ে ছাগলের পুষ্টি সরবরাহ অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে থাকে। এ সময়ে একদিকে ছাগল দুধ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিন ও বিপাকীয় শক্তি থেকে যেমন বঞ্চিত হয় তেমনি মাইক্রোবিয়াল ফার্মেন্টেশন থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি সরবরাহও কম থাকে। এজন্য এ সময়ে পর্যাপ্ত প্রেটিন সমৃদ্ধ দানাদান ও আঁশ জাতীয় খাদ্য দিতে হবে। ঘাসের পরিমাণ ও গুণগত মান বেশি হলে দানাদার খাদ্যের পরিমাণ কমবে এবং গুণগত মান কম হলে উপরোক্ত পরিমাণ দানাদার খাদ্যেই চলবে।

প্রজননক্ষম পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা: পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাড়ন্ত ছাগলের মতই। তবে প্রজননে সহায়তার জন্য প্রতিটি পাঁঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম ভিজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন। একটি পাঁঠা ১০ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত প্রজননক্ষম থাকে। কোন ভাবেই পাঁঠাকে বেশি চর্বি জমতে দেয়া উচিত নয়। ২৮-৩০ কেজি ওজনের পাঁঠার জন্য দৈনিক ৪০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দেয়া প্রয়োজন।

দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা: দুগ্ধবতী ছাগল তার ওজনের ৫-৬ শতাংশ হারে শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। একটি তিন বছর বয়স্ক ২য় বার বাচ্চা দেয়া ছাগীর গড় ওজন ৩০ কেজি হারে দৈনিক ১.৫-১.৮ কেজি শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ১-১.৫ কেজি পরিমাণ শুষ্ক পদার্থ ঘাস থেকে (৩-৫ কেজি কাঁচা ঘাস) বাকি ০.৫-০.৮ কেজি শুষ্ক পদার্থ দানাদার খাদ্য থেকে দেয়া উচিত। যেহেতু ছাগী বাচ্চা দেয়ার ১.৫-২.০ মাসের মধ্যে গর্ভবতী হয় সেজন্য প্রায় একই পরিমাণের খাবার গর্ভাবস্থায়ও ছাগলকে দিতে হবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খামারে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য নিয়মিত পিপিআর টিকা, কৃমিনাশক ইত্যাদির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। ছাগলের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ পি.পি.আর এবং গোটপক্সের ভেক্সিন জন্মের ৩ মাস পরে দিতে হয়। বছরে দুবার বর্ষার প্রারম্ভে (এপ্রিল-মে) কৃমি নাশক এবং বর্ষার শেষে (অক্টোবর-নভেম্বর) ব্রডস্পেকট্রাম কৃমিনাশক যেমনঃ নেমাফেক্স, রালনেক্স ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া যকৃত কৃমির জন্য ফেমিনেক্স, ডোভাইন ইত্যাদি ব্যবহার করা প্রয়োজন। কোন ছাগলের চর্মরোগ দেখা দিলে তা ফার্ম থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। যে কোন নূতন ছাগল খামারে প্রবেশ করানোর আগে কমপক্ষে এক সপ্তাহ অন্যস্থানে রেখে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। খামারে সকল ছাগলকে ১৫-৩০ দিন পর পর ০.৫% মেলাথায়ন দ্রবণে ডিপিং করানো (চুবানো) উচিত। তাছাড়া ম্যাসটাইটিস সহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া বাঞ্ছনীয়।

বাচ্চার ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা বয়সে ডায়রিয়া বাচ্চা মৃত্যুর অন্যতম কারণ। এজন্য বাচ্চাকে সব সময় পরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং পরিমাণ মত দুধ খাওয়াতে হবে। ফিডার ও অন্যান্য খাদ্য পাত্র সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

- ✓ জন্মের পর পর বাচ্চাকে পরিস্কার করে নাভি থেকে ৩-৪ সেমি. নিচে কেটে দিতে হবে।
- ✓ যে বাচ্চার মায়ের দুধের পরিমাণ কম তাদেরকে বোতলে অন্য ছাগলের দুধ/বিকল্প দুধ (মিল্ক রিপ্লেসার) খাওয়াতে হবে।
- ✓ শীতের সময় বাচ্চাকে মায়ের সাথে ব্রুডিং পেনে রেখে ২৫-২৮ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে।
- ✓ বাচ্চা যেন অতিরিক্ত দুধ না খায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ✓ যে সব পাঁঠা বাচ্চা প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হবে না, তাদেরকে ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে খাসি করাতে হবে।

দেশি (ব্ল্যাক বেঙ্গল) ছাগল খামার স্থাপনে উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন ছাগল নির্বাচন কৌশল

লাভজনক ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের খামার স্থাপনে উৎপাদন বৈশিষ্ট্য উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন ছাগী ও পাঁঠা সংগ্রহ একটি মূল দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বয়সী ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচন সফলভাবে পালনের জন্য প্রযুক্তিগত তথ্যাদি সরবরাহ অত্যাবশ্যক।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য/সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক ছাগল প্রজনন খামার না থাকায় মাঠ পর্যায় হতে ছাগল সংগ্রহ করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, বাচ্চা ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতার ভিন্নতা বিদ্যমান। উক্ত ভিন্নতা বংশ অথবা/ এবং পরিবেশগত কারণ বা স্বতন্ত্র উৎপাদন দক্ষতার জন্য হতে পারে। সে প্রেক্ষাপটে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামার প্রতিষ্ঠার জন্য বংশ বিবরণের ভিত্তিতে বাছাই ও নিজস্ব উৎপাদন/পূনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলীর ভিত্তিতে বাছাই বিবেচনায় রেখে ছাগল নির্বাচন করা যেতে পারে।

ছাগল চরানো

ঘাস সরবরাহের জন্য নেপিয়ার, স্পেনডিডা, পিকাটুলুম, রোজী, পারা, জার্মান ইত্যাদির চাষ করা যেতে পারে। মাঠের চারপার্শ্বে ইপিল ইপিল গাছ লাগানো যেতে পারে। তাছাড়া বর্ষাকালে চারণভূমিতে ঘাসের সাথে মাসকলাই ছিটিয়ে দিলেও ঘাসের খাদ্যমান অনেক বেড়ে যায়। শীতকালে পর্যাপ্ত ঘাস পাওয়া যায় না। এজন্য এ সময়ে ছাগলকে ইউএমএস (ইউরিয়া ৩%, মোলাসেস ১৫%, খড় ৮২%) এর সাথে এ্যালজির পানি খাওয়ানো যেতে পারে।

প্রজনন ব্যবস্থাপনা

একটি পাঁঠা সাধারণত ৩/৪ মাস বয়সে যৌবনপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আট/নয় মাস বয়সের পূর্বে পাল দেবার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কোন পাঁঠার শারীরিক দুর্বলতা, পঙ্গুত্ব বা কোন যৌন অসুখ সমস্ত পালকে নষ্ট করে দিতে পারে। তাই সেদিকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। দশটি ছাগীর জন্য একটি পাঁঠাই যথেষ্ট। ছাগী যখন প্রথম বারে (৫-৬ মাস বয়সে) গরম হয় তখন তাকে পাল না দেয়াই ভাল। এক্ষেত্রে এক/দুইটি হিট বাদ দিয়ে মোটামুটি ১১-১২ কেজি ওজনের সময় পাল দেয়া উচিত। ছাগীর হিটে আসার লক্ষণ গুলো হচ্ছে- মিউকাস নিঃসরণ, ডাকাডাকি করবে, অন্য ছাগীর উপর উঠা ইত্যাদি। ছাগী হিটে আসার ১২-৩৬ ঘণ্টার মধ্যে পাল দেয়া উচিত। অর্থাৎ সকালে হিটে আসলে বিকেলে এবং বিকেলে হিটে আসলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে।

বংশ বিবরণের ভিত্তিতে বাছাই

মাঠ পর্যায়ে বংশ বিবরণ পাওয়া দুরূহ। কারণ খামারীরা বংশ বিবরণ লিখিত আকারে সংরক্ষণ করেন না। তবে তাদের সাথে আলোচনা করে একটি ছাগী বা পাঁঠার বংশের উৎপাদন ও পূনরুৎপাদন দক্ষতা সম্বন্ধে ধারণা নেয়া যেতে পারে। ছাগীর মা, দাদী, নানীর প্রতিবারে

বাচ্চার সংখ্যা, দৈনিক দুধ উৎপাদন, বয়োপ্রাপ্তির বয়স, বাচ্চার জন্মের ওজন ইত্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব। একটি উন্নত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীর বংশীয় গুণাগুণ নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজন।

নিজস্ব উৎপাদন/পূনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলীর ভিত্তিতে বাছাই

এক্ষেত্রে দু'টি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। ছাগী উৎপাদন এবং পূনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলী এবং এর দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও পূনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলী তার মা, দাদী, নানীর গুণাগুণের ওপর নির্ভর করবে। ছাগী নির্বাচনে উৎপাদন ও পূনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলী নিম্নরূপ হবে।

ছাগী নির্বাচন

লাভজনক ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামার প্রতিষ্ঠার জন্য সারণী-১ এ উল্লিখিত জাতের ছাগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈহিক যে সমস্ত গুণাবলী বিবেচনা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ। বিভিন্ন বয়সে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য হয়। সে কারণে একটা ছাগী ৬-১২ মাস, ১২-২৪ মাস এবং ২৪ মাসের উর্দ্ধে বয়সের দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলী ভিন্নভাবে তুলে ধরা হল। উন্নত গুণাগুণ সম্বলিত একটি ছাগীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যাবলী থাকা প্রয়োজ:

- মাথা ঃ চওড়া ও ছোট হবে
- দৈহিক গঠন ঃ শরীর কৌনিক ও পেশীযুক্ত হবে।
- বুক ও পেট ঃ বুকের ও পেটের বেড় গভীর হবে।
- পাজরের হাড় ঃ পাজরের হাড় চওড়া এবং দু'টি হাড়ের মাঝখানে কমপক্ষে এক আঙুল ফাঁকা জায়গা থাকবে।
- ওলান ঃ ওলানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে। বাঁটগুলো হবে আঙুলের মত একই আকারেরএবং সমান্তরালভাবে সাজানো, দুধের শিরা উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যাবে।
- বাহ্যিক অবয়ব ঃ আকর্ষণীয় চেহারা, ছাগী সুলভ আকৃতি, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিখুঁত অঙ্গ-প্রতঙ্গ।

নোট: ছাগল ও ভেড়া পালন প্রায় একই রকম। বিশেষ করে বাসস্থান, খাদ্যব্যবস্থানা ও রোগব্যবস্থাপনা একই।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০২	অধিবেশন নং- ০৩	সময়: ১১:০০-১২:০০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম : **বিকল্প কর্মসংস্থানের সংশ্লিষ্ট ট্রেডভিত্তিক আলোচনা (উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন)**

অভীষ্ট দল: বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নির্বাচিত সুফলভোগী জেলে।

লক্ষ্য: অংশগ্রহণকারীদের অন্যান্য উপযোগী আয়বর্ধক কার্যক্রম বিষয়ে ধারণা দেয়া হবে যাতে তারা নিজেরা উপযোগী কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে পারেন।

উদ্দেশ্য: *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-*

- আয়বর্ধক কার্যক্রম হিসেবে গ্রামীণ পরিবেশে উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস পালন, উন্নত পদ্ধতিতে মুরগি পালন
- গ্রামীণ পরিবেশে উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস পালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- উন্নত পদ্ধতিতে মুরগি পালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	গময়
ভূমিকা			০৫ মিনিট
	১. স্বাগত জানানো, কুশল বিনিময় ২. পূর্ববর্তী অধিবেশনের সূত্র ধরে বর্তমান অধিবেশনের অবতারণা (প্রধান শিক্ষণ বিষয়: অন্যান্য উপযোগী আয়বর্ধক কার্যক্রম) ৩. বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত (শিরোনাম) ৪. বর্তমান অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ (উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব)	প্রশ্নোত্তর পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৪৫ মিনিট
	আয়বর্ধক কার্যক্রম হিসেবে হাঁস প্রতিপালনের গুরুত্ব হাঁসের জাত ও হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্তি স্থান/হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা/বাচ্চার ব্রুডিং কালীন ব্যবস্থাপনা/হাঁস পালন পদ্ধতি/হাঁসের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা /হাঁস প্রতিপালনের গুরুত্ব/আয়বর্ধক কার্যক্রম হিসেবে মুরগি প্রতিপালনের গুরুত্ব/মুরগির জাত /দেশী মুরগি উৎপাদনের উন্নত কৌশল প্রযুক্তি ব্যবহারের পদ্ধতি, ফলাফল ও লাভ/ মুরগি প্রতিপালনের উন্নত পদ্ধতি/খামারের স্থান নির্বাচন/ খাদ্য ব্যবস্থাপনা/ভ্যাকসিনের কর্মসূচি/ডিম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ/বাজারজাতকরণ	প্রশ্নোত্তর প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট	
সার-সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	১. মূল বিষয়ের পুনরালোচনা (প্রধান শিক্ষণ বিষয়গুলি) ২. উদ্দেশ্য যাচাই (অধিবেশনের উদ্দেশ্য); ৩. হ্যান্ড আউট বিতরণ ও পড়ানো; ৪. ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং পরবর্তি অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা দেয়া।	প্রশ্নোত্তর/ পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : পাওয়ার পয়েন্ট/ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

গ্রামীণ পরিবেশে উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস পালন

বাংলাদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-ডোবা ছাড়াও আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য উপযোগী। প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও অল্প খরচে অধিক মুনাফা অর্জনে হাঁস পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। হাঁস প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে থাকে বিধায় হাঁসকে সামান্য পরিমাণ খাদ্য প্রদান করে সারা বছরই লাভজনকভাবে হাঁস পালন করা যায়। মুরগির চেয়ে হাঁস পালনে উৎপাদন খরচ অনেক কম।

হাঁসের জাত

সারণি-১: বাংলাদেশের হাঁস উৎপাদনকারী এলাকাগুলোতে হাঁসের জাত, তাদের শতকরা সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য

জাত	শতকরা হার	বৈশিষ্ট্য
দেশি	৪৫	ডিম ও মাংস উৎপাদন করে থাকে, বছরে ৭০-৮০টি ডিম দেয় এবং আবদ্ধ অবস্থায় উন্নত ব্যবস্থাপনায় এগুলো (দেশি সাদা ও দেশি কালো) বছরে প্রায় ২০০-২০৫টি ডিম দেয়।
খাকি ক্যাম্পবেল	৩০	ডিম উৎপাদনের জন্য হাঁস। শারীরিক ওজন বয়ঃপ্রাপ্ত হাঁসা ২-২.৫ কেজি এবং হাঁসী ১-১.৫কেজি। বৎসরে একটি হাঁসি ২৫০-৩০০টি ডিম দেয়। দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমান ১৭৬ গ্রাম। প্রতিটি ডিমের ওজন গড়ে প্রায় ৬৯ গ্রাম। ডিমের নিষিক্ততার হার ৮০ শতাংশ।
জিংডিং	২০	ডিম উৎপাদনের জন্য হাঁস। শারীরিক গড় ওজন বয়ঃপ্রাপ্ত হাঁসা ২.০০ কেজি এবং হাঁসি ১.৫ কেজি। দৈনিক একটি বয়স্ক হাঁসের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ১৬০ গ্রাম। বৎসরে ডিম পাড়ে প্রায় ২৭০টি। গড়ে প্রতিটি ডিমের ওজন ৬৮ গ্রাম। ডিমের নিষিক্ততার হার ৮০ শতাংশ।
ইন্ডিয়ান রানার	৫	ডিম উৎপাদনের জন্য হাঁস। এ জাতের তিনটি উপজাত আছে। তারমধ্যে সাদা জাতটি বেশি প্রচলিত। দৈহিক ওজন বয়ঃপ্রাপ্ত হাঁসা ২-২.৫ কেজি এবং হাঁসী ১-২ কেজি। গড়ে বৎসরে একটি হাঁসি ২৫০-৩০০টি ডিম পাড়ে। প্রতিটি ডিমের ওজন গড়ে প্রায় ৬৬ গ্রাম। ডিমের নিষিক্ততার পরিমান ৭৪ শতাংশ।

হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্তি স্থান

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করা যেতে পারে। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার নারায়নগঞ্জ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কিছু আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার যেমন: দৌলতপুর, নওগাঁ ও সোনাগাজী থেকেও হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করা যেতে পারে। এছাড়াও এনজিও ও ব্যক্তি পর্যায়ে উৎপাদিত খামারীদের নিকট থেকেও হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করতে পারেন।

বাচ্চার ব্রুডিং কালীন ব্যবস্থাপনা

ব্রুডিংকালে বাচ্চার মৃত্যুহার খুব বেশি, এ সময় বাচ্চার যত্ন নিশ্চিত করতে হবে।

সারণি-২: হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিংকালে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম তাপ, আলো ও বায়ু চলাচল।

বয়স (সপ্তাহ)	তাপমাত্রা (ফা)	আলো প্রদান (ঘন্টা/দিন)	বায়ু চলাচল
২	৯০	১৮	ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ক্ষতিকর গ্যাস বেরিয়ে যাবে।
৩	৮৫	১৪	

৪	৮০	১২	আর্দ্রতা ঠিক থাকবে ও বাচ্চা সুস্থ্য থাকবে।
৫	৭৫	১২	
৬	৭০	১২	

বাচ্চা ব্রুডিং ঘরে নেয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পূর্বে থেকেই ব্রুডার জালিয়ে ঘর গরম করে রাখতে হয়। যেন বাচ্চা রাখার সময় লিটারের তাপমাত্রা ২৮-৩১ সে. এর মধ্যে থাকে। দেখা গেছে প্রথম কয়েকদিনের ঠাণ্ডা এবং কম তাপমাত্রার কারণে বাচ্চাগুলো নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয় এবং নাভী শুকাতে দেরি হয়। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করলে আশা করা যায় বাচ্চার মৃত্যুর হার ২০ শতাংশ থেকে কমে ৩-৪ শতাংশ হবে।

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গ্রামাঞ্চলে হাঁস অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন করা হয়। পুকুর খাল-বিল, নদী ইত্যাদিতে হাঁস চরে বেড়ায় এবং এখান থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে। অনেক খামারীগণ হাঁসকে শুধু ধানের কুঁড়া, চাল, গম এসব খেতে দেয়। সাধারণত বর্ষা মৌসুমে সম্পুরক খাদ্য হিসেবে বাচ্চা প্রতি ৫০ গ্রাম এবং বয়স্ক গুলোকে ৬০ গ্রাম হারে সুষম খাদ্য দিতে হবে।তবে শুষ্ক মৌসুমে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা কমে যাবার কারণে ঐ সময় খাবার পরিমাণ (৭০-৮০ গ্রাম) বাড়িয়ে দিতে হয়। খাদ্য ব্যবস্থাপনায় এ ধরণের পরিবর্তন আনলে হাঁসের ডিম উৎপাদন বেড়ে যায়।

সারণি-৩: বিভিন্ন বয়সের হাঁসের খাদ্য তৈরির উপকরণ

খাদ্য উপাদান (%)	হাঁসের বাচ্চা ০-৬ সপ্তাহ	বাড়ন্ত হাঁস ৭-১৯ সপ্তাহ	ডিম পাড়া হাঁস ২০ সপ্তাহ তদুর্দ্ধ
গম ভাঙ্গা	৩৬.০০	৩৮.০০	৩৬.০০
ভুট্টা ভাঙ্গা	১৮.০০	১৮.০০	১৬.০০
চালের কুঁড়া	১৮.০০	১৭.০০	১৭.০০
সয়াবিন মিল	২২.০০	২৩.০০	২৩.০০
প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.০০	২.০০	২.০০
ঝিনুক চূর্ণ	২.০০	২.০০	৩.৫০
ডিসিপি	১.২৫	১.২৫	০.৭৫
ভিটামিন খনিজ মিশ্রিত	০.২৫	০.২৫	০.২৫
লাইসিন	০.১০	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১০	০.১০	০.১০
লবণ	০.৩০	০.৩০	০.৩০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

হাঁস পালন পদ্ধতি

আবদ্ধ পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে পুরোপুরি হাঁসগুলোকে ঘরের মধ্যে রেখে লালন পালন করা হয়। হাঁসের বাচ্চা (৪-৬) সপ্তাহ পর্যন্ত লালন পালন করা সুবিধাজনক। এ পদ্ধতি তিন প্রকার; যথা-(ক) মেঝেতে লালন পালন, (খ) খাঁচায় লালন পালন; এবং (গ) তারের জালের ফ্লোর।

(ক) ফ্লোরে লালন পালনঃ এ পদ্ধতিতে মেঝেতে লিটার দ্রব্য দিয়ে হাঁস রাখা হয়। সমস্ত মেঝের ৪ ভাগের এক ভাগ খাবার দেবার জন্য অর্থাৎ খাবারের এবং পানির পাত্র রাখা হয়। পানি বের করে দেয়ার জন্য ছোট আকারের নিষ্কাষণ থাকে।

(খ) খাঁচায় লালন পালনঃ এ পদ্ধতিতে খাঁচাগুলো একটির পর একটি স্তরে স্তরে থাকে। ২-৩ সপ্তাহের বাচ্চার জন্য উপযুক্ত। প্রতিটি খাঁচায় ২০-২৫টি বাচ্চা রাখা যায়। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ১ x ১.৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন।

(গ) তারের জালের ফ্লোরঃ এ পদ্ধতিতে ঘরের ফ্লোর হতে উঁচু করে তারের জাল দেয়া হয় এবং খাঁচাগুলো ১/২ বর্গইঞ্চি ছিদ্রের হলে ভাল। মাচার চারপাশে ১-২ ফুট বেড়া দিতে হবে যেন বাচ্চা পড়ে না যায়। ফ্লোরের তুলনায় ১/৩-১/২ পরিমাণ কম জায়গা লাগে।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে হাঁসগুলো রাতে ঘরে আবদ্ধ থাকে এবং দিনের বেলায় ঘরের সামনে চারণ (১০-১২বর্গফুট) এ ঘুরে বেড়ায়। খাদ্য ঘরের ভিতরে অথবা চারণে দেয়া যেতে পারে। তবে সুবিধাজনক হারে চারণে দেয়া। ঘরের সাথে একটি পানির চৌবাচ্চা দেয়া যেতে পারে যার প্রস্থ ২০ ইঞ্চি এবং গভীরতা ৬-৮ ইঞ্চি হয়। যাতে হাঁসগুলো সহজে পানি খেতে এবং ভাসতে পারে।

মুক্ত রেঞ্জ পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে হাঁসকে কেবলমাত্র রাতের বেলায় ঘরে আটকিয়ে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় হাঁস বিভিন্ন জায়গার যেমন-নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর-ডোবায় বেরিয়ে খায়। পূর্ণ বয়স্ক হাঁসের জন্য ৩ বর্গফুট জায়গা দরকার এবং বাড়ন্ত হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গা দরকার।

হার্ডিং পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে হাঁসগুলোকে (বাড়ন্তও পূর্ণ বয়স্ক) কোন প্রকার ঘরে রাখা হয়না। যে সমস্ত জায়গায় খাবার আছে সেই সকল এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সারাদিন খাদ্যগ্রহণ করে রাতের বেলা হাঁসগুলোকে কোন একটি উঁচু জায়গায় আটকিয়ে রাখা হয় সকাল পর্যন্ত। একটি নির্দিষ্ট জায়গার কিছুদিন খাওয়ানোর পর অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। একজন লোক একবার ১০০-৫০০টি হাঁস চড়াতে পারে।

ল্যানটিং পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে বড় বড় বিল, হাওর, জলাশয় এবং আশে পাশে ঘর তৈরি করে হাঁস পালন করা হয়। হাঁসগুলো যাতে রাতের বেলায় থাকে। প্রতিটি ফ্লকে ১০০-২০০টি হাঁস থাকে।

বাসস্থান ও ঘরের ব্যবস্থাপনাঃ

স্থান নির্বাচনঃ খোলামেলা উঁচু ও রৌদ্র থাকে এমন জায়গা নির্বাচন করা উচিত। ড্রেন কাটার সুবিধা আছে এবং ঘাস জন্মাতে পারে এমন স্থান নির্ধারণ করা উচিত। ঘরের আশে পাশে গাছ বা জঙ্গল থাকা এবং হাঁসের ঘরের স্থান মুরগির খামারের পাশে ঠিক করা উচিত নয়। হাঁসের সংখ্যা এবং কি ধরনের ঘরে হাঁস পালন করা হবে তা বিবেচনা করে ঘর তৈরি করতে হবে।

তাপমাত্রাঃ হাঁসের জন্য খুব বেশি বা কম তাপ ক্ষতিকর। ঘরের তাপমাত্রা ৫৫ থেকে ৭৫ ডিগ্রী ফাঃ পর্যন্ত রাখাই সর্বোত্তম।

আদ্রতাঃ হাঁসের ঘরের আর্দ্রতা ৭০% থাকাই বাঞ্ছনীয়। অনুকূল পরিবেশ এবং আবহাওয়ায় লোম গজানো, শারীরিক বৃদ্ধি এবং ডিম উৎপাদন ভাল হয়। ঘরের আর্দ্রতা ৭০% এর বেশি হলে ককসিডিয়া ও কৃমি হয়।

আলোঃ প্রথম ৬ সপ্তাহ রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখা হলে খাদ্য বেশি খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে। ডিম পাড়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘন্টা আলো থাকা দরকার। এ অতিরিক্ত আলো কৃত্রিম বাল্বের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে।

বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেন্টিলেশন)ঃ হাঁসের ঘর শুষ্ক রাখার জন্য বাতাস চলাচল ব্যবস্থা খুবই জরুরি। ঘরের দেয়ালের শতকরা ৪০ ভাগ লম্বালম্বি তারের জালের বা বাঁশের সাহায্যে ছিদ্রওয়ালা বেড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

মেঝে ও মেঝের পরিমাপঃ মেঝে অবশ্যই স্যাঁতসেঁতে মুক্ত হবে এবং কোন প্রকার গর্ত থাকবে না। ১-২ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১/২ বর্গফুট, ৩-৪ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১ বর্গফুট এবং ৫-৭ সপ্তাহ ও এর উপরের বয়সের হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গার দরকার।

খাবার ও পানির পাত্রঃ ঘরে পানির জন্য ওয়াটার চেনেল তৈরি করতে হবে যার প্রস্থ ২০ ইঞ্চি এবং গভীরতা ৮-৯ ইঞ্চি।

হাঁসের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

হাঁসের দু'টো মারাত্মক রোগ হলো ডাক পেগ ও ডাক কলেরা রোগ। টীকাদান কর্মসূচি নিয়মিত অনুসরণ করলে সম্পূর্ণরূপে এ ঝুঁকি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এছাড়া আজকাল খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত রোগ যেমন আফলাটক্সিন ও বটুলিজম এর কারণে হাঁসের মৃত্যু ঘটতে দেখা যায়। কাজেই খাদ্য তৈরির সময় বিশেষ করে ভূট্টাবীজ খুব ভালোভাবে দেখে নিয়ে অন্যান্য খাদ্য উপাদানসহ খাদ্য তৈরি করলে এ সমস্যা এড়ানো সম্ভব।

সারণি-৪: হাঁসের রোগ প্রতিরোধক টীকাদান কর্মসূচি

রোগের নাম	টীকার নাম	প্রাপ্তিস্থান	প্রয়োগের বয়স	প্রয়োগ পদ্ধতি
ডাক পেগ	ডাকপেগ টীকা	দেশের সকল প্রাণী চিকিৎসালয়	প্রথম মাত্রা ২১-২৮ দিন বয়সে। দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ (প্রথম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ ৩৬-৪৩ দিন বয়সে পরবর্তী ৪-৫ মাস পর একবার	বুকের মাংসে / প্রয়োগ বিধিমতে
ডাক কলেরা	ডাক কলেরা টীকা	দেশের সকল প্রাণী চিকিৎসালয়	প্রথম মাত্রা ৪৫-৬০ দিন বয়সে ২য় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) ১ম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ পরবর্তী ৬০-৭৫ দিন বয়সে পরবর্তী প্রতি ৪-৫ মাস পরপর একবার।	ডানার তলদেশে পালক ও শিরাহীন স্থানে চামড়ার নীচে/ প্রয়োগ বিধিমতে।

খ) উন্নত পদ্ধতিতে মুরগি পালন

আমাদের দেশে পল্লী এলাকায় সকল পরিবারেই কিছু না কিছু হাঁস মুরগি পালন করে থাকে। হাঁস-মুরগির ডিম ও মাংস সুস্বাদু আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য। বাড়ির মহিলারা ও উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরাই প্রধাণত হাঁস মুরগি পালন করে থাকে। পারিবারিক খাদ্যের চাহিদা পূরণের সাথে সাথে এসব পাখি পালনে কিছু বাড়তি আয়েরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে শহর উপ-শহর এমনকি পল্লী এলাকাতেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগি পালনের খামার গড়ে উঠেছে। গৃহপালিত পাখির মধ্যে মুরগি, হাঁস, কোয়েল, কবুতর উল্লেখযোগ্য। এসব পাখির আবার দেশি ও উন্নত জাতও আছে।

দেশি জাতের মুরগি

সচরাচর গ্রামে-গঞ্জে গৃহস্থের বাড়িতে ছাড়া অবস্থায় যে সমস্ত মুরগি চরে বেড়ায় তারা দেশি জাতের মুরগি। এরা বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাদ্য কুড়িয়ে খায়। ছাড়া অবস্থায় পালন করতে হয় বলে এদের পালন খরচ নেই। এদের ডিম উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। এরা ওজনে বেশি হাল্কা। তবে এদের দেহ সুগঠিত এবং মাংসপেশী মজবুত হয়। এসব কারণে দেশি মুরগির মাংস সুস্বাদু। ডিমের কুসুমের রং হলুদ। দেশি মুরগির মাংস ও ডিম অনেকেই পছন্দ করে এবং বাজারে বেশ চাহিদা আছে। এদের শরীরে পালকের রঙের কোন স্থায়িত্ব নেই। এরা ডিমে তা দিয়ে এবং বাচ্চা পালন করতে খুব পারদর্শী। এরা আকারে ছোট হয় এবং খুব চঞ্চল ও চালাক। সহজে বন্য প্রাণী এদেরকে ধরতে পারে না।

উন্নত জাতের মুরগি

কয়েক প্রকার উন্নত ও হাইব্রিড জাতের মুরগি আছে। যেমন-

রোড আইল্যান্ড রেড (আরআইআর)ঃ এ জাতের মোরগ ২-৩ কেজি এবং মুরগি ১.৫-২ কেজি পর্যন্ত ওজনের হয়। দেহের পালক লাল কিন্তু লেজের দিকের পালক, গলা এবং ডানার পালক কিছুটা কালো। এদের ডিম উৎপাদনের হার মোটামুটি ভাল। ডিমের রং বাদামী। বর্তমানে উন্নত দেশে বাদামী রঙের ডিম উৎপাদনে বাণিজ্যিক হাইব্রিড জাত সৃষ্টির জন্য এ মুরগি ব্যবহার করা হয়। এরা আমাদের দেশে বছরে ১৫০-২০০ টি ডিম দিয়ে থাকে।

হোয়াইট লেগহর্ণ

ডিম উৎপাদনকারী জাত হিসেবে পৃথিবীর সব দেশেই খুব জনপ্রিয়। ধবধবে সাদা পালক দিয়ে সারা শরীর ঢাকা। কানের লতি ও ঝুটি উভয়ই লাল। ডিমের আকার বেশ বড়। বছরে প্রায় ৩০০টি ডিম দেয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন পোল্ট্রি খামারে ব্যাপক পালন করা হচ্ছে। কৃষক পর্যায়েও পালন করা সম্ভব।

ফাইওমি

এরা আকারে প্রায় দেশি মুরগির মত। মোরগ ওজনে ১.৫-২ কেজি এবং মুরগি ১-১.১৫ কেজি পর্যন্ত হয়। এটি মিশরের জাত। এদেশে পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হয়েছিল। এদের গলার দিকে ধূসর কিন্তু সমস্ত শরীরে সাদা কালো রংয়ের মিশ্রণ। এরা খুব চঞ্চল

ও চালাক। দেশি মুরগির মত এদের ছাড়া অবস্থায় পালন করা যায়। এদের কানের লতি সাদা। মাথার ঝুঁটি আকরে ছোট, বেজোড় এবং লাল।

দেশি মুরগি উৎপাদনে উন্নত কৌশল

বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় প্রায় প্রতিটি পরিবার দেশি মুরগি পালন করে থাকে। এদের উৎপাদন ক্ষমতা বিদেশি মুরগির চেয়ে কম। কিন্তু উৎপাদন ব্যয়ও অতি নগন্য এবং অতিরিক্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। অধিকন্তু এদের মাংস ও ডিমের মূল্য বিদেশী মুরগির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং চাহিদা খুবই বেশি। দেশি মুরগির মৃত্যু হার বাচ্চা বয়সে অধিক এবং অপুষ্টিজনিত কারণে উৎপাদন আশানুরূপ নয়। বাচ্চা বয়সে দেশি মোরগ মুরগির মৃত্যুহার কমিয়ে এনে এবং সামান্য সম্পূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করলে দেশি মুরগি থেকে অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদন করা সম্ভব। উপরোক্ত অবস্থার আলোকে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষেণা ইনস্টিটিউট দেশি মুরগি উৎপাদনে উন্নত কৌশল শীর্ষক প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছে। যা ব্যবহার করে খামারীরা দেশি মুরগি থেকে অধিক ডিম/মাংস উৎপাদন করে পারিবারিক পুষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

উদ্দেশ্য

- ✓ সম্পুরক খাদ্য, রাণীক্ষেত ও বসন্তের প্রতিষেধক প্রদান করে এবং বন্য জন্তুর কবল থেকে মুক্ত রেখে দেশি মুরগি বিশেষ করে ছোট বাচ্চার মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা;
- ✓ বাচ্চার মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা;
- ✓ দেশি মুরগির দৈহিক ওজন ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

প্রযুক্তি ব্যবহারের পদ্ধতি

- প্রযুক্তিটি গ্রামীণ পর্যায়ে সকল গৃহস্থ পরিবারই ব্যবহার করতে পারবেন। খামারের আকার অনুযায়ী প্রত্যেক খামারীর জন্য মোরগ-মুরগির সংখ্যা নিম্নের ছক-১ অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

খামারের আকার	আবাদী জমির পরিমাণ	মোরগ/মুরগির সংখ্যা
ছোট	৫০ শতাংশ	১টি মোরগ ও ৩টি মুরগি
মাঝারী ও বড়	৫০ ও তার অধিক	১টি মোরগ ও ৬টি মুরগি

প্রত্যেক খামারীগণ তাদের মুরগির খোয়াড় ছাড়াও মুরগিগুলোকে সম্পূরক খাদ্য খাওয়ানোর জন্য বাঁশ, তার জালি অথবা বাঁশ দিয়ে নির্মিত একটি ক্রিপ ফিডার তৈরি করবেন। এতে দু'টো অংশ থাকবে। এক অংশে বাচ্চা ও অপর অংশে বয়স্ক মোরগ-মুরগির সম্পূরক খাদ্য প্রদান করতে হবে।

- ছোট খামারীদের জন্য (ক্রিপ ফিডার) আকার ৪.২ ফুট X ৫ ফুট এবং বড় খামারীদের জন্য ৫ ফুট X ৩ ফুট হতে পারে। ক্রিপ ফিডারের তার জালি বা বাঁশের দরজার ফাঁকা ১.৫ ইঞ্চি থেকে ১.৭৫ ইঞ্চি হবে। যাতে করে বাড়ন্ত বা বয়স্ক মুরগি ক্রিপ ফিডারের বাচ্চার জন্য খাদ্য প্রদানের অংশে প্রবেশ করে বাচ্চার সম্পূরক খাদ্য খেতে না পারে।

- প্রতিটি বয়স্ক মুরগিকে চড়ে খাওয়ানোর পাশাপাশি দৈনিক ৩৫ গ্রাম সম্পুরক খাদ্য খেতে দিতে হবে।
- ছোট খামারীগণ সারা বছর ১টি মুরগি বাচ্চা ফুটানোর জন্য ব্যবহার করবেন। বাকী ২টি মুরগি সারা বছর ডিম উৎপাদন করবে।

মাঝারী ও বড় খামারীগণ প্রতিবারে তাদের ৬টি মুরগির মধ্যে ২টি মুরগিকে ডিম ফুটানোর জন্য বসাবে, বাকী ৪টি মুরগি সারা বছর ডিম উৎপাদন করবে।

- ছোট বাচ্চাগুলোকে প্রথম ৬ সপ্তাহ প্রয়োজনীয় সম্পুরক খাদ্য ক্রিপ ফিডারের ভিতর দিতে হবে। ৬ সপ্তাহের পর সম্পুরক খাদ্যের পরিমান ক্রমান্বয়ে কমিয়ে দিতে হবে। বাচ্চা ফোটার পর প্রথম ৪/৫ দিন বাচ্চার ক্রিপ ফিডারের ভিতর তাদের মাকেও খেতে দিতে হবে। কেননা ছোট বাচ্চা প্রথম কয়েক দিন মাকে ছাড়া খাদ্য খায় না।

- দশ সপ্তাহ বয়সে প্রতিটি ছোট বাচ্চার জন্য সম্পুরক খাদ্যের পরিমাণ হবে দৈনিক ৩৫ গ্রাম। ছয় থেকে দশ সপ্তাহ বয়সকালীন সময়ে ছোট বাচ্চাগুলো মুরগির সাথে বাড়ির আঙিনায় চড়ে খেতে অভ্যস্থ হবে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল ও লাভ

- মুরগির মৃত্যুর হার কমে যাবে। বিশেষ করে বাচ্চা মুরগির ক্ষেত্রে এর হার শতকরা ৫৫-৬০ ভাগ থেকে ২৫-৩০ ভাগে নেমে আসবে।
- এ পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন করলে মুরগির দৈহিক ওজন শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ এবং ডিম উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ বেড়ে যাবে।

সনাতন পদ্ধতিতে ৬-৭টি দেশি মুরগি পালন করে সাধারণত গড়ে একজন খামারী দেশি মুরগি পালন থেকে প্রতি বছর ২০০০/- টাকা আয় করতে পারে। পক্ষান্তরে উদ্ভাবিত এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন খামারী দেশি মুরগি পালন করে গড়ে ৬,৫০০/- - ৬৬০০/- টাকা আয় করতে পারেন।

পরিবারের বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে এই প্রযুক্তি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থিক ও পুষ্টি সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। দেশের নূন্যতম ৫কোটি পরিবার যদি বছরে ৫টি করে দেশি মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাহলে প্রতি বছর ২৫ কোটি অতিরিক্ত মুরগি আমাদের দেশের পুষ্টি ঘাটতির আংশিক সমাধান দিতে পারে।

খামারের স্থান নির্বাচন

উঁচু ও ভাল নিষ্কাষণ ব্যবস্থা, আশপাশ পঁচা ডোবা ও নর্দমা মুক্ত, অন্য খামার থেকে নিরাপদ দুরত্বে বিশুদ্ধ পানি, বিদ্যুৎ যোগাযোগ ও লিটার সরিয়ে ফেলার ভাল ব্যবস্থা আছে এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

ঘর পরিস্কার ও জীবানুমুক্তকরণঃ

১ম দিন ঝাড়ু ও পানি দিয়ে পরিস্কার, ৩য় ও ৪র্থ দিন সকালে জীবানুনাশক (পভিসেপ, সুপারসেপ্ট, ক্লোরোক্স, আয়োসান , ভিরকন এস) দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে এবং সর্বশেষ পরিস্কার পানি দ্বারা ধুঁয়ে ফেলতে হবে। ঘরে মুরগির বাচ্চা উঠানোর ৩ দিন পূর্বে পুনরায় জীবানুমুক্তকরণ করতে হবে।

বাড়ন্ত বাচ্চা পালন

ব্রুডিং শেষে ১৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সময় কালকে বাড়ন্ত অবস্থা বলা হয়। বাড়ন্ত অবস্থার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত ডিম উৎপাদন। বাড়ন্ত কালীন সময়ে ঝাঁকের সমরূপতা (ঝাঁকের সব মুরগিগুলোর দৈহিক ওজন কাছাকাছি থাকা) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাচ্চার মধ্যে সমরূপতা আনায়নের জন্য অপেক্ষাকৃত দূর্বল বাচ্চার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। সমরূপতা রক্ষার জন্য খাদ্য গ্রহণের স্থান অর্থাৎ খাদ্য পাত্রের সংখ্যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ডিবেকিং

ঠোকরাঠুকরির প্রবণতা দূর করার জন্য এবং খাদ্যের অপচয় রোধ করার জন্য দুইবার ডিবেকিং করা উচিত। প্রথমে ৬-১৪ দিনের মধ্যে এবং দ্বিতীয় বার ১২-১৬ সপ্তাহ বয়সে। উপরে ঠোঁটের সামনের দিকের অংশ যেটির রং কিছুটা সাদাটে এবং সূচালো হয় (ঠোঁটের ১/৩ ভাগ অংশ) সেটি কেটে বাদ দেয়া হয়।

প্রি-লেয়ার পালন

সাধারণত ১৮-২০ অথবা ১৮-২২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত মুরগিকে প্রি লেয়ার বলা হয়। ২০ সপ্তাহ বয়সে ঝাঁকের ওজন লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি থাকলে দিনের আলোর সাথে অতিরিক্ত আলো সরবরাহের মাধ্যমে উদ্দীপনা দেওয়া প্রয়োজন। এ সময়ে ডিম উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ অতিক্রম করলে প্রি-লেয়ার ফিডের পরিবর্তে লেয়ার ফিড সরবরাহ করতে হবে। পুলেট কালীন সময়ের শুরুতে মুরগির ঘরে ডিম পাড়ার বাক্স বসাতে হবে।

ডিম পাড়া মুরগি পালন

ডিম পাড়াকালীন সময়ে আলো প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গড়ে ১৬ ঘণ্টা আলোক প্রদান আদর্শ ডিম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন। খাদ্য ও পানি সরবরাহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সরবরাহ করতে হবে। এ সময় মুরগির ডিম পাড়ার জন্য ডিম পাড়ার বক্স ঘরের মধ্যে স্থাপন করতে হবে।

সারণি-১: বাচ্চার প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা

গপ্তাহ	তাপমাত্রা (ফাঃ)
১ম	৯৫০
২য়	৯০০
৩য়	৮৫০
৪র্থ	৮০০
৫ম	৭৫০
৬ষ্ঠ	৭০০

ডিম পাড়ার বাক্স

প্রতি ৪-৫টি মুরগির জন্য ১টি ডিম পাড়ার বাক্স বরাদ্দ রাখতে হয়। ডিম পাড়ার বাক্সের পরিমাপ ১ x ১ x ১.২০ (দৈঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) ঘনফুট হলেই চলবে। মুরগির ঘরের অন্ধকার যুক্ত স্থানে যেখানে কম আলো এবং যেখানে মুরগি কম চলাফেরা করে সেই স্থানে মুরগির ডিম পাড়ার বাসা দিতে হবে। ডিম পাড়ার বাসার সাথে পরিচিতির জন্য অন্ততঃ ২ সপ্তাহ আগে থেকেই ডিম পাড়ার বাসা স্থাপন করতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গুনগত মান সম্পন্ন খাদ্য ক্রয়, সুষম রেশন তৈরি, খাদ্য উপাদান সমূহ সঠিকভাবে মিশ্রিতকরণ এবং খাদ্য সংরক্ষণ খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান অংশ।

বাচ্চার প্রথম খাদ্য

বাচ্চা খামারে পৌঁছানের পরপরই প্রথম গ্লুকোজ, ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন এবং ভিটামিন 'সি' মিশ্রিত পানি (প্রতি লিটার পানিতে গরমের দিনে ৫০ গ্রাম ও শীতের দিনে ২৫-৩০ গ্রাম গ্লুকোজ, ০.৫ গ্রাম ওয়াটার সলিউবল মাল্টিভিটামিন ০.৫ গ্রাম ভিটামিন সি, এবং ০.৫ গ্রাম ইম্যুনো মডিউলেটর মিশিয়ে) চিক গার্ডের পানির পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। অতঃপর চিক গার্ডের ভিতরে বাচ্চা ছাড়তে হবে।

প্রয়োজনে বাচ্চা ছাড়ার পূর্বে বাচ্চার ঠোঁট গ্লুকোজ ও ভিটামিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে পানি স্পর্শ করাতে হবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বাচচা ছাড়ার পর কমপক্ষে ৬ ঘন্টা ভিটামিন মিশ্রিত পানি পান করার পর বাচ্চার পরিপাকতন্ত্র সচল হলে প্রথম দিন গম বা ভুট্টার দানা বা বাচ্চার জন্য তৈরিকৃত খাদ্য যোগান দেয়া যেতে পারে। তারপর লেয়ার ষ্টারটার সরবরাহ করা হয়। প্রথমে প্রতিটি বাচ্চার জন্য ৬-৮ গ্রাম খাবার দরকার হয়।

সারণি-২: লেয়ার রেশন ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা

উপাদান	পরিমাণ (কেজি)			
	ষ্টারটার রেশন ০-৮ সপ্তাহ	গ্রোয়ার রেশন (৯-১৬ সপ্তাহ)	পুলেট রেশন (১৭-২২ সপ্তাহ)	লেয়ার রেশন (২৩-অধিক)
গম	৩৫	২২	২৩	১৬
ভুট্টা	১৬.৯	৩০	৩৬	৪০
সয়াবিন	২৭.০	২৮	১৭	১২
চালের কুড়া	১৪.৮	১৫	১৯.৩	১৪.৩
ঝিনুক চূর্ণ	১.৫	১.৫	২.৫	১.৫
ডিসিপি	১.৫	২.৫	১.৫	১.৫
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫	০.৫	০.২৫	০.২৫
লাইসিন	০.১৫	০.১২৫	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১৫	০.১২৫	০.১০	০.১০
সয়াবিন তেল	২.৫০	-	-	-
ক্যালসিয়াম কার্বনেট	-	-	-	৪.০

খাবার লবন	০.২৫	০.২৫	০.২৫	-
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা				
প্রোটিন	২১.৭৪	২০.৬২	১৬.৭৯	১৭.০০
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরী/কেজি)	২৯৬০	৩০৩৩	৩১২৫	৩০৪৫
লাইসিন (%)	১.২২	১.১৫	০.৮৫	০.৯৫
মিথিওলিন (%)	০.৪৩	০.৩৯	০.৩৩	০.৩৪
ক্যালসিয়াম (%)	১.৫	১.৫	১.৫	৩.৫
ফসফরাস (%)	০.৮৬	০.৮৯	০.৯০	০.৮০

ভ্যাকসিনের কর্মসূচি

সারণি-৩: মুরগির বাচ্চা থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত ভ্যাকসিন কর্মসূচি

বয়স (দিন)	ভ্যাকসিনের নাম	মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি
৩য় দিন	আইবি+এন ডি	জীবন্তঃ১ চোখে ১ ফোঁটা
৭ম দিন	গামবোরো ডি-৭৮ (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	জীবন্তঃ ১ চোখে ১ ফোঁটা
১০ম দিন	জি+এনডি (কিল্ড)	চামড়ার নীচে অথবা মাংস পেশীতে ০.২৫ মি.লি./মুরগি
১৭তম দিন	গামবোরো ২২৮-ই	জীবন্তঃ ১ চোখে ১ ফোঁটা
২১তম দিন	আইবি+এন ডি	জীবন্তঃ১ চোখে ১ ফোঁটা
৩৫-৪০ দিন	ফাউল পক্স	পাখার চামড়ার নিচে সুঁচ ফুটানোর মাধ্যমে
৫৬ দিন	ইনফেকসাস করাইজা	ঘাড়ের চামড়ার নিচে
৬০ দিন	আর, ডি, ভি	রানের মাংসপেশীতে ১মি.লি./মুরগি
৭০	ফাউল কলেরা (ওয়েল এ্যডজুভেন্ট যুক্ত)	ঘাড়ের চামড়ার নিচে
৯০	ফাউল কলেরা (ওয়েল এ্যডজুভেন্ট যুক্ত)	ঘাড়ের চামড়ার নিচে
১০৫ দিন	ইনফেকসাস করাইজা	ঘাড়ের চামড়ার নিচে
১১০-১১৫ দিন	আইবি+এন ডি+ইডিএস	চামড়ার নীচে অথবা মাংস পেশীতে ০.৫ মি.লি./মুরগি
১২০-১২৫ দিন	আর ডি ভি	রানের মাংসপেশীতে ১মি.লি./মুরগি

উপরোক্ত ভ্যাকসিনগুলো যেহেতু ১০০০ ডোজ প্রতি ভায়ালে পাওয়া যায় তাই ২০০টি মুরগি পালনকারী ৫ জন খামারী অনায়াসে ১টি ভায়াল ব্যবহার করতে পারে।

ডিম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ডিম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ প্রতিদিনই দুইবার ডিম সংগ্রহ করে ডিমের ট্রেতে রাখতে হবে। যে সমস্ত স্থানে আলো-বাতাস ভালভাবে চলাচল করে সে সমস্ত স্থানে ডিম ৭ দিনের জন্য সংরক্ষণ করা ভাল।

বাজারজাতকরণ

ভাল বাজার মূল্য এবং সহজে বাজারজাত করার জন্য খামারীগণ সংগঠনের মাধ্যমে প্রতি ৭ দিন পর পর গ্রামীণ ফরিয়াদের নিকট অথবা সরাসরি আড়তদারগণের নিকট ডিম এবং ছাটাইকৃত মুরগিও বিক্রি করে থাকে। বাজারজাত করণের ভাল সুযোগ সুবিধা না থাকলে অনেক সময় খামারীগণ কম মূল্যে ডিম বিক্রি করতে বাধ্য হন। এছাড়া মুরগির বিষ্ঠা মাছের খামারী ও অন্যান্য খামারীদের নিকট বিক্রি করে থাকে।

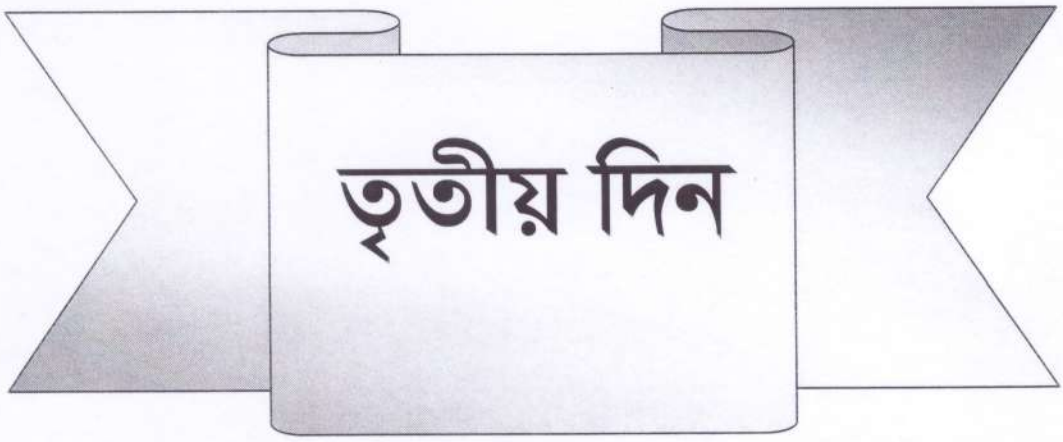

- মৎস্যচাষের প্রাথমিক ধারণা (পুকুর/খাঁচায়/পেনে/কোলে মাছচাষ)
- ইলিশ মাছ পরিবহন, বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন,মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।
- ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গণসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব
- কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০৩	অধিবেশন নং- ০১	সময়: ০৯:৩০-১০:৩০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **মৎস্যচাষের প্রাথমিক ধারণা (পুকুর/খাঁচায়/পেনে/কোলে মাছচাষ)**

অভীষ্ট দল: বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নির্বাচিত সুফলভোগী জেলে

লক্ষ্য: অংশগ্রহণকারীদের পুকুরে মাছ চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যাতে তারা নিজেদের পুকুরে মাছ চাষের সময় অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাতে পারেন।

উদ্দেশ্য:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- পুকুরে মাছ চাষের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে
- পুকুরে মাছচাষের পদ্ধতি (প্রস্তুতকালীন, মজুদকালীণ ও মজুদ পরবর্তী) বর্ণনা করতে পারবেন;
- পুকুরে মাছের চাষের পাশাপাশি খাঁচায় ও পেনে মাছচাষ বর্ণনা করতে পারবেন;

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			১০ মিনিট
	১. স্বাগত জানানো, কুশল বিনিময় ২. পূর্ববর্তী অধিবেশনের সূত্র ধরে বর্তমান অধিবেশনের অবতারণা। ৩. বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত (পুকুরে মাছের চাষের পাশাপাশি খাঁচায় ও পেনে মাছচাষ) ৪. বর্তমান অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ (উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব)	প্রশ্নোত্তর পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৪০ মিনিট
	১. পুকুরে মাছ চাষের বর্তমান অবস্থা ২. পুকুরে মাছ চাষের গুরুত্ব; ৩. পুকুরে মাছচাষে করণীয় বিষয়সমূহ; ৪. পুকুরে মাছচাষের পদ্ধতি: ৫. প্রস্তুতকালীণ করণীয়; ৬. মজুদকালীণ করণীয়; ৭. মজুদ পরবর্তি করণীয়; ৮. খাঁচায় মাছচাষ ৯. পেনে মাছচাষ	প্রশ্নোত্তর আলোচনা পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট	
সার-সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	১. মূল বিষয়ের পুনরালোচনা (প্রধান শিক্ষণ বিষয়গুলি) ২. উদ্দেশ্য যাচাই (অধিবেশনের উদ্দেশ্য); ৩. হ্যান্ড আউট বিতরণ ও পড়ানো; ৪. ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং পরবর্তি অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা দেয়া।	প্রশ্নোত্তর/ পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : পাওয়ার পয়েন্ট/ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা

দেশে জলজসম্পদ উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান ও সময়ে মৎস্য আহরণের ওপর জেলেদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এ সময় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী কর্মহীন হয়ে পড়ে, পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। সম্পদ আহরণ নিষেধাজ্ঞাকালীন ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বা আপদকালীন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা খুবই জরুরী। তাছাড়া এ সময়ে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করে জেলেদের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন ঘটানো যায়। এতে করে সম্পদের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী কর্তৃক প্রাকৃতিক সম্পদের অতি আহরণজনিত চাপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম হিসেবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে মাছ চাষ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১) পুকুরে মাছ চাষ
২) প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ
৩) খাঁচায় মাছ চাষ
৪) পেনে মাছ চাষ, ইত্যাদি।

নিম্নে রুইজাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ব্যবস্থাপনা

রুই জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ব্যবস্থাপনাকে সাধারণত: তিনটি ধাপে ভাগ করা হয়। যথা: ক) মজুদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনা, খ) মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা এবং গ) মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা।

ক) মজুদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনায় ০৯ (নয়) টি কাজ

১) ঈাড়ু ও তলা ঠিক করা ২) আগাছা দূরীকরণ ৩) রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূরীকরণ ৪) চুন প্রয়োগ ৫) পোনা প্রাপ্তির চুক্তি ৬) সার প্রয়োগ ৭) প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা ৮) বিষক্রিয়া পরীক্ষা এবং ৯) হররা টানা।

১) পাড় ও তলা ঠিক করা

পুকুরের পাড় ভাঙ্গা থাকলে রাক্ষুসে ও বাজে মাছ, রোগজীবাণু ইত্যাদি পুকুরের ভিতরে ঢুকে। বাহিরের দূষিত পানি পুকুরে ঢুকে মাছ চাষের পরিবেশ নষ্ট করে। পাড়ে ছায়াদার গাছ থাকলে পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না ফলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপন্ন হয় না। বাহিরের ধুলা বালি, পলি ইত্যাদি প্রবেশ করে পুকুর ভরাট করে ফেলে। পাড়ের ঝোপ-ঝাড় শত্রু প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে। আবার পুকুরের তলা অসমতল থাকলে জাল টানা অসুবিধা হয়। মাছের চলাচল ইত্যাদিতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের সুষম বণ্টন হয় না। পাড়ে যদি গুল্ম জাতীয় গাছ গাছরা থাকে তবে উহা পুকুরের তলা ও পানি থেকে পুষ্টি আহরণ করে মাছ চাষে পুষ্টির ঘাটতি সৃষ্টি করে থাকে।

২) আগাছা দূরীকরণ

আগাছা পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা প্রদান করে, ফলে মাছের খাদ্য উৎপন্ন হয় না। তাছাড়া আগাছা পুষ্টি শোষণ করে, মাছের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে, শত্রু প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে, মাছ আহরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি মাছের উৎপাদন কমিয়ে দেয়।

৩) রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূরীকরণ

রাক্ষুসে (বোয়াল, শোল, চিতল, আইর, টাকি, কাকিলা, বেলে, ফলি ইত্যাদি) ও বাজে মাছ (চেলা, মোলা, ঢেলা, চান্দা, পুঁটি, ডানকিনি, টেংরা, খলিশা, ইচা ইত্যাদি) দূরীকরণের জন্য রোটেনন, তামাকের গুঁড়া, গ্যাস ট্যাবলেট, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। রোটেনন প্রয়োগই সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি।

রোটেনন প্রয়োগ: ৩০ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি হিসেবে রোটেনন প্রয়োগ করে এই রাক্ষুসে ও বাজে মাছ দূর করা যায়। পরিমান মত পানি নিয়ে তাতে রোটেনন পাউডার মিশিয়ে কাঁই তৈরি করতে হবে। তারপর ১/৩ অংশ আলাদা করে তা দিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি করতে হবে। বাকি অংশ বেশি পানিতে গুলিয়ে পাতলা করতে হবে। এর পর কড়া রোদের সময় পাতলা অংশ বাতাসের অনুকূলে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে ও বলগুলি সমভাবে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

৪) চুন প্রয়োগ

পুকুরে মাছের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য চুন ব্যবহার করা হয়। চুন পানি পরিষ্কার করে, রোগ বালাই দুর করে, অম্লত্ব দুর করে, সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে, ঘোলাত্ব দুর করে, বিষাক্ত গ্যাস দুর করে, পুষ্টি মুক্ত করে, পানির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, মাছের স্বাস্থ্য ভাল রাখে, বাফার হিসেবে কাজ করে। বিষ প্রয়োগের ৫-৭ দিন পরে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

চুন প্রয়োগের মাত্রা ও পদ্ধতি: সাধারণত প্রতি শতাংশে ০১ (এক) কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে। টিনের বালতি, সিমেন্টের চাড়ি অথবা ড্রামের ভিতরে চুন নিয়ে তার মুখে চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তারপর চটের ওপর আস্তে আস্তে পানি ঢালতে হবে। ভিজানো চুন কম পক্ষে ১৫ ঘন্টা রেখে তার পর নাড়ানী দিয়ে নাড়াচাড়া করে আরো পানি মিশিয়ে সমস্ত পুকুরে সমভাবে ছিটাতে হবে।

৫) পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ

পুকুরে সার প্রয়োগের সাথে সাথে পোনা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সঠিক সময়ে বিভিন্ন জাতের ভাল পোনা পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে পোনা উৎপাদনকারী খামারের সাথে অথবা পোনাওয়ালাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

৬) সার প্রয়োগ

মাছের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির লক্ষ্যে পুকুরে পোনা মজুদ করার আগেই সার প্রয়োগ করতে হবে। সারের পরিমান নির্ভর করে পুকুরের উর্বরতার উপর। সার প্রয়োগের মাত্রা নিম্নরূপ:

সার	মাত্রা / শতাংশ	প্রয়োগ পদ্ধতি
ইউরিয়া	২০০ গ্রাম	টিএসপি ও এমওপি সার আগের দিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন পুকুরে ছিটানোর ২০-৩০ মিনিট আগে ভালভাবে ইউরিয়া মিশিয়ে পুকুরে সুষমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।
টিএসপি	১০০ গ্রাম	
এমপি	২০ গ্রাম	

৭) প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

সার প্রয়োগের ৩-৫ দিন পরে খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা বুঝা যাবে পুকুরের পানির রং দেখে। পানির রং হালকা সবুজ বা লালচে সবুজ বা বাদামী সবুজ হলে বুঝতে হবে খাদ্য তৈরি হয়েছে। সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা হয়। যথা: ক) সেক্কি ডিস্ক পদ্ধতি, খ) হাত দ্বারা এবং গ) গামছা গ্লাস পদ্ধতি। এর মধ্যে সেক্কি ডিস্ক পদ্ধতিই বেশি উপযোগী।

সেক্কি ডিস্ক পানিতে ডুবানোর পর পর্যবেক্ষণ:

লাল সুতা পর্যন্ত ডুবার পর অদৃশ্য হলে	বেশী খাদ্য: সার দেবেন না, পোনা ছাড়বেন না
সবুজ সুতা পর্যন্ত ডুবার পর অদৃশ্য হলে	ভাল অবস্থা: পোনা ছাড়ুন, নিয়মিত খাদ্য দিন
সাদা সুতা পর্যন্ত ডুবার পর অদৃশ্য হলে	খাদ্য স্বল্পতা: আরও সার দিন

৮) পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

পোনা ছাড়ার একদিন আগেই পানিতে বিষক্রিয়া আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে। এ লক্ষ্যে হাড়ি বা পুকুরে হাপা স্থাপন করে কিছু পোনা ছেড়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পোনা মারা গেলে বুঝতে হবে পানিতে বিষক্রিয়া রয়েছে, এ অবস্থায় পুকুরে পোনা ছাড়া যাবে না। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর আবার পরীক্ষা করে পোনা ছাড়তে হবে।

৯) হররা বা জাল টানা

সার প্রয়োগের পর পুকুরের তলায় দূষিত বা বাজে গ্যাস জমা হতে পারে যা ভালভাবে ৪-৫ দিন হররা বা জাল টেনে দূর করা যায়। তবে মেঘলা দিনে বা বৃষ্টির সময় হররা টানা যাবে না। সূর্য ওঠার আগে বা ভোরে হররা টানা যাবে না। তাতে অক্সিজেনের অভাব হতে পারে।

খ) মজুদকালীন ০৬ (ছয়) টি কাজ

১) পোনার জাত নির্বাচন ২) মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ ৩) ভাল ও খারাপ পোনা চেনা ৪) পোনা পরিবহণ ৫) পোনা অভ্যস্তকরন ও পোনা শোধন ৬) পোনা অবমুক্তকরণ

১) পোনার জাত নির্বাচন

বিভিন্ন মাছ পানির বিভিন্ন স্তরে বাস করে ও ভিন্ন ভিন্ন খাবার খায়। তাই পুকুরে সকল স্তরের স্থান ও খাদ্যের সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে একই প্রজাতির মাছ না ছেড়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ছাড়া উচিত।

২) মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ

মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত মাছগুলো বর্ণিত হারে ছাড়তে হবে।

প্রজাতি	সাত প্রজাতির চাষ		ছয় প্রজাতির চাষ		পাঁচ প্রজাতির চাষ	
সিলভার কার্প	৮-১০	৪০%	৮-১০	৪০%	৮-১০	৪০%
কাতলা	৪-৬		৪-৬		৪-৬	
বিগহেড কার্প	-		-		-	
রুই	৮-১০	২৫%	৮-১০	২৫%	৯-১২	৩০%
মৃগেল	৬-৭	২৫%	৬-৭	২৫%	৬-৮	৩০%
মিরর কার্প	২-৩		২-৩		৩-৪	
গ্রাস কার্প	২-৪	১০%	২-৪	১০%	-	
সরপুঁটি	১০-১৫	অতিরিক্ত	-		-	
মোট	৪০-৫৫	১০০%	৩০-৪০	১০০%	৩০-৪০	১০০%
এখানে মনে রাখতে হবে যে, অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পোনা ছাড়লে ফলন বেশী পাওয়া যাবে।						

৩) ভাল ও খারাপ পোনা চেনা

দেখার বিষয়	ভাল পোনা	খারাপ পোনা
দেহের রং	ঝকঝকে, উজ্জ্বল আইশ	ফ্যাকাশে আঁইশ
আচরণ	চঞ্চল	স্থির
বিজল	বেশী	খসখসে
বিভিন্ন দাগ	ফুলকা বা দেহে দাগ নাই	লাল, কালো দাগ

৪) পোনা পরিবহণ

হ্যাচারী থেকে অক্সিজেন ব্যাগে রেণু পরিবহণ করতে হবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, পলিব্যাগ যেন ছিদ্র হয়ে না যায়। ব্যাগ ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে পরিবহণ করা উচিত। ৭-১০ ইঞ্চি আকারের পোনা ১৫-২০টি/লিটার পানিতে ৪-৬ ঘণ্টা পরিবহণ করা যেতে পারে।

৫) পোনা অভ্যস্তকরণ ও পোনা শোধন

পোনা পরিবহণ পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা একই করার জন্য পরিবহণ পাত্রকে পানিতে ২০ থেকে ৩০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে তারপর কিছু কিছু করে পানি পাত্রে ঢুকাতে হবে ও পাত্রের পানি বাহিরে ফেলতে হবে। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে পানির তাপমাত্রা সমতায় আসলে পোনা ছাড়তে হবে।

পোনা ছাড়ার আগে পানিতে ১ চা চামচ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট অথবা ২০০ গ্রাম লবণ পানিতে মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করতে হবে ও উক্ত পানিতে আধা মিনিট থেকে এক মিনিট গোসল করিয়ে পানিতে ছাড়তে হবে। এতে পোনার রোগ বালাইয়ের সম্ভাবনা কমে যায় এবং মাছ সুস্থ থাকে।

৬) পোনা অবমুক্তকরণ

অভ্যস্থকরণ ও শোধন করার পর ব্যাগ বা পাতিল কাত করে ব্যাগের দিকে আস্তে আস্তে ঢেউ দিলে পোনা পুকুরে চলে যাবে। সকালে অথবা বিকালে ঠান্ডা আবহাওয়ায় পুকুরের পাড়ের কাছাকাছি পোনা ছাড়তে হবে। কড়া রোদে ও বৃষ্টির মধ্যে পোনা ছাড়া যাবে না।

গ) মজুদ পরবর্তী করণীয় কাজ

পুকুরে পোনা মজুদের পর সাধারণতঃ নিম্নরূপ ধাপসমূহ অনুসরণ করা হয়:

১) পোনা বাঁচার হার নির্ধারণ, ২) মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ, ৩) সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ, ৪) নিয়মিত হররা টানা, ৫) নমুনায়ন ও আংশিক আহরণ, ৬) মাছ ধরা ও বিক্রয়, ৭) রেকর্ড সংরক্ষণ।

১) পোনা বাঁচার হার পর্যবেক্ষণ

পোনা ছাড়ার পর আংশিক অথবা সব পোনা মারা যেতে পারে। তাই পুকুরে পোনা টিকলো কিনা বা কতগুলো বেঁচে থাকলো তা পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন আছে। যদি পোনা ছাড়ার পরদিন সকাল বেলা দেখা যায় যে, কিছু পোনা মারা গেছে তবে যত গুলো পোনা মারা গেছে তত গুলো পোনা পুনরায় মজুদ করতে হবে।

২) মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ

মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য তথা মাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই প্রয়োগ দৈনিক বা সাপ্তাহিক মাত্রায় হতে পারে।

৩) সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ

অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা জরুরী। খাদ্য তৈরির ফরমুলা:

উপাদানের নাম	নমুনা-১		নমুনা-২	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য	ব্যবহার মাত্রা (%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য
ডফসমিল	৩০	৩০০	৩০	৩০০
সরিষার খৈল	৪০	৪০০	৩০	৩০০
হাড়/ঝিনুকের গুঁড়া	-	-	৫	৫০
পলিস কুড়া/গমের ভুসি	২০	২০০	২০	২০০
আটা	৯	৯০	১০	১০০
চিটাগুড়	১	১০	৫	৫০
খনিজ লবণ/ভিটামিন	-	১ চামচ	-	১ চামচ
মোট	১০০	১০০০	১০০	১০০০

খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ পদ্ধতি: খৈল একটি পাত্রে ২ গুন পানির সাথে এক রাত ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে খৈলের সাথে কুড়া বা ভুসি মিশিয়ে গোলাকার বল তৈরি করে পুকুরের নির্দিষ্ট স্থানে খাদ্য দানীতে দেহ ওজনের ১০-৫% হারে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। গ্রাস কার্পের জন্য ক্ষুদিপানা, কলাপাতা, নরম ঘাস পাতা, কুটিপানা ইত্যাদি বেষ্টনী (Enclosure) তৈরি করে খেতে দিতে হবে।

৪) নিয়মিত হররা টানা

সার ও খাদ্য প্রয়োগের ফলে পুকুরের তলায় বিভিন্ন ধরণের গ্যাস জমতে পারে। তাই এক সপ্তাহ পর পর পুকুরে হররা টেনে গ্যাস দূর করা যেতে পারে।

৫) নমুনায়ন ও আংশিক আহরণ

যেসব মাছ বিক্রয় উপযোগী হয় সেগুলো বিক্রি করে দিয়ে সমান সংখ্যক পোনা মজুদ করলে অধিক ফলন পাওয়ার আশা করা যায়।

৬) মাছ ধরা ও বিক্রয়

আংশিক আহরণকালে বড় মাছ ধরে ছোট মাছকে বড় হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত। বাজার দরের প্রতি নজর রেখে মাছ ধরতে হবে। মাছ ধরার জন্য বেড় জাল, ঝাঁকি জাল ব্যবহার করা যায় অথবা পুকুর শুকিয়েও সম্পূর্ণভাবে মাছ ধরা যেতে পারে। মাছ ধরার আগে বাজারদর/ক্রেতা/বাজার এবং জাল/জেলে ঠিক করে নিতে হবে।

৭) রেকর্ড সংরক্ষণ

আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিক রাখা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নিজেকে এবং অন্যকে সাহায্য করার জন্য রেকর্ড সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য খাতওয়ারী আলাদা আলাদা খাতা খোলা উচিত।

রোগ বালাই

পানি দূষিত হওয়া, পানিতে পুষ্টি পদার্থের অভাব, অতিরিক্ত সার ও খাদ্য প্রয়োগ, মাছের অতিরিক্ত মজুদ, পুকুরে বাইরের পানির প্রবেশ, আঘাত প্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি কারণে মাছের রোগ হয়ে থাকে।

কিছু রোগ, তার লক্ষণ ও প্রতিকার

রোগ	লক্ষণ	প্রতিকার/প্রতিরোধ
লেজ পচা ও পাখনা পচা	লেজ ও পাখনা পচতে থাকে। পাখনা ছিঁড়ে সাদা হয়ে যায়।	প্রতি শতাংশে এক কেজি চুন ও এক কেজি লবণ প্রয়োগ। তবে রোগ

সাদা ফুটকি (হোয়াইট স্পট)	দেহ, পাখনা ও ফুলকায় অসংখ্য সাদা দাগ বা ফুটকী দেখা যায়	প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়। তাই সঠিকভাবে পুকুর প্রস্তুতি, সঠিক ঘনত্বে মানসম্মত পোনা মজুদ এবং ভালমানের খাদ্য প্রয়োগ ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধের জন্য সহায়ক।
মাছের উকুন	অবিরাম ছুটাছুটি করে ও কোন কিছুর সাথে গা ঘষতে থাকে।	
আইশ উঠা ও শরীরে দাগ	শরীরের বিভিন্ন অংশে সাদা দাগ, আইশ উঠে যায় ও ঘা হয়।	
মাছের ক্ষতরোগ	লাল দাগ দেখা যায় ও আইশ পড়ে যায়।	

খাঁচায় মাছ চাষ

উপযুক্ত গভীরতার নদী বা হাওর বাওড় কিংবা খাল বিলের প্রবাহমান পানিতে উপযোগী আকারের খাঁচা স্থাপন করে অধিক ঘনত্বে বাণিজ্যিকভাবে মাছ উৎপাদনের প্রযুক্তি হলো খাঁচায় মাছ চাষ। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক সময়ে খাঁচায় মাছ চাষ নূতনভাবে সফলতার সাথে শুরু হলেও পৃথিবীর অনেক স্থানেই খাঁচায় মাছ চাষের ইতিহাস অনেক পুরোনো। খাঁচায় মাছ চাষের সূচনা হয় চীনের ইয়াংঝি নদীতে আনুমানিক ৭৫০ বছর আগে। আর প্রায় দুইশত বছর আগে কাম্পুচিয়ায় খাঁচায় মাছ চাষ শুরু হয়, যেখানে জেলেরা মাগুর মাছকে বাঁশের খাঁচায় মজুদ করতো বাজারজাত করার লক্ষ্যে। প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে সাম্প্রতিককালে খাঁচায় মাছ চাষ ক্রমাগতভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশে 'খাঁচায় মাছ চাষ' নূতন হলেও এশিয়ার কিছু দেশ যেমন চীন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম এবং নেপালে এর প্রচলন বেশ প্রাচীন। এশিয়ার অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশ খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ প্রতিযোগিতামূলকভাবে খাঁচায় মাছ চাষে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। এদেশগুলোর অধিকাংশই আন্তর্জাতিক রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য খাঁচায় তেলাপিয়া চাষ করে থাকে।

খাঁচায় মাছ চাষে বাংলাদেশঃ

১৯৮০ সালে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে কাপ্তাই লেকে সর্বপ্রথম খাঁচায় মাছ চাষ প্রকল্প হাতে নেয়। তবে দূর্বল ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় কারিগরী পদক্ষেপের অভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম আশানুরূপ ফলাফল লাভে ব্যর্থ হয়।
বাংলাদেশে খাঁচায় মাছ চাষের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ গ্রহন করে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই কাঙ্খিত ফল লাভ হয়নি। অথচ একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ খাঁচায় মাছ চাষে অভাবিত সাফল্য অর্জন করে।
২০০২ সাল থেকে শুরু করে মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে বর্তমানে চাঁদপুরের ডাকাতিয়া নদী ও লক্ষীপুর জেলার মেঘনা নদীর রহমতখালী চ্যানেলে যথাক্রমে সাড়ে চারশত এবং পাঁচশত খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ করা হচ্ছে; যা থেকে উৎপাদিত হচ্ছে বৎসরে ৭০০ মেঃ টন রপ্তানিযোগ্য তেলাপিয়া। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে সফলতার সাথে খাঁচায় মাছ চাষের এ অধ্যায় শুরু হয় চাঁদপুর জেলার ডাকাতিয়া নদীতে।
আমাদের দেশের পশ্চাদপদতার পিছনে কয়েকটি মৌলিক উপাদানের অভাবকেই কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সেগুলো নিম্নরূপঃ

- টেকসই মানসম্পন্ন জালের অভাব
- খাঁচায় ব্যবহার উপযোগী ভাসমান খাদ্যের অভাব
- খাঁচায় চাষ উপযোগী মৎস্য প্রজাতি নির্বাচনে দূর্বলতা
- প্রয়োজনীয় কারিগরী দিকনির্দেশনার অভাব

খাঁচায় মাছ চাষের সম্ভাবনা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশের বুক চিরে রয়েছে জালিকার ন্যায় বিন্যস্ত অসংখ্য নদী, নালা, খাল, বিল, হাওর ও বাঁওড় । আমাদের দেশের অধিকাংশ নদীতেই কম বেশি সারা বছর প্রবাহ বিদ্যমান। এর মাঝে দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোতে একেবারে মোহনা থেকে শুরু করে দেশের নিম্নমধ্যাঞ্চল পর্যন্ড় সাগরের প্রভাবে জোয়ার ভাটার কারণে দ্বিমুখী প্রবাহ লক্ষণীয়। আর দেশের মধ্যাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চল পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত নদীগুলোতে একমূখী প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। এ নদীগুলোর পাড়ের

অনেক অংশেই রয়েছে খাড়া গভীর খাড়ি, যা খাঁচা স্থাপনের জন্য উপযোগি। মূল নদী ও এদের শাখাসমূহে স্রোতের তীব্রতা বিবেচনায় বিভিন্ন ঘনত্বে পোনা মজুদ করে খাঁচায় মাছ চাষ করা সম্ভব।

বিল ও বাঁওড়গুলো যদিও সারা বছর নদীর সাথে সংযোগ থাকে না তথাপি অনেকগুলোতেই ধীর গতির পানি প্রবাহ বিদ্যমান। আবার যেগুলোতে একেবারেই স্রোত দেখা যায় না অথবা মূল কোন নদীর সাথে সংযোগ নেই এমন বিল বা বাঁওড়ে বিস্তৃত জলাশয়ে বায়ুপ্রবাহের কারণে সবসময় পানিতে ধীর গতির সঞ্চালন পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাগরে বিশাল আকারের খাঁচা স্থাপনের অনুকরণে এ সকল জলাশয়ে বড় খাঁচা স্থাপন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে হয়তো বা মূল নদী প্রবাহে স্থাপিত খাঁচার ন্যায় উচ্চ মজুদ ঘনত্ব নিশ্চিত করা কারিগরী দিক থেকে সঠিক হবে না তবে বিস্তৃত এলাকায় খাঁচার কার্যকরী আয়তন বৃদ্ধি করে মাঝারী মজুদ ঘনত্বেও প্রত্যাশিত উৎপাদন করা সম্ভব।

খাঁচায় মাছ চাষের উপযোগী স্থান নির্বাচন

খাঁচায় মাছচাষের উপযোগি স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়ঃ

- খাঁচা স্থাপনের জন্য উপযোগী নদীর এমন অংশ যেখানে একমূখী প্রবাহ কিংবা জোয়ার ভাটার শান্ত প্রবাহ বিদ্যমান। নদীর মূল প্রবাহ যেখানে অত্যাধিক তীব্র স্রোত বিদ্যমান সে অঞ্চলে খাঁচা স্থাপন না করাই সমীচীন। নদীতে ৪-৮ ইঞ্চি/সেকেন্ড মাত্রার পানিপ্রবাহে খাঁচা স্থাপন মাছের জন্য উপযোগী, তবে প্রবাহের এ মাত্রা সর্বোচ্চ ১৬ ইঞ্চি/সেকেন্ড এর বেশী না হওয়া উচিত।
- মূল খাঁচা পানিতে ঝুলন্ত রাখার জন্য ন্যূনতম ১২ ফুট গভীরতা থাকা প্রয়োজন। যদিও প্রবাহমান পানিতে তলদেশে বর্জ্য জমে গ্যাস দ্বারা খাঁচায় মাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম তথাপি খাঁচার তলদেশ নীচের কাঁদা থেকে ন্যূনতম ৩ ফুট ব্যবধান থাকা আবশ্যক।
- স্থানটি লোকালয়ের নিকটে হতে হবে যাতে সহজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।
- খাঁচা স্থাপনের স্থান থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুন্দর হতে হবে যাতে সহজে উৎপাদিত মাছ বাজারজাত করা যায়।
- খাঁচা স্থাপনের কারণে যাতে কোনভাবেই নৌ চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে এমন স্থান হতে হবে।
- সর্বোপরি খাঁচা স্থাপনের জায়গাটি এমন হতে হবে যাতে শিল্প বা কলকারখানার বর্জ্য কিংবা পয়ঃনিষ্কাশনের পানি অথবা কৃষিজমি থেকে বন্যা বা বৃষ্টি বিধৌত কীটনাশক প্রভাবিত পানি নদীতে পতিত হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে খাঁচার মাছ মারা যেতে না পারে।

খাঁচা তৈরীর উপকরণ

নদীতে স্থাপিত খাঁচায় ব্যবহৃত উপকরণগুলোকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথাঃ

খাঁচা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এখন আমাদের দেশে পাওয়া যায়। উপকরণসমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ

- খাঁচা তৈরীর মূল পলিইথিলিন জাল (৩/৪ ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি মেসের)
- রাসেল নেট (খাদ্য আটকানোর বেড় তৈরীতে)
- নাইলনের দড়ি ও কাছি
- কভার নেট বা ঢাকনা জাল (পাখির উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য)
- ১ ইঞ্চি জিআই পাইপ (৭০ ফুট প্রতিটি খাঁচার জন্য)
- ফ্রেম ভাসমান রাখার জন্য মুন্য ব্যারেল/ড্রাম (২০০ লিটারের পিভিসি ড্রাম, ওজন ৯ কেজি'র উর্ধ্বে)
- খাঁচা স্থির রাখার জন্য গেরাপি (অ্যাম্কর)
- ফ্রেমের সাথে বাঁধার জন্য মাঝারী আকারের সোজা বাঁশ (প্রয়োজনীয় সংখ্যক)

খাঁচার ডিজাইনঃ

খাঁচা তৈরীর জন্য এমন জাল ব্যবহার করতে হবে যেন কাঁকড়া, গুইসাপ, কচ্ছপ ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রাণী জালগুলো কাটতে না পারে। ডাকাতিয়া মডেলে বর্তমানে ২০ফুট × ১০ফুট × ৬ফুট (৬ মিটার×৬ মিটার× ২ মিটার) আকারের খাঁচা ব্যবহার হচ্ছে। খাঁচা তৈরীর জন্য জালগুলো মেস ৩/৪ ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চির মধ্যে হওয়া বাঞ্চনীয়। এত সহজে নদীর পরিস্কার পানি প্রতিনিয়ত খাঁচার ভিতরে সঞ্চালিত হতে পারে।

খাঁচাগুলোর ফ্রেম তৈরী করতে প্রথমে ১ ইঞ্চি জিআই পাইপ দ্বারা আয়তাকার ২০ ফুট × ১০ফুট ফ্রেম তৈরী করা হয়। আর মাঝে ১০ ফুট আরেকটি পাইপ বসিয়ে ঝালাই করে ফ্রেম তৈরী করা হয়। এতে একটি ফ্রেমে সরাসরি ২০ফুট × ১০ফুট আকারের খাঁচা বসানো যায় আবার প্রয়োজনবোধে ১০ফুট × ১০ফুট আকারের দুইটি খাঁচাও বসানো যায়। প্রতি দুই ফ্রেমের মাঝে ৩ টি ড্রাম স্থাপন করে সারিবদ্ধভাবে ফ্রেমগুলো স্থাপন করা হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক গেরাপী বা নোঙর দিয়ে খাঁচা নদীর নির্দিষ্ট স্থানে শক্তভাবে বসানো হয়। এরপর প্রতিটি ফ্রেমের সাথে পৃথক পৃথক জাল সেট করা হয়।

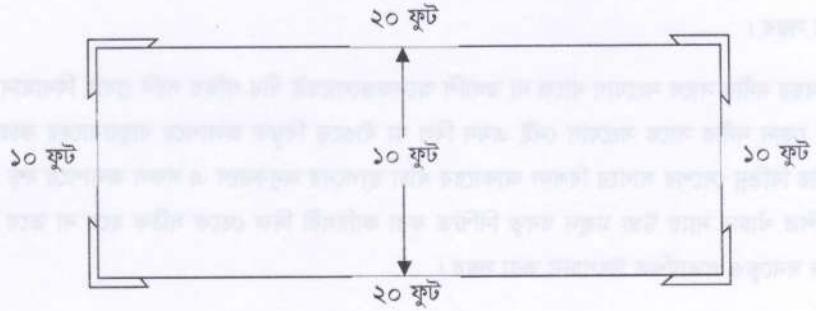

খাঁচা তৈরী ও জলাশয়ে স্থাপন

নদীতে ভাসমান খাঁচা স্থাপনার জন্য

খাঁচা স্থাপনঃ

খাঁচা স্থাপনের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে নদীর পাড়ে যেখানে খাঁচা স্থাপন করা হবে সেখানে নিতে হবে। জিআই পাইপের ফ্রেমগুলো আগেই নিকটবর্তী কোন ওয়ার্কশপ থেকে ঝালাই করে ফ্রেম তৈরী করে খাঁচা স্থাপনের এলাকায় আনতে হবে।

একসাথে জায়গার উপযোগীতা মোতাবেক ১০-১২ টি ফ্রেম পাশাপাশি রেখে প্রতি দুটো খাঁচার মাঝে তিনটি করে ড্রাম বসিয়ে সংযোগকারী লোহার ফ্রেম দ্বারা আটকাতে হবে। ড্রামগুলো যাতে নীচ দিয়ে সরে না যায় সেজন্য দুই ফ্রেমের পাইপের সাথে ভালোভাবে নাইলনের দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এরপর সম্পূর্ণ ফ্রেমের দৃঢ়তার জন্য চারদিকে জিআই পাইপের সাথে এবং মাঝের জিআই পাইপের সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সোজা বাঁশ বেঁধে দিতে হবে। এরপর প্রয়োজনীয় জলবলের সহযোগীতা নিয়ে একসাথে সতর্কতার সাথে সম্পূর্ণ খাঁচার ফ্রেমকে পানিতে ভাসাতে হবে। এভাবে সমস্ড় খাঁচা পানির উপরে তথা ডাঙ্গাতে বেঁধে পরে পানিতে ভাসাতে হবে।

প্রত্যাশিত গভীরতায় খাঁচা ভাসানো হলে এর দুদিকে দুইটি এবং খাঁচা ইউনিটের দৈর্ঘ্য বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক গেরাপী বা নোঙ্গর মোটা গ্রীন হেংস কাছি (১২ নং) দিয়ে বেঁধে উপযোগী দুরত্বে নদীতে স্হাপন করতে হবে।

এরপর ধীরে ধীরে খাঁচার জাল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে খাঁচাগুলো ফ্রেমে সাথে বাঁধতে হবে। খাঁচায় মাছ মজুদের কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে জালগুলো সেট করে ফেলতে হবে। এতে জালের গায়ে সামান্য শ্যাওলা পড়বে। ফলে মাছ মজুদের পর নূতন জালের ঘর্ষনজনিত আঘাত থেকে মাছ রক্ষা পাবে।

খাঁচায় চাষ উপযোগী মৎস্য প্রজাতি

সাধারণভাবে খাঁচায় চাষের জন্য মৎস্য প্রজাতিগুলোর নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য গুলো বিবেচনা করা হয়ঃ

- নিজস্ব পরিবেশগত অবস্থায় স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় যাদের দৈহিক বৃদ্ধির হার ভাল
- অধিক ঘনত্বে বসবাস উপযোগী
- যে মাছের পোনা সবসময়ই সহজলভ্য
- যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী
- সম্পূরক খাদ্যে সাড়া দেবার প্রবণতা থাকা
- নদীর প্রবাহমান পানির খাঁচায় লাফানোর প্রবণতা কম
- তুলনামূলকভাবে দৈহিক পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা বেশী
- স্থানীয় বাজারে ও আন্ড়র্জাতিক বাজারে চাহিদা ও মূল্য বেশী

পূর্বে আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে খাঁচায় মাছ চাষের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তাতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়েছে। শুরুর দিকে অনেকে খাঁচায় পাঙ্গাস মজুদ করতেন। কিন্তু ক্রমহ্রাসমান বাজার মূল্যের কারণে আজকাল খাঁচায় পাঙ্গাস চাষ লাভজনক বলে মনে হয় না। বর্তমানে অধিকাংশ

খাঁচাতেই একক প্রজাতি হিসাবে মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ করা হচ্ছে। এর কারণ হলো নার্সিং করে খাঁচায় মজুদ করা হলে মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানেই খাঁচা থেকে মাছ আহরণ ও বিক্রয় করা যায়; আর ক্রমবর্ধমাণ চাহিদা অনুসারে দেশেই মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে বিভিন্ন হ্যাচারীতে। তেলাপিয়ার উৎপাদন সারা বিশ্বেই উৎসাহব্যাঞ্জক। বর্তমানে বাংলাদেশে সারা বছরই দ্রুত বর্ধণশীল তেলাপিয়ার পোনা পাওয়া যাচ্ছে। তদুপরি উৎপাদনকে আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে মনোসেক্স তেলাপিয়ার বীজ উৎপাদন আমাদের দেশেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী, মৃত্যু হার কম এবং দ্রুত বর্ধনশীল বিধায় মনোসেক্স তেলাপিয়া খাঁচায় চাষযোগ্য প্রজাতির তালিকায় প্রথম অবস্থানে রয়েছে। তাছাড়া খেতে সুস্বাদু হওয়ায় এর বাজার মূল্য, বাজারে চাহিদাও বেশী। অতি সম্প্রতি মনোসেক্স তেলাপিয়া বিদেশে রপ্তানী শুর" হয়েছে। তবে সরপুটি, পাংগাস, গ্রাস কার্প, কমন কার্প ইত্যাদি মাছ খাঁচায় চাষ করা যায়।

মনোসেক্স তেলাপিয়ার পুকুর প্রস্তুতি ও পোনা মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা

সাধারণত খাঁচায় ব্যবহৃত জালের মেস সাইজ বড় হওয়ায় ছোট আকারের পোনা মজুদ করা সম্ভব নয়। খাঁচাতে সাধারণত ২৫-৩০ গ্রাম ওজনের মনোসেক্স তেলাপিয়া পোনা মজুদ করা হয়। তাই খাঁচায় মজুদ উপযোগী আকারের পোনা তৈরির জন্য নার্সারিতে পোনা প্রতিপালন করা অতীব জর"রী।

পোনা প্রতিপালনের জন্য পুকুর নির্বাচন ঃ

বিভিন্ন ধরনের অগভীর বাৎসরিক পুকুর অথবা পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আছে এমন মৌসুমী পুকুরে পোনা প্রতিপালন করা যায়। পোনা প্রতিপালনের জন্য নার্সারি পুকুরের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

- পাড় উঁচু, মজবুত ও বন্যামুক্ত হতে হবে
- নার্সারি পুকুর আয়তাকার হওয়া বাঞ্চনীয়
- পুকুরে প্রচুর সুর্য্যের আলো ও বাতাস লাগার ব্যবস্থা থাকতে হবে
- পানির গভীরতা ৩-৪ (সর্বোচ্চ) ফুট হলে ভালো হয়
- তলায় অতিরিক্ত কাঁদা না থাকে (৩-৪ ইঞ্চি)
- আয়তন ২৫-৫০ শতক হলে ব্যবস্থাপনা সহজ হয়
- পুকুরের অবস্থান চাষীর বাড়ী ও খাঁচার নিকটবর্তী হলে ভালো হয়

পুকুর প্রস্তুতিঃ

নার্সারী পুকুর প্রস্তুতির জন্য নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ করা উচিতঃ

- পুকুর শুকানো ও পাড় মেরামত
- চুন প্রয়োগ
- সার প্রয়োগ

পুকুর শুকানো ঃ -

নার্সারী পুকুরের জন্য প্রতি বছর পুকুর শুকানো অত্যন্ড় জর"রী। রাক্ষুসে ও অন্যান্য ছোট প্রজাতির মাছ মারা, পুকুরের পাড় মেরামত ও তলার অতিরিক্ত কাদা সরিয়ে ফেলার জন্য পুকুর শুকানো সবচেয়ে ভালো। পুকুর শুকানো কাজটি সাধারণত ফেব্র"য়ারী-মার্চে করা ভালো। এতে একদিকে পুকুরে পানি কম থাকাতে খরচ যেমন কম হয়, অন্যদিকে পুকুর শুকানোর ফলে পাড় ভাঙ্গার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া পুকুরের উপর বড় গাছের ডাল-পালা থাকলে তা কেটে ফেলা এবং পাড়ের ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করে নিতে হবে। কোন কারণে পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে রাক্ষুসে ও অন্যান্য ছোট মাছ মারার জন্য যথাসম্ভব পানি নিষ্কাশন করে রোটেনন প্রয়োগ করা যেতে পারে। পুকুরে ২৫-৩০ গ্রাম/শতক/ফুট মাত্রায় রোটেনন প্রয়োগ করতে হয়।

রোটেনন ব্যবহার পদ্ধতিঃ

প্রয়োজনীয় রোটেননকে আনুমানিক তিন ভাগ করে এক ভাগ দিয়ে 'কাই' তৈরী করে ছোট ছোট বল বানাতে হবে। অবশিষ্ট দুই ভাগের সাথে পানি মিশ্রিত করে ভালভাবে গুলাতে হবে। অত:পর পানিতে গুলানো ও বল বানানো রোটেনন সমভাবে সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। ১৫-২০ মিনিট পর মাছ ভেসে উঠতে শুর" করলে জাল দিয়ে মাছ সংগ্রহ করে নিতে হবে। যেহেতু রোটেনন একটি বিষ তাই সতর্কতার সাথে তা প্রয়োগ করতে হবে। রোটেনন দ্বারা মারা মাছ খেতে কোন অসুবিধা নেই। রোটেননের বিষাক্ততার মেয়াদকাল প্রায় ৭ দিন।

চুন প্রয়োগঃ

রোগ-জীবাণু ধ্বংস ও পানির অম্-ত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণতঃ প্রতি শতকে ১ কেজি হারে পোড়া চুন (চাকা আকারে পাওয়া যায়) প্রয়োগ করতে হবে। টিনের ড্রাম বা বালতিতে অথবা পুকুর পাড়ে গর্ত করে চুন গুলাতে হবে। অত:পর ঠান্ডা হলে সমস্ড় পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। ইদানিং চুনের বদলে কোন কোন মৎস্য চাষী পুকুরে জিওটক্স বা জিওলাইট ব্যবহার করেন। জিওটক্স প্রতি শতাংশে ৪০০ গ্রাম হারে এবং জিওলাইট ৫০০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করা হয়। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে জিওটক্স পানির সাথে মিশিয়ে আর জিওলাইট পাউডার অবস্থায় সমস্ড় পুকুরে সমভাবে ছিটিয়ে দেয়া হয়।

সার প্রয়োগঃ

চুন বা জিওটক্স বা জিওলাইট প্রয়োগের পর ধীরে ধীরে দৈনিক ৬ থেকে ৭ ইঞ্চি মাত্রায় পুকুরে পানি বৃদ্ধি করে ৩-৩.৫ ফুট পর্যন্ড় পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়। চুন বা জিওটক্স প্রয়োগের ৬-৭ দিন পর পুকুরে সার প্রয়োগ করা হয়। যেহেতু তেলাপিয়ার নার্সারীতে প্রচুর পরিমান বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত গুনগত পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য ব্যবহার করা হয় ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে পুকুরের তলদেশে জৈব পদার্থ জমতে থাকে। তাই পুকুরে জৈব সার প্রয়োগ না করাই উত্তম। পুকুরে শতাংশ প্রতি ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ১৪০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে নার্সারী পুকুর প্রস্তুতকালে চুন প্রয়োগের ৬-৭ দিন পর পুকুরের চারপাশ দিয়ে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম হারে আটা বা ময়দা প্রয়োগ করা হচ্ছে যার ফলে জুপ-াঙ্কটন পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি পায়।

পোনা পরিবহনঃ

সাধারণত: হ্যাচারী থেকে অক্সিজেন ব্যাগেই মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা সরবরাহ করা হয়। এতে পোনা মৃত্যুর সম্ভাবনা কম থাকে। তবে নার্সারী পুকুরের অবস্থান হ্যাচারীর নিকটবর্তী বা কাছাকাছি হলে পাতিল বা ড্রামেও পোনা পরিবহণ করা সম্ভব।

পোনা পরিবহণে সতর্কতাঃ

- পলিথিন যাতে ছিদ্র না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা
- অধিক পোনা পরিবহণকালে বিকল্প অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা
- পোনার ব্যাগ সরাসরি সুর্যালোকে না রাখা
- ঠান্ডা অবস্থায় পোনা পরিবহন করা

পোনা অভ্যস্থকরণ ও পুকুরে ছাড়াঃ

- ঠান্ডা আবহাওয়ায় সকাল অথবা বিকালে পোনা ছাড়া তবে প্রখর রোদ, বৃষ্টি অথবা নিম্নচাপের সময় পোনা মজুদ না করাই উত্তম।
- পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও পোনা বহনকারী ব্যাগের পানির তাপমাত্রা সমতায় এনে পোনা মজুদ করা
- সম্ভব হলে পানির প্রবাহ দেয়া
- পুকুরে পাড়ের কাছাকাছি পোনা ছাড়া

পোনা মজুদ ও মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনাঃ

নার্সারী পুকুরে সার প্রয়োগের ১০-১২ দিন পর পোনা মজুদ করা উত্তম। কারণ সময়ের এ ব্যবধানে প্রচুর পরিমাণ প্রাণিজ খাদ্য তৈরী হয়। নার্সারি পুকুরে মনোসেক্স তেলাপিয়ার প্রতি শতকে ১২০০-১৫০০ হারে পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

যদি নার্সারী পুকুর যথাযথভাবে তৈরী করা না হয়ে থাকে তখন বিকল্প উপায় হিসাবে মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা হ্যাচারী থেকে এনে হাপায় নার্সিং করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ১০ মিটার×৫ মিটার ×১ মিটার আকারের একটি হাপাতে সর্বাধিক ২৫০০০ পোনা মজুদ করা যাবে। এ ধরণের হাপাতে পোনা মজুদ করে তিন সপ্তাহ নার্সিং করে এর পর পুকুরে অবমুক্ত করে দিতে হবে। এতে পুকুরের ক্ষতিকর প্রানী কর্তৃক পোনা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

পোনা মজুদের পরদিন সকাল বেলা পোনা মারা গেল কিনা তা পর্যবেক্ষন করা উচিত। মৃত পোনা পাওয়া গেলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। বেশী পরিমাণে মারা গেলে পুনরায় সমপরিমান পোনা মজুদ করতে হবে।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগঃ

সহজ প্রাপ্য ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় সম্পূরক খাদ্য হিসাবে গমের ভুসি, চালের কুড়া, সরিষার খৈল ও ফিশমিল ব্যবহার করা যায়। এ সমস্ড় খাদ্যে প্রোটিন মান খুব কম। বর্তমানে প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত অনেক কোম্পানীর তৈরী নার্সারী খাদ্য সহজলভ্য হওয়ায় সেগুলো ব্যবহার করে অল্প সময়ে উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। সাধারণতঃ নার্সারী-১ ও নার্সারী-২ খাদ্য ব্যবহার করা হয়।

মনোসেক্স তেলাপিয়ার সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োগ মাত্রাঃ

মজুদের পর	খাদ্যের পরিমাণ
১ম সপ্তাহ	দেহ ওজনের ২৫%
২য় সপ্তাহ	দেহ ওজনের ২০%
৩য় সপ্তাহ	দেহ ওজনের ১৫%
৪র্থ সপ্তাহ	দেহ ওজনের ১০%
৫ম সপ্তাহ	দেহ ওজনের ৮%
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	দেহ ওজনের ৭%
৭ম সপ্তাহ	দেহ ওজনের ৫%

নির্ধারিত পরিমাণ খাদ্য দৈনিক ৪ বারে প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্যই দিনের বেলায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা নার্সারী পুকুরে মজুদের পর কয়েকটি বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

খাঁচায় মাছের মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ

পানির স্রোত, জালের ফাঁসের আকার, পানির ঘভীরতা, প্রত্যাশিত আকারের মাছ উৎপাদন, খাধ্যের গুণগতমান এবং বিনিয়োগ ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করেই মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়। স্থাপিত খাঁচায় প্রতি ঘনমিটারে ২০ হতে ৩০ টি পর্যন্ত মনোসেক্স তেলাপিয়ার পোনা মজুদ করা যাবে। মজুদকালে পোনার আকার এমন হতে হবে যাতে পোনা বেরিয়ে যেতে না পারে। ন্যূনতম ৫০-৬০ গ্রাম আকারে পোনা মজুদ করতে হবে।

নার্সারী পুকুর থেকে পোনা পরিবহণ ও খাঁচায় মজুদ

খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে নার্সারী হতে পোনা পরিবহন ও খাঁচায় পোনা মজুদকরণ একটি অত্যাবশকীয় ধাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পলিথিন ব্যাগে অথবা ড্রাম বা এলুমিনিয়ামের হাড়িতে পোনা পরিবহন করা যায়।

খাঁচায় তেলাপিয়ার পোনা পরিবহনের জন্য নার্সারী হতে পোনা সংগ্রহের পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে ঃ

- জাল টেনে পোনার আকার ও স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- খাঁচায় মজুদের জন্য পুকুরে থেকেই গ্রেডিং করে যথাসম্ভব একই আকার ও ওজনের পোনা সংগ্রহ করতে হবে। আমরা যে ফাঁস বিশিষ্ট জাল দ্বারা খাঁচা তৈরী করি তাতে ২৫-৩০ গ্রাম ওজনের পোনা মজুদ করতে হবে তাহলে মজুদকৃত পোনা খাঁচা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না।
- পরিবহনের পূর্বে পোনাকে টেকসই (পেট অবশ্যই খালি) করে নিতে হবে যাতে পরিবহণকালে পানিতে মলমূত্র ত্যাগের মাধ্যমে পানি নষ্ট না হয়।
- নার্সারী পুকুর থেকে খাঁচার অবস্থানের দূরত্ব বিবেচনা করে পোনা পরিবহণের জন্য পূর্ব থেকেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

পোনা ছাড়ার আগে শোধনঃ

পোনা পরিবহন করে খাঁচা স্থাপনার কাছে নেওয়ার পর ছাড়ার পূর্বে পোনা শোধন করে নিতে হবে এবং এতে পোনা সুস্থ থাকবে এবং রোগ বালাই এর সম্ভাবনা কমে যাবে। পোনা নিম্নরূপেভাবে শোধন করা যাবে ঃ

১. একটি বালতিতে ১০লিটার পানি নিয়ে এর মধ্যে ২০০ গ্রাম খাবার লবন অথবা ১ চা চামচ ডাক্তারী পটাশ ($KMnO_4$) মিশাতে হবে।

২. অত:পর বালতির উপর একটি ঘন জাল রেখে তার মধ্যে প্রতিবার ২০০-৩০০টি পোনা ছাড়তে হবে।

৩. তারপর জাল ধরে পোনা গুলোকে বালতির পানিতে ৩০ সেকেন্ড গোসল করাতে হবে ।

৪. এভাবে একবার তৈরি করা লবন/ পটাশের পানিতে ৫-৭ বার শোধন করা যাবে।

নমুনায়ন ও গ্রেডিং

নমুনায়ন ঃ

খাঁচায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে নমূনায়ণ করা হয় মাছের দৈহিক বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যগত অবস্থা, খাঁচার জাল ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের জন্য। এজন্য মাঝে মাঝে নির্ধারিত বিরতিতে প্রতিটি খাঁচার নীচে আড়াআড়ি ভাবে বাঁশ দিয়ে টেনে মাছগুলোকে খাঁচার এক পার্শ্বে জড়ো করে মাছের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

গ্রেডিং ঃ

যদিও খাঁচাতে পোনা মজুদের সময় যথাসম্ভব একই আকারের পোনা এক খাঁচায় মজুদ করা হয়। তথাপি সীমিত পরিসরে অধিক ঘনত্বে খাঁচায় মাছ চাষ করা হয় বিধায় সময় অতিক্রমের সাথে সাথে মাছগুলোর মধ্যে দৈহিক বর্ধন হারের তারতম্য দেখা যায়। ফলে খুব দ্রুত প্রতিটি খাঁচাতে পোনার আকার বিভিন্ন হয়ে যায়। সঠিক ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ নিয়মে খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয় মাছের আকারের বৈষম্য সর্বনিম্ন রাখতে। এরপরও প্রতিটি মাছের ভিন্ন ভিন্ন দৈহিক বর্ধন প্রবনতা, খাদ্য গ্রহণের দক্ষতা ইত্যাদির কারণে সময়ের সাথে সাথে দৈহিক বর্ধনে তারতম্য সুস্পষ্ট হতে থাকে। এজন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রতিটি খাঁচা থেকে মাছ বাছাই করে বড় ও ছোট মাছ গুলোকে গ্রেডিং করে ভিন্ন ভিন্ন আকারের মাছকে ভিন্ন ভিন্ন খাঁচায় স্থানান্ড্র করা হয়। এভাবে বিভিন্ন আকারের মাছ থেকে সম আকারের মাছ বাছাই করে নির্দিষ্ট খাঁচায় মজুদ করার পদ্ধতিই হলো গ্রেডিং বা বাছাইকরণ।

খাদ্য প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা

খাঁচায় সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রযোগের গুরুত্ব নিম্নরুপঃ

- ❖ মাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে।
- ❖ অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করা যায়।
- ❖ মৃত্যু হার অনেকাংশে কমে যায়।
- ❖ অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।
- ❖ রোগাক্রান্ড় হওয়ার আশংকা হ্রাস পায়।
- ❖ নির্ধারিত সময়ে কাংখিত আকারের মাছ উৎপাদন করা সম্ভব

বাণিজ্যিকভাবে প্রবাহমান পানিতে খাঁচায় মাছ চাষ পরিচালনার জন্য ভাসমান খাদ্যের বিকল্প নেই। বর্তমানে সারাদেশে বেসরকারি উদ্যোগে মাছের খাদ্য বাণিজ্যিকভাবে তৈর করার জন্য বেশকিছু খাদ্য কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানি পানিতে ভাসমান পিলেট সম্পূরক খাদ্য তৈরী করে থাকে। মনোসেক্স তেলাপিয়া খাঁচায় মজুদের পর হতে বাজারজাত করার তেলাপিয়ার জন্য ৩০% আমিষ সম্পন্ন খাবার প্রয়োজন। দৈহিক চাহিদা মোতাবেক নিয়মিত এবং নিয়মমাফিক খাদ্য প্রদান করতে হবে। মাছের ওজন ১০০ গ্রাম হওয়া পর্যন্ত দৈনিক ৩ বার এবং ওজন ১০০ গ্রাম হওয়ার পর দৈনিক ২বার খাবার প্রদান করতে হবে। খাদ্যের পরিমান দৈহিক ওজনের ৮-৩ শতাংশ এর মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। দক্ষতার সাথে ভাল ব্রান্ডের তৈরী ভাসমান খাবার ব্যবহার করে দেখা গেচে যে, মজুদ থেকে শুরু করে বাজারজাত পর্যন্ত এক কেজি তেলাপিয়া উৎপাদন করতে প্রায় ১.২৫ কেজি খাদ্যের প্রয়োজন হয়। খাদ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষ না হলে খরচ অনেক বেড়ে যাবে। সুতরাং মাছের খাদ্য চাহিদা যাচাই করে সে মোতাবেক খাবার সিডিউল তৈরী করতে হবে। প্রতি ১০দিন অন্তর খাবার সিডিউল পরিবর্তন করতে হবে।

খাঁচার মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

আরহণযোগ্য মাছের আকার ওজন, বাজার চাহিদা, চাষের মেয়াদ ও ব্যবস্থাপনার ধরণ বিবেচনায় রেখে মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণের সিদ্ধান্ড় নিতে হবে। খাঁচার সব মাছ একত্রে বাজারজাতের উপযোগী আকার হয় না। তাই বড় মাছগুলো বাছাই করে বাজারে প্রেরণের জন্য পৃথক এক বা একাধিক খাঁচায় রাখতে হবে। এতে একদিকে যেমন একই আকারের মাছ গ্রেডিং করার কারণে উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায়, অন্যদিকে ধীরে ধীরে ছোট মাছগুলো বড় হওয়ার জন্য অতিরিক্ত স্থান ও সময় পাবে। মাছ বাজারে প্রেরণের সময় যদি মাছের পেটে খাদ্য ভর্তি থাকে তবে মাছের গুণগত মান নষ্ট হওয়াকে তরান্বিত করে।

এজন্য মাছ বাজারে প্রেরণের আগের দিন ঐ খাঁচায় দুপুরের পর খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। এতে বাজারজাতের জন্য প্রেরিত মাছের গুণগত মান অধিক সময় অক্ষুন্ন থাকবে।

আহরণপূর্ব বিবেচ্য বিষয় ঃ

মাছ আহরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নিম্নে উল্লেখিত বিয়ষসমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন ঃ

- মাছের আকার ও ওজন
- বাজার দর সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- বাজার বা ক্রেতা নির্ধারণ করা
- দ্রুত মাছ বাজারে পৌছানোর জন্য পরিবহন ব্যবস্থা ঠিক করা
- বাজারে প্রেরণের আগে মাছ পরিমাপের জন্য উপযুক্ত পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা করা
- মাছ জীবন্ড় অবস্থায় বাজারজাতের জন্য প্লাস্টিক কন্টেইনার বা ড্রাম এর ব্যবস্থা করা
- দূরের বাজারে মাছ প্রেরণের আগে প্রয়োজনীয় পূর্ব প্রস্তুতি যেমন প্যাকিং, উপযুক্ত পাত্র, বরফ ইত্যাদি নিশ্চিত করা

নিয়মিত পরিচর্যা

খাঁচায় মাছ চাষের উৎপাদন অনেকাংশে নির্ভর করে নিয়মিত খাঁচা ব্যবস্থাপনার উপর। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাঁচায় মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১. নিয়মিত খাবার প্রয়োগঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাশিত উৎপাদন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পরিমিত মাত্রায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ গুণগত মানসম্পন্ন দানাদার ভাসমান খাবার প্রয়োগ করতে হবে।

২. আচরণ পর্যবেক্ষণঃ মাছের আচরণের যে কোন পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন থাকা অর্থাৎ মাছ যদি অস্বাভাবিকভাবে ভেসে বেড়ায় কিংবা পরিমাণমত খাদ্য গ্রহণ না করে অথবা শরীরে কোন ক্ষত কিংবা অস্বাভাবিক দাগ দেখা দেয় তবে সে ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. জাল পর্যবেক্ষণঃ জালে ছিদ্র আছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করা (সকাল বেলা খাওয়ানোর পূর্বে জাল পরীক্ষা করার উত্তম সময়)। জালে ছিদ্র থাকলে বা কোন কারণে ছিঁড়ে গেলে তা মেরামত কিংবা নতুন খাঁচা স্থাপনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. মৃত মাছ অপসারণঃ খাঁচার ভিতরে যদি কোন মাছ মারা যায় তবে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে করে পরিবেশ দূষণ না হয়।

৫. ক্ষতিকর প্রাণির আক্রমণঃ ক্ষতিকর প্রাণী যেমন : কাঁকড়া, গুইসাপ, সাপ ইত্যাদি থেকে খাঁচাকে রক্ষা করা।

৬. উচ্ছিষ্ট খাদ্য ঃ সরবরাহকৃত খাবার অনেক সময় সম্পূর্ণরূপে না খেলে তা জমা হয়ে খাঁচার স্বাভাবিক পরিবেশ দূষিত হয়ে যেতে পারে। এজন্য উচ্ছিষ্ট বা অতিরিক্ত খাবার দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।

৭. জলাশয়ে খাঁচার অবস্থান পর্যবেক্ষণ ঃ জোয়ার ভাটার সময় পানির উঠানামার সাথে সাথে খাঁচার ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা।

৮. খাঁচার জালের ফাঁস বন্ধ হয়ে যাওয়াঃ শ্যাওলা দ্বারা জালের ফাঁস বা মেস বন্ধ হয়ে পানির প্রবাহ কমে যায়। লম্বা হাতলযুক্ত নরম ব্রাশের সাহায্যে জালের শ্যাওলা পরিস্কার করতে হবে। আবার মাছকে ২/১ দিন খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখলে মাছ এই শ্যাওলা খেয়ে জাল পরিস্কার করে ফেলে।

৯. খাঁচার অভ্যন্ড়রে বা দুই খাঁচার মাঝে আবদ্ধ আবর্জনাঃ খাঁচার মধ্যে অনেক সময় ছোট ছোট কচুরীপানা ও অন্যান্য আবর্জনা ঢুকে যায়। এগুলো পরিস্কার করে ফেলতে হবে।

১০. নৌ চলাচলঃ রাতের অন্ধকারে বা কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে জাহাজ, ট্রলার, নৌকা চলাচলের সময় খাঁচার অবস্থান যাতে দূর থেকে বুঝতে পারে সেজন্য খাঁচা সংলগ্ন স্থানে আলোর ব্যবস্থা করে বা লাল পতাকা ব্যবহার করে খাঁচার অবস্থান চিহ্নিত করা।

১১. নদীর অস্বাভাবিক স্রোতঃ বেশী স্রোত অনেক সময় খাঁচার কাঠামো ভেঙ্গে ফেলতে পারে কিংবা ক্ষতি সাধন করতে পারে। সেজন্য বেশী স্রোতশীল স্থানে খাঁচা স্থাপন করা হলে স্রোতের বিপরীতে বাঁকানো বেড়া দিয়ে স্রোতের আঘাত হতে খাঁচাকে রক্ষা করতে হবে।

১২. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ঃ বিভিন্ন প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন: ঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদি থেকে খাঁচাকে রক্ষার জন্য পূর্ব সতর্কতা হিসাবে খাঁচা উঠা-নামা রশি ঢিলা, শক্ত নোঙ্গরসহ (Anchor) অন্যান্য সমস্ড় সতর্ক অবস্থা বজায় রাখতে হবে।

১৩. খাঁচার মাছকে নিরাপদ রাখাঃ মাছ থাকা অবস্থায় কোন সময়ই সম্পূর্ণ খাঁচা পানির উপরে তোলা যাবে না কিংবা তোলার চেষ্টা হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ এতে খাঁচা ও খাঁচার কাঠামো দুই-ই ক্ষতি হতে পারে।

১৪. পাখির উপদ্রবঃ খাঁচার উপর ঢাকনা জাল দেয়া যাতে বক, পানকৌড়ি ইত্যাদি পাখির খাবারের জন্য এসে মাছকে ঠুকরিয়ে আঘাত করতে না পারে।

১৫. ড্রাম ভাসমান রাখাঃ ড্রাম ছিদ্র হয়ে গেলে ড্রাম ডুবে গিয়ে জাল ডুবে মাছ বেরিয়ে যেতে পারে। ঝালাই দেয়ার সুবিধা থাকলে ঝালাই দিয়ে পুনরায় ড্রাম স্থাপন করতে হবে।

১৬. বাঁশের গুণগতমান লক্ষ্য রাখাঃ বাঁশ ভাল আছে কিনা তা খেয়াল রাখা। ১/১.৫ বৎসরের মধ্যে সাধারণত: বাঁশ নষ্ট হয়ে যায়। তাই নিয়মিতভাবে বাঁশের কাঠামোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে বাঁশ পঁচে বা ভেঙ্গে গিয়ে দূর্ঘটনা না ঘটে।

পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণঃ পুকুরে স্থাপিত খাঁচার ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে পুকুরের পানি যাতে অত্যাধিক সবুজ না হয়, বাঁশে শ্যাওলা জমে যেন পঁচে না যায়। তলায় জৈব পদার্থ অতিরিক্ত থাকলে হররা টেনে বা ডগ চেইন (Dog Chain) দিয়ে তলার বিষাক্ত গ্যাস দূর করতে হবে।

খাঁচায় মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

নদীতে ভাসমান খাঁচাতে যেহেতু সার্বক্ষণিক পানি পরিবর্তন হতে থাকে ফলে খাঁচার মাছ প্রতিনিয়ত অক্সিজেনসমৃদ্ধ নূতন পানির পরিবেশ লাভ করে। তাই নদীতে খাঁচায় মাছে রোগ দেখা দেয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। তবে শীতের শুর“তে নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদের ন্যায় প্রচলিত কিছু রোগ দেখা দিতে পারে। আবার বর্ষার শুর“তে যখন কৃষি জমি বিধৌত কীটনাশকসমৃদ্ধ পানি নদীতে এসে পতিত হয়, তখন খাঁচার মাছের গায়ে লাল দাগ, ছত্রাকজনিত রোগ, ক্ষতরোগ ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ডাকাতিয়া নদীতে স্থাপিত খাঁচাগুলোতে এখন পর্যন্ড় শুধু সামান্য লাল দাগ ও কদাচিৎ ছত্রাকজনিত রোগ দেখা দেয়। এ দুটির যে কোন রোগ দেখা দিলে রোগের মাত্রার বিবেচনায় তাৎক্ষণিক ভাবে নিম্নবর্ণিত চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় ঃ

(ক) ফরমালিন ও মিথিলিণ দ্রবণে গোসল ঃ

যেহেতু পুকুরের মাছের ন্যায় খাঁচার মাছে তার পরিবেশে তথা পানিতে ঔষধ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না তাই এখানে খাঁচার মাছকে খাঁচা থেকে বাইরে এনে সুবিধাজনক পাত্রে ফরমালিণ দ্রবণে গোসল করানো হয়। খাঁচায় রোগ দেখা দিলে খাচার মাছকে ফরমালিণ দ্রবণে গোসল করানোর পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

- একটি হাফ ড্রামে ৮০ লিটার পানি নিতে হবে
- তাতে ২০ মিলিলিটার (মাছের গায়ে ক্ষত বা দাগ কম হলে) ফরমালিন মেশাতে হবে; আর ক্ষত বা দাগ বেশি হলে ২৫ মিলিলিটার ফরমালিন মেশাতে হবে
- এর সাথে ১ গ্রাম মিথিলিন ব:ু যোগ করে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।
- ড্রামের দ্রবনে একটি সুবিধাজনক আকারের জাল সেট করতে হবে।
- এবার খাঁচা থেকে প্রতিবারে ৪০/৫০ টি করে তেলাপিয়া মাছ নিয়ে ড্রামের পানিতে রক্ষিত জালে ছেড়ে দিতে হবে।
- রোগের তীব্রতা বেশি হলে ৫ মিনিট এবং কম হলে ৩ মিনিট গোসল করাতে হবে। এরপর ড্রামের জালটি ধরে মাছগুলোকে নূতন খাঁচায় স্থানাস্ড় রিত করতে হবে।
- এভাবে একটি খাঁচার অর্ধেক মাছ (৪০০ থেকে ৫০০ টি) গোসল করানো হয়ে গেলে বাকী অর্ধেক তেলাপিয়াকে গোসল করানোর আগে ড্রামের পানিতে পূনরায় কিছু পরিমান ফরমালিন (৫ মিলিলিটার) এবং সামান্য পরিমান (এক চিমটি) মিথিলিন ব:ু যোগ করে নিতে হবে।

এভাবে সম্পূর্ণ খাঁচার মাছকে গোসল করাতে হবে। রোগের তীব্রতা বুঝে প্রয়োজনে ৭ দিন পর আবার মাছগুলোকে ফরমালিন ও মিথিলিন ব্লু দ্রবণে গোসল করাতে হবে।

(খ) এন্টিবায়োটিক খাওয়ানো ঃ

ফরমালিণ দ্রবণে গোসল করানোর দিন থেকেই খাঁচার মাছকে ভাসমান খাদ্যের সাথে এন্টিবায়োটিক মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। খাদ্যের সাথে এন্টিবায়োটিক খাওয়ানোর পদ্ধতিঃ

- প্রতি ১০০ কেজি খাদ্যের সাথে ১০০ গ্রাম এন্টিবায়োটিক পাউডার মিশাতে হবে।
- খাঁচার একবেলার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান ভাসমান খাদ্য পরিস্কার মেঝেতে ঢেলে নিতে হবে।
- উক্ত পরিমান খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় এন্টিবায়োটিক পাউডার নিয়ে পরিমান মতো পানিতে গুলে নিতে হবে। সাধারণত প্রতি বস্ড়া (২৫ কেজির) খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় এন্টিবায়োটিক পাউডার ১ থেকে ১.৫ লিটার পানিতে গুলতে হবে।
- এন্টিবায়োটিক দ্রবণকে মেঝেতে ছড়ানো খাদ্যের ওপর সমভাবে স্প্রে করে দিতে হবে। কক্ষ তাপমাত্রায় খাদ্যগুলোকে ৫/৬ ঘন্টা শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর খাদ্যগুলো ব্যবহার করা যাবে।
- প্রতিদিনের খাদ্যে প্রতিদিন এন্টিবায়োটিক মিশাতে হবে।
- এভাবে ক্রমাগতভাবে দশদিন এন্টিবায়োটিক খাওয়াতে হবে; কোন দিন দৈবক্রমে বাদ গেলে পুনরায় হিসাব করে দশদিনের কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি খাঁচায় মাছ চাষ করে রপ্তানীর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উলে-খযোগ্য ভূমিকা রাখছে। খাঁচা ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষের এ প্রযুক্তি দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করছে। আমাদের দেশে এ প্রযুক্তি এখনো একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। চাঁদপুর ও লক্ষীপুর জেলায় বিগত কয়েক বছরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সংগতি রেখে আধুনিক প্রযুক্তিতে খাঁচায় মাছ চাষ করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সংশি-ষ্ট এলাকা ও পারিপার্শ্বিকতায় বিভিন্নমূখী যে সকল ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

- মানসম্পন্ন পোনার অভাব
- উপযুক্ত খাবারের অপ্রতুলতা
- রাক্ষুসে প্রাণীর আক্রমণ
- পরজীবির আক্রমণ
- কাঁকড়া দ্বারা জাল কাঁটা
- ঘোলাত্ব
- খাঁচার জালের বন্ধ হয়ে যাওয়া
- নেভিগেশন সমস্য
- জলোচ্ছ্বাস
- বন্যা
- খরা
- ঝড়
- পাহাড়ী ঢল
- কলকারখানার বর্জ্য
- জলজ আগাছা পঁচন
- পাট পঁচানো
- কীটনাশকের প্রভাব

ঝুঁকি সমূহের সম্ভাব্য সমাধানঃ

১. নিরাপদ জায়গায় খাঁচা স্থাপনঃ নেভিগেশন সমস্যা, চুরি সমস্যা, পাহাড়ী ঢলের সমস্যা, বন্যা ও জলোচ্ছাস সমস্যাজনিত থেকে খাঁচাকে রক্ষার জন্য নিরাপদ স্থানে খাঁচা স্থাপন করতে হবে।

২. সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণঃ মেস সাইজ বন্ধ হওয়ার সমস্যা, কচুরী পানা জমার সমস্যা, বাঁশ ও অন্যান্য সামগ্রী পঁচে নষ্ট হয়ে খাঁচার ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে পরিত্রাণের জন্য সার্বক্ষণিক খাঁচাগুলোকে পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখতে হবে।

৩. সমাজের লোকজনের সচেতনতা বৃদ্ধিঃ যদি সমাজের বেশীর ভাগ লোককে সচেতন করে খাঁচায় চাষের কার্যক্রমে জড়িত করা অথবা গুরুত্ব বোঝানো যায় তবে সকলের সংশি-ষ্টতায় প্রতিহিংসা বা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে ক্ষতি করার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

৪. পানির গভীরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাঁচা স্থানান্তরঃ পানির গভীরতা বেশি বলে খাঁচায় মাছ চাষ ভাল হয়। শুকনা মৌসুমে অথবা জোয়ার ভাটা এলাকায় পানি উঠানামা করে। পানির পরিমান ৬ ফুটের নিচে হলে আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যায় না, এক্ষেত্রে পানির গভীরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাঁচা স্থাপন করা উচিত।

৫. নিকটতম পরিচিত কাউকে পোনা ব্যবসায়ী হিসাবে গড়ে তোলাঃ খাঁচায় ছাড়ার বা মজুদের মত আকারের মনোসেক্স তেলাপিয়ার উন্নত মানের পর্যাপ্ত পোনা সব সময় পাওয়া যায় না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এলাকার কাউকে পোনা ব্যবসায়ী হিসাবে গড়ে তুললে তার কাছ থেকে উন্নত মানের পোনা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে।

৬. তেলাপিয়া মাছের রোগ ও প্রতিকারঃ সাধারণত তেলাপিয়া মাছ চাষে তেমন কোন রোগব্যাধি হয় না। তবে শীতে এবং পানির পরিবেশ দূষণে গায়ে সাদা দাগ বা ক্ষত রোগ দেখা দিয়ে থাকে। পুকুরের বেলায় পানির পরিবেশ উন্নয়নের জন্য শতকে ২৫০ গ্রাম হারে চুন দিতে হবে অথবা প্রতি ২০ দিন পরপর প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম হারে জিউটক্স প্রয়োগ করা যেতে পারে। পুকুরের পানি আংশিক পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে। চাষিকে মনে রাখতে হবে যে, মাছের রোগের চিকিৎসা করার চেয়ে মাছে যাতে রোগ না হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই উত্তম। খাঁচার বেলায় মাছকে ফরমালিন গোসল বা ম্যালাকাইট গ্রীন গোসলের ব্যবস্থা করে রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে। নদী বা হাওর -বাওড়, দীঘি, বিলে খাঁচায় রোগ দেখা দেয়া মাত্রই মাছকে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. সরকারী জলাশয়ে খাঁচা স্থাপনের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি নিতে হবে বা চুক্তিপত্র সম্পাদন করে নিতে হবে।

৮. জলজ আগাছা পঁচন এলাকা/পাট পঁচানোর এলাকা, শিল্প এলাকার বর্জ্য নির্গত হয় -নদীর এমন অংশ থেকে নিরাপদ দূরত্বে খাঁচা স্থাপন করতে হবে।

৯. যে কোন উৎস থেকেই বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত মাছের সম্পূরক খাদ্য সংগ্রহ করা হোক না কেন তার গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। অন্যথায় প্রত্যাশিত উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

১০. ঝোঁপঝাড় মুক্ত এলাকায় খাঁচা স্থাপন করতে হবে এবং পাখির উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য খাঁচার উপরে ঢাকনা জাল দিয়ে আবরণ দিতে হবে।

১১. নদীর ভাসমান আবর্জনা বা কচুরীপানা খাঁচার স্থাপনায় আটকে গেলে তা সাথে সাথে পরিস্কার করে ফেলতে হবে।

১২. কাঁকড়া, কচ্ছপ ইত্যাদি জলজ প্রাণী যাতে জাল কাটতে না পারে তার জন্য গুণগত মান সম্পন্ন জাল দ্বারা খাঁচা তৈরী করতে হবে।

১৩. রাতের বেলায় খাঁচার স্থাপনাতে বৈদ্যুতিক বাতি দ্বারা/বৈদ্যুতিক সংযোগ না থাকলে ভাসমান বয়াতে বাতি দিয়ে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. পুকুরের ক্ষেত্রে ঘোলাত্ব দূরীকরণে চুন অথবা জিপসাম প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অথবা কচুরীপানা বা ধানের খড়ের আঁটির দ্বারা ঘোলাত্ব দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। পুকুরের পাড়ে ঘাসের আবরণ দিয়েও ঘোলাত্ব দূর করা যেতে পারে।

পেনে মাছ চাষ মডিউল

পেন কালচার কি

একটি বড় জলাশয় বা নদী বা মরা নদী বা তার অংশ বিশেষ, পতিত অথবা বদ্ধ খালের অংশ বিশেষ অথবা হাওড় বা বাওড়ের কোন বিশেষ অংশকে বেষ্টণী দ্বারা ঘেরাও করে মাছ চাষের উপযোগী করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে একক বা দলবদ্ধ হয়ে মাছ চাষ করার কলা কৌশলকে পেনে মাছ চাষ বা পেন কালচার বলে।

পেনে মাছ চাষের গুরুত্ব, বর্তমান প্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ রয়েছে মিঠা পানির সর্ব বৃহৎ জলাধার। সারাদেশে প্রায় ২৬.৭৫ লক্ষ হেক্টর বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমি, প্রায় ১২০ টির বেশী প্রবাহমান/মরা নদী, ৪৭ টি হাওড়, ৫,৬৭১ হেক্টর বাওড় ও অসংখ্য প্রবাহমান/বদ্ধ খাল রয়েছে এবং এ সকল জলাশয় বছরের ৩-৮ মাস সময় প্রায় ৩-১০ ফুট পানির গভীরতায় নিমজ্জিত থাকে। প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণে এ সকল জলাশয় হতে উৎপাদিত মৎস্য সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। মুক্ত জলাশয় হতে আহরিত মাছের বেশীরভাগ অবদানই হচ্ছে এ সকল জলাভূমি। প্লাবনভূমি হতে আহরিত এসকল মাছের সিংহভাগই হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত। বিদ্যমান সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে এ সকল জলাভূমি উন্নয়নের মাধ্যমে রুইজাতীয় মাছের সাথে অন্যান্য মাছ এবং চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সার্বিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করা সম্ভব। বিদ্যমান প্লাবনভূমি, নদীর খাড়ি, বৃহৎ জলাশয়ের অংশ বিশেষ, মরা নদী, বদ্ধ খাল এবং পরিত্যক্ত জলাশয়ে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পেন সৃষ্টি করে মাছ চাষ করা গেলে দেশের দারিদ্রতা দ্রুত দূর করা সম্ভব। পেনে মাছ ও চিংড়ি চাষের গুরুত্ব এবং সম্ভাবনা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

পেনে মাছ চাষের গুরুত্ব

- নিচু ধানক্ষেত, প্লাবনভূমি, নদীর খাড়ি, বৃহৎ জলাশয়ের অংশ বিশেষ, মরা নদী, বদ্ধ খাল এবং পরিত্যক্ত জলাশয় পেন কালচার এর জন্য উপযুক্ত।
- প্রাকৃতিক/বর্ষা প্লাবিত জলাশয়সমূহ প্রাকৃতিক কারনে উর্বর থাকে।
- এ সকল জলাশয় সমূহে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত রুই জাতীয় মাছ সহ দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির পোনার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়।
- প্রাকৃতিক এসকল জলাশয় সমূহ অধিকাংশ মাছের প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- বর্ষার সময়কে কাজে লাগিয়ে বাড়তি ফসল হিসেবে মাছ ও গলদা চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- পতিত/অব্যবহৃত জলাশয় সমূহে পেন সৃষ্টি করে ব্যাপক সংখ্যক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

পেনে মাছ চাষের বর্তমান প্রেক্ষিত

- বর্তমানে বাংলাদেশে ৬,৩৩০ হেক্টর এলাকা জুড়ে পেনে মাছ চাষ করে ১২,৩৬১ মেট্রিকটন মাছ উৎপাদিত হচ্ছে। পেন কালচার সারাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের বিশাল অংশ দখল করে আছে।

পেনে মাছ চাষের সম্ভাবনা

- বিল-ঝিলসহ বদ্ধ খাল, নদীর খাড়ি, মরা নদী, হাওড়/বাওড় এলাকাসমূহে পেন সৃষ্টির মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ি চাষ করা সম্ভব।
- পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ এবং চাষ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব
- সারাদেশের বর্ণিত জলাশয়সমূহ ব্যবহারযোগ্য করে মোট মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।
- দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণে পেন কালচার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- পেন কালচারের মাধ্যমে সহজ ব্যবস্থাপনায় এবং স্বল্প ব্যয়ে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে ।
- বিস্তীর্ণ জলরাশিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের চাহিদা পূরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

পেনে মাছ চাষ পরিচিতি ও সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার বাস্তবতা

বিল-ঝিল এলাকা, প্রবাহমান/বদ্ধ খাল, নদীর খাড়ি/মরা নদী, হাওড়/বাওড় এর অংশ বিশেষে দলবদ্ধভাবে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অথবা এককভাবে পেন তৈরী করে মাছ চাষের উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে। বৃহৎ জলাশয়ের মাছ চাষযোগ্য কোন অংশ বিশেষ একক ব্যবস্থাপনায় দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা বেশী সুতরাং সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার সার্বিক বিষয়সমূহের সুনির্দিষ্ট উপস্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজভিত্তিক মাছ ও চিংড়ি চাষের বাস্তব ও প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো।

সমাজভিত্তিক মাছ চাষ

একটি নির্দিষ্ট জলাশয়কে কেন্দ্র করে ঐ এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে যখন মাছ চাষ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তখন তাকে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ বলে।

পেনে মাছ চাষে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সুফল

- সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ উদ্যোক্তা উন্নয়নের মজবুত ভিত্তি হচ্ছে গ্রামের সকল শ্রেণীর জনগনের অংশগ্রহন।
- সংশ্লিষ্ট সমাজের অংশগ্রহন এবং ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহনের মাত্রা, কার্যকারিতা, ক্ষমতার অংশীদারিত্ব, ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন বিষয় সর্বোচ্চ হারে নিশ্চিত করে।
- সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রমে জনগন অর্থনৈতিক ভাবে যেমন উপকৃত হন তেমনি সমাজজুড়ে ব্যাপক ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়।
- এ কার্যক্রমে অধিক সংখ্যক জন-অংশগ্রহন নিশ্চিত করলে সমাজ হয়ে উঠে সচেতন, স্বনির্ভর এবং প্রত্যয়ী।

সমাজভিত্তিক মাছ চাষের প্রয়োজনীয়তা

- পেনে মাছ চাষে সমাজভিত্তিক জন-অংশগ্রহন নিশ্চিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠবে।
- এককভাবে বাস্তবায়িত কার্যক্রমে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততা না থাকার দ্বন্দ্ব স্থায়িত্ব পায় ও সমাধান একেবারেই অনিশ্চিত থাকে। কারন ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রকল্পসমূহ ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণ করে।
- ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রকল্পে ধনী আরও ধনী হয় এবং গরীব শ্রেণীর দারিদ্রতা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলে।
- সমাজে আর্থিক বৈষম্য প্রকট হওয়ার ফলে গ্রামের প্রভাবশালী মানুষগুলোর দাপটে সামাজিক বিশৃংখলা এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার নেতিবাচক দিক প্রকট হয়ে ওঠে।
- দারিদ্র বিমোচন, গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থানসহ দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী এবং পেশার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ সংরক্ষণে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের দাবী।
- সামাজিক নিরাপত্তা বিধান হয় এবং জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহন নিশ্চিত হয়।
- সাধারণত বড় বড় বিল/জলা বহুমালিকানাধীন অথবা বিল-ঝিল এলাকা, প্রবাহমান/বদ্ধ খাল, নদীর খাড়ি/মরা নদী, হাওড়/বাওড় এর অংশ বিশেষে স্থানীয় স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবিকার একমাত্র মাধ্যম থাকে বিধায় সমাজভিত্তিক চাষ কার্যক্রম জরুরী।
- সমাজভিত্তিক মাছ চাষের সাথে বিদ্যমান প্লাবনভূমিতে সঠিক পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চিংড়িচাষ সম্পৃক্ত করা গেলে ব্যাপক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভবপর হবে।
- চিংড়িমাছ মূল্যবান অর্থকরী ফসল হওয়ায় পেনে মাছ ও চিংড়ি চাষীগণ স্বল্প সময়ের মধ্যে আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারবে।
- সমাজভিত্তিক মাছ চাষে জলমহালনীতির সফল বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

সমাজের সকল শ্রেণী ও পেশার জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহন

- পেনে মৎস্য চাষ উদ্যোক্তা উন্নয়নের মজবুত ভিত্তি হচ্ছে গ্রামের সকল শ্রেণীর জনগণের অংশগ্রহন।
- জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান হয় এবং সঠিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।
- পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে-
  - উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহন
  - মৎস্যচাষীদের অধিকার সংরক্ষণ
  - জমির মালিকদের এ সমাজভিত্তিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহন নিশ্চিত হয়
  - স্বচ্ছল শ্রেণীর উদ্যোক্তাগন তাদের অর্থ শেয়ার/পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পৃক্ত হন।
- এলাকার ভূমিহীন, গরীব মৎস্যজীবিদের মৎস্য চাষ, খামার পরিচর্যা ও মৎস্য আহরণের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হয়। এছাড়া বাজারজাত ও পরিবহনের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয।
- শ্রমনিবিড় মৎস্য চাষ কার্যক্রমে দরিদ্র কৃষক এবং সম্পদহীন শ্রমজীবিদের সম্পৃক্ত করার সুবিধা থাকে।
- অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নিজেদের সুবিধামত দল অথবা সমবায় সমিতি বা যৌথ কোম্পানী গঠন করে সদস্যদের দ্বারা খামারের কারিগরি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।

সমাজভিত্তিক মাছ চাষের প্রকারভেদ

সমাজভিত্তিক মাছ চাষ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দু'ধরনের হতে পারেঃ

ক) সকল সদস্য সমিতি করে একত্রে চাষে অংশগ্রহন এবং

খ) সকল সদস্য একত্রিত হয়ে লীজ গ্রহনের মাধ্যমে মাছ চাষ।

সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষের সুফল

সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাওয়া যায়ঃ

১) নিজস্ব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার

২) কর্মসংস্থান সৃষ্টি

৩) দারিদ্র বিমোচন

৪) সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি
৫) স্থানীয় সম্পদ ও পুঁজির সমন্বয় সাধন
৬) পেশাজীবি শ্রেণীর সংখ্যা ও আয় বৃদ্ধি
৭) গ্রোথ সেন্টার সৃষ্টি
৮) এলাকার জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
৯) বন্যা প্লাবিত ভূমির সদ্ব্যবহার
১০) সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় মনোনিবেশ
১১) সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়ন
১২) সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও বৈষম্য হ্রাস পায়
১৩) আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন
১৪) খাদ্য নিরাপত্তা ও জনগোষ্ঠীর পুষ্টির যোগান
১৫) পরিবেশ দূষণ হ্রাস ও ভারসাম্য রক্ষা
১৬) মাছ ও চিংড়ি চাষের বিভিন্ন দিকের বিকাশ (হ্যাচারী, নার্সারী, পুকুরে চাষ, বরফ কল, ডিপো, আড়ৎ ও ফিডমিল)
১৭) গ্রামবাসীর আন্তঃসংযোগ উন্নয়ন
১৮) উন্নয়ন কার্যক্রমের সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি
১৯) নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি
২০) সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দ্বন্দ্ব হ্রাস
২১) জমির উর্বরতা ও ধানের ফলন বৃদ্ধি
২২) প্রকল্পের উপর জমির মালিকসহ ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মমত্ববোধ বৃদ্ধি
২৩) সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বা অবহেলিত অংশের স্বার্থ সংরক্ষণ
২৪) অভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হওয়ায় প্রকল্পের ঝুকি হ্রাস এবং
২৫) টেকসই কার্যক্রম।

সমাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা

লক্ষভূক্ত প্রকল্পটির পরিসর বৃহৎ হলে পরিচালনা পর্ষদ বা কমিটি/সমিতি গঠন করে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহন করা যেতে পারে। যৌথ মালিকানায় প্রকল্প পরিচালিত হলে প্রকল্পটির পরিচালনা পর্ষদ ৭, ৯, ১১, ১৩, ২১, ৩১ সদস্য বিশিষ্ট হতে পারে। প্রকল্পটি ৭ সদস্য বিশিষ্ট হলে তার কাঠামো নিম্নরূপ করা যেতে পারেঃ

ক) চেয়ারম্যান - ১ জন
খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক -১ জন
গ) পরিচালক - ৫ জন

পরচালনা পর্ষদ ৯ সদস্য বিশিষ্ট হলে কাঠামো হবে নিম্নরূপ

ক) সভাপতি - ১ জন
খ) সহ সভাপতি - ২ জন
গ) সেক্রেটারী - ১ জন
ঘ) কোষাধক্য - ১ জন
ঙ) কার্যকরী সদস্য - ৪ জন

অন্যান্য ক্ষেত্রে সকলের মতামতের ভিত্তিতে উপযুক্ত কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

আনুষঙ্গিক কাজের ক্রমঃ

ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন এলাকা যদি প্রকল্প এলাকা হিসেবে নির্বাচিত হয়, তাহলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কার্যক্রমে নিম্নে ধারাবাহিকতা অনুসরন করলে একটি টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে। অন্যদিকে নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা কোন সরকারী জলমহাল বা জলাশয় হলে অবশ্যই সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুমতি প্রাপ্তি, এ সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরন সাপেক্ষে কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রকল্প এলাকার ক্ষেত্রে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কাজের ক্রম নিম্নরুপ।

- জমির আয়তন, জমির মালিকের সংখ্যা এবং মৌজাসহ তালিকা নির্ণয়
- প্রকল্প এলাকায় মোট পুকুর, ডোবা, খাল প্রভৃতির সংখ্যা, আয়তন এবং মালিকের নাম ঠিকানা সহ তালিকা নির্ণয়
- প্রকল্পের অবকাঠামোর অবস্থা নিরূপন ও উন্নয়ন
- নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী
- পাহারাদার নিয়োগ

- বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন
- খাতভিত্তিক মোট খরচের প্রাক্কলন তৈরী
- মোট শেয়ারের সংখ্যা এবং প্রতি শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ
- প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্ব বন্টন
- মাছের পোনা অবমুক্তি
- সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
- মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ।

বাস্তবায়ন কৌশলঃ

- প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর প্রকল্প এলাকার জনসাধারণকে ডেকে সভা করে ইজারা ভিত্তিক পদ্ধতিতে ৩-৫ বছরের জন্য ইজারার মেয়াদ নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- ইজারা মূল্য হার এলাকাভেদে সুবিধামত জমি ও পুকুর/ডোবার সংখ্যা/সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ব্যাংক একাউন্ট ও শেয়ার বন্টন পদ্ধতিঃ

ক) **ব্যাংক একাউন্ট**

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রকল্প ম্যানেজার/সভাপতি ও কোষাধক্যের যৌথ স্বাক্ষরে একটি নিকটবর্তী সুবিধাজনক ব্যাংকে একাউন্ট খোলা এবং তার মাধ্যমে প্রল্পের আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনা করা যেতে পারে।

খ) **শেয়ার বন্ঠনঃ**

- সংশ্লিষ্ট বছরের কর্ম-পরিকল্পনা এবং বাজেটে খরচের হিসাব অনুসারে শেয়ারের পরিমান নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- সম্ভাব্য সুফলভোগীদের আর্থিক অবস্থা, এলাকার সামাজিক ও আর্থিক অবকাঠামো বিবেচনায় শেয়ারের মূল্যমান নির্ধারণ করা হলে কার্যক্রমটি অংশগ্রহনমূলক হবে।
- একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন শেয়ার গ্রহনের পরিমাণ কার্যকরী কমিটি কর্তৃক শেয়ার বন্ঠনের পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে।
- কমিটির সম্মানিত সদস্যদের শেয়ার গ্রহনের ক্ষেত্রে মোট শেয়ারের শতকরা কতভাগ সংরক্ষিত হবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে।
- বাকী শেয়ারসমূহ ভূমিহীন/বিত্তহীন, জমির মালিক, জেলেদের মধ্যে বিভাজন করা যেতে পারে।
- লভ্যাংশ হতে জমির লীজমূল্য পরিশোধ, ২৫% ব্যাংক একাউন্টে পরবর্তী বছরের খরচ চালানোর জন্য সঞ্চয় এবং ২-৩% এলাকার সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় করা যেতে পারে। বাকী লভ্যাংশ প্রত্যেক পুঁজির আনুপাতিক হারে ভাগ করা যেতে পারে।

জেলে সম্প্রদায় এর সুবিধা

- ১০-১৫ জন জেলে মাছ আহরণকালীন (২ মাস) জালটানার কাজ করতে পারেন। ফলে জেলেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আসবে।
- প্রতি গ্রামে জেলে দল গঠিত হবে এবং কর্মসংস্থানের মাধমে বেকারত্ব দূর হবে।

বিত্তহীন কৃষকগণ প্রকল্প হতে সুবিধা

প্রকল্প এলাকার বেশ কিছু সংখ্যক বিত্তহীন কৃষক ৬ মাসের জন্য এবং ২-৪ জন মাসিক ভিত্তিতে ৪০০০-৬০০০ টাকা পর্যন্ত বেতনে প্রকল্পে কাজ করতে পারবেন। এছাড়াও কমপক্ষে ৫০-১০০ জন কৃষক দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করতে পারবেন। এ সময় এলাকায় মাছ ধরা ছাড়া শ্রমিকদের তেমন কোন কাজ থাকে না।

সুফলভোগীগণের সুবিধা

প্রকল্প এলাকার প্রতিটি কৃষক যেভাবে সরাসরি সুফল ভোগ করতে পারবেন-

- প্রতি বিঘা জমির জন্য লিজ মূল্য প্রাপ্তি
- কৃষকের হাল চাষ এর প্রয়োজন হয় না
- আগাছা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয় না
- সেচের জন্য পানির সমস্যা হয় না
- ধান চাষে তেমন সারের প্রয়োজন হয় না।

পেনে মাছ চাষের উপযোগী স্থান নির্বাচন, পেন নির্মান কৌশল এবং মাছ চাষের জন্য জলাশয় প্রস্তুতিঃ

উপযোগী স্থান নির্বাচন

বিল-ঝিল এলাকা, প্রবাহমান/বদ্ধ খাল, নদীর খাড়ি/মরা নদী, হাওড়/বাওড় এবং বর্ষা-প্লাবিত জমিতে ধানের পরে এবং ধানের সাথে মাছচাষ কার্যক্রম জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে অত্র এলাকার গরীব চাষী, জেলে, দিনমজুর, ভ্যানচালক, কর্মক্ষম যুব-বেকারদের কাজে লাগিয়ে সামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব। পেনে মাছ ও গলদা চিংড়ী চাষ কার্যক্রমে প্রকল্প বেষ্টনী তৈরী করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নির্বাচিত এলাকার বিদ্যমান অবস্থা (এলাকার টপোগ্রাফি, পানির প্রবাহ, গভীরতা, সরকারী/ বেসরকারী বাঁধ, পার্শ্ববর্তী নদী/খাল, বেষ্টনী বাঁধ তৈরীর উপকরনের সহজলভ্যতা) বিবেচনা করতে হবে।

পেন নির্মাণ কৌশল

অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় গুরুত্ববহন করে তা নিম্নরূপঃ

- যে অঞ্চলে কমপক্ষে ৩-৮ মাস পানি থাকে এবং পানির গভীরতা ৩-১০ ফুট
- বেষ্টনী বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন নীতি অবলম্বন করতে হবে।
- এলাকাটি একাধিক গ্রাম দ্বারা বেষ্টিত কি না সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- স্থানীয় রাস্তা, খালের পাড়, নদীর পাড়, হালট ও বেষ্টনী বাঁধ কাজে লাগিয়ে প্রকল্প নির্মাণ করা।
- বড় রাস্তা থেকে সংযোগ সড়ক ব্যবহার করে বেষ্টনী অবকাঠামো নির্মাণ করা ।
- অবকাঠামো তৈরীর ক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচিত এলাকার নীচু এলাকা দিয়ে কমপক্ষে একটি স্লুইচ গেট নির্মাণ করতে হবে।
- অবকাঠামো তৈরীর ক্ষেত্রে বাঁধের উচ্চতা ও প্রস্থ্য এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে প্রকল্পটি বন্যামুক্ত হয়।
- অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কৃষকের আবাদি জমির ক্ষতি না হয়।
- বালি মাটি দিয়ে বাঁধ নির্মাণ পরিহার করতে হবে, কারন প্রতি বৎসর ভেঙ্গে যাবে এবং মেরামত ব্যয় বেড়ে যাবে।
- প্রকল্পের বেষ্টনী বাঁধে ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপনের দ্বারা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বেষ্টনী অবকাঠামো তৈরী পদ্ধতি

- সর্বোচ্চ বন্যার পানির স্তর থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট বেশী উচুঁ করতে হবে। বাঁধের ঢাল হবে ১ঃ২ অনুপাতে।
- চাষের সুবিধার্থে এবং বাঁধ নির্মাণ সহজতর না হলে সম্পূর্ণ নীচু এলাকাসমূহে প্রথমে বাঁশের শক্ত বাঁনা স্থাপন করতে হবে এবং বাঁনার উভয় পার্শ্বে ঘন নেট (পানি নির্গমনযোগ্য)/ জাল ব্যবহার করতে হবে।
- প্রকল্পটিতে বিদ্যমান কালভার্ট (ইনলেট এবং আউটলেট) এর পানি নির্গমন পথে পাটা/বানা স্থাপন ও নির্মাণ কৌশল–
  - স্রোত এর আগমন পার্শ্বে বক্রাকারে অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে এবং উভয় পার্শ্বে জাল ব্যবহার করতে হবে।
  - লোহার স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে।
  - পাটা স্রোতের বিপরীতে কিঞ্চিত হেলানো রাখলে দীর্ঘস্থায়ী হবে।
  - শুষ্ক মৌসুমে পাটা/বাঁনা স্থাপন বা মেরামতের কাজ পরিচালনা করতে হবে, নইলে পানি ভর্তি বা স্রোত থাকা অবস্থায় বাঁনা/পাটা স্থাপনে ঝুকি থেকে যাবে।
- বাঁধ নির্মাণে মাটির পানি ধারন ক্ষমতা ও গুনগতমান বিবেচনা করতে হবে।
- প্রকল্প এলাকায় তুলনামূলক উচুঁ জায়গায় বাঁধ নির্মাণ করলে নির্মাণ ব্যয় কম হবে।
- বাঁধের গোড়া থেকে বিদ্যমান বা খননযোগ্য গর্তের দূরত্ব হবে কমপক্ষে ২০ ফুট, যাতে বাঁধ ধ্বসে না পড়ে।
- প্লাবিত অবস্থায় বাঁধের সাথে কমপক্ষে ২০ ফুট চওড়া করে কচুরীপানা আটকে দিতে হবে যাতে ঢেউয়ে বাঁধের মাটি ভেঙ্গে না যায়।
- বাঁধ নির্মাণের সাথে সাথে বাঁধের উপর বিভিন্ন প্রকারের ঘাস লাগিয়ে দিতে হবে যাতে মাটি শক্তভাবে আটকে থাকতে পারে।

পেনে মাছ চাষে জলাশয় প্রস্তুতি

পেনে মাছ চাষের জন্য জলাশয় নির্বাচন

লক্ষ্যভূক্ত এলাকায় মাছ ও চিংড়ি চাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

- নিচু এলাকা যেখানে অন্তত ৩-৮ মাস ৩-১০ ফুট গভীরতায় পানি থাকে।
- নির্বাচিত এলাকা প্লাবনভূমি হলে শতকরা ১০ ভাগ এলাকায় কিছু নালা/গর্ত/পুকুর/কুয়া থাকলে ভাল হয়।
- নদী বা খালের সাথে সংযোগ থাকলে ভাল, তাতে বর্ষার পনি ঢুকানো এবং মাছ ধরার সময়ে পানি কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়।
- নদী বা খালের সাথে সংযোগ না থাকলে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হবে অথবা সেচের মাধ্যমে পানি প্রবেশ করাতে হবে।
- সামাজিক সম্প্রীতি বজায় আছে এবং সম্মিলিতভাবে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে উদ্যোগী/আগ্রহী এমন এলাকা।
- দুই বা তিনদিকে সড়ক বা বাঁধ আছে এরূপ এলাকা হলে ভাল হয়, তাতে বাঁধ নির্মাণ খরচ কম হবে।

- নদী/খাল/বাওড়/হাওড়ের অপেক্ষাকৃত কম গভীর এলাকা।
- ১ হেক্টর বা ১,০০০ হেক্টর হোক যে কোন আকারের স্থানেই এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা সম্ভব।

মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য প্রকল্প এলাকার প্রস্তুতি

ক. বাঁধ/উঁচু পাড় নির্মাণ/বানা স্থাপন

- নির্বাচিত প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান কালভার্ট এর স্রোতের আগমন পার্শ্বে বক্রাকারে বাঁশের বানা স্থাপন করতে হবে এবং বানার উভয় পার্শ্বে পানি নির্গমনযোগ্য জাল স্থাপন করতে হবে।
- প্রকল্প এলাকার অপেক্ষাকৃত নীচু এবং ঝুকিপূর্ণ এলাকায় বন্যামুক্ত বানা স্থাপন করতে হবে।
- রাস্তা উঁচু করা সম্ভব হলে পরবর্তী সময়ে পরিকল্পিতভাবে বাঁধ/রাস্তাটি উঁচু করতে হবে যাতে সহজে মাছ চাষ কার্যক্রমটি ঝুকিমুক্তভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়।

খ. স্লুইচগেট বা ইনলেট-আউটলেট নির্মাণ

প্রকল্প এলাকায় পানি প্রবেশ বা নির্গমনের জন্য এলাকাভেদে পানির চাপ ও প্রবাহ বিবেচনা করে প্রয়োজন অনুসারে ইনলেট ও আউটলেট নির্মাণ করতে হবে।

গ. গর্ত নির্মাণ

প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে একাধিক গভীর এলাকা (খাল/পুকুর/গর্ত) বিদ্যমান থাকলে নতুন করে গর্ত খননের প্রয়োজন হবে না। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রকল্প এলাকর মধ্যে কমপক্ষে ৫% গর্ত বর্তমান থাকে। নদী/খাল/বাওড় বা হাওড় এলাকার জন্য গর্ত নির্মানের প্রয়োজন নেই।

ঘ. জমি চাষ দেওয়া ও চুন বা চুন জাতীয় উপকরণ প্রয়োগ

- বর্ষা প্লাবিত এলাকায় প্রকল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে মার্চ-এপ্রিল মাসে ধান কেটে নেওয়ার পরপরই জমি প্রস্তুতের জন্য প্রথমে জমি ভালমত চাষ করতে হবে এবং ১-২ সপ্তাহ রোদে মুক্ত অবস্থায় রেখে শতাংশে চুন ১ কেজি অথবা জিওলাইট একরে ১৫-২০ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।
- লক্ষ্যভূক্ত এলাকা প্রবাহমান কোন নদী/খাল এর অংশ চুন বা সার প্রয়োগের প্রয়োজন নাই।
- মরা নদী বা বদ্ধ খাল বা অনুরূপ এলাকায় প্রকল্প নির্বাচিত হলে এবং এলাকাটির আয়তন ছোট হলে প্রথমে জলাশয়টির ভাসমান কচুরীপানা/টোপা পানা/সুজিপানা পরিস্কার করে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রকল্প এলাকায় মাছের খাবারযোগ্য বিভিন্ন শেওলা (ডুবন্ত/ভাসমান) থাকলে তা পরিস্কার না করাই উত্তম হবে।
- বর্ষাপ্লাবিত এলাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধান কাটতে বিলম্ব হলে জমিতে পানি চলে আসতে পারে সেক্ষেত্রে ধান কাটার পরপরই চুন/জিওলাইট প্রয়োগ করতে হবে।
- প্রকল্পে বিদ্যমান গর্ত বা নালাসমূহ সম্ভব হলে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকানো সম্ভব না হলে পানি থাকা অবস্থায়ই শতকে ১ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।
- চুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ১-২ ঘন্টা পূর্বে ৩ গুন পানিতে মাটির চাড়ি বা সুবিধাজনক পাত্রে ভিজিয়ে রোদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় সমস্ত জায়গায় সমানভাবে ছিটাতে হবে।

ঙ. সার প্রযোগ

- পেন এলাকাটি পানি ভর্তি হলে বা পানি স্লুইচ গেট দিয়ে ঢুকানো সম্ভব হলে স্রোতবিহীন এলাকায় প্রকল্পটিতে মাছ ও চিংড়ি চাষের নিবিড়তা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনে এবং মাটি পানির গুনাগুন বিবেচনা সাপেক্ষে চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর শতাংশ প্রতি নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারের নাম	মাত্রা
রাসায়নিক সার	গ্রাম/শতাংশ
ইউরিয়া	১৫০-২০০
টিএসপি	১০০
জৈব সার	কেজি/শতাংশ
কম্পোষ্ট	৮-১০

পেনে মাছ চাষের প্রজাতি নির্বাচন ও মজুদ ব্যবস্থাপনাঃ

মাছ ও চিংড়ির পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

- পোনার আকার
- সংখ্যা/মজুদ ঘনত্ব
- পোনার প্রাপ্যতা

- চাষের সময়কাল
- চাষ এলাকার উৎপাদনশীলতা
- পানির গভীরতা এবং
- প্রকল্প এলাকায় পোনার প্রাচুর্য্যতা

পোনা মজুদ ঘনত্ব

স্থানীয় মৎস্যচাষীদের অভিজ্ঞতার আলোকে দেশী বিদেশী কার্পজাতীয় মাছের পোনা এবং দেশিয় প্রজাতির মাছের পোনা মজুদ করা যেতে পারে। চিংড়ি থাকলে নিম্ন স্তরের কার্প জাতীয় মাছের পোনার মজুদ ঘনত্ব কমাতে হবে। আধাবদ্ধ চাষ এলাকার পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতার উপর ভিত্তি করে সকল স্তরের মাছের মিশ্রন ঘটালে ভাল ফল পাওয়া সম্ভবপর হবে।

শতাংশ প্রতি পোনা মজুদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মজুদ ঘনত্ব বিবেচনা করা যেতে পারে:-

খাদ্য স্তর	প্রজাতি	পোনার আকার (ইঞ্চি)	মজুদ ঘনত্ব (সংখ্যা)
সকল স্তরের তৃণভোজী মাছ	থাই সরপুঁটি/দেশি সরপুঁটি	১-১.৫	১-২
	গ্রাস কার্প	৮-১২	২-৩
উপরের স্তরের ফাইটোপ্লাংকটনভোজী মাছ	সিলভার কার্প/বিগহেড কার্প	৮-১২	৩-৪
	কাতল	৮-১২	২-৩
মধ্য স্তরের জৈবভোজী মাছ	রুই	৮-১২	৩-৪
	দেশি কৈ	১-১.৫	৪-৬
নিচের স্তরের অর্ধ পঁচা জৈবভোজী মাছ	মৃগেল	৮-১২	১-২
	চিংড়ি	২-৩	৫-৭
	শিং/দেশি মাগুর/আইড়	১-১.৫	৩-৪
অন্যান্য	যে কোন দেশিয় প্রজাতি	--	২-৩
মোট			২৬-৩৮

বিঃদ্রঃ বর্ণিত মজুদ ঘনত্বটি শুধুমাত্র যে সমস্ত চাষ ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত খাদ্য প্রয়োগ করা সম্ভবপর হবে সেখানে প্রয়োজ্য। খাদ্য প্রয়োগ সম্ভবপর না হলে একর প্রতি মোট সংখ্যা ১২০০-১৫০০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

পোনা মজুদের সম্ভাব্য সময়কাল

- সম্ভাব্য সময়কাল ঃ এপ্রিল-জুন
- প্রকৃত উৎপাদন কাল ঃ জুন-ডিসেম্বর

পেনে মাছের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রাকৃতিক জলাশয়গুলিতে প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান থাকে। প্রকল্প এলাকা হতে স্বল্প সময়ে অধিক মাছ উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রকল্প এলাকা যে সমস্ত কার্পজাতীয় মাছ সহ অন্যান্য দেশিয় প্রজাতির মাছ মজুদে ক্ষেত্রে খাদ্যে প্রোটিনের মাত্রা ২২-২৫% হলেই কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া সম্ভবপর হবে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান এমনভাবে মিশাতে হবে যাতে খাদ্যে প্রেটিনের পরিমাণ ২২-২৫% পাওয়া সম্ভবপর হয়।

ক. খাদ্য উপাদান

কার্প জাতীয় মাছের জন্য-

- খৈল (সরিষা/সয়াবিন)
- ধানের কুড়া
- গমের ভুষি
- ভুট্টার গুড়া
- লবন
- ভিটামিন
- চিটাগুড় এবং
- ফিশমিল

গ্রাস কার্প এবং সরপুঁটির জন্য-

- নরম সবুজ কচি ঘাস
- কলাপাতা
- কুটি বা ক্ষুদিপানা/অ্যাজোলা

খ. খাদ্যের পরিমাণ

মাছের মোট ওজনের ৩-৫% হিসেবে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। তবে খাদ্য প্রয়োগের সময় কাতলা, সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প ও গ্রাস কার্পের ওজন বাদ দিতে হবে।

গ. খাদ্য প্রয়োগের সময়

প্রতিদিন সকালে বা বিকালে খাদ্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে প্রজাতি ভেদে খাদ্য প্রয়োগের সময় ভিন্নতর হতে পারে।

ঘ. খাদ্য প্রয়োগের স্থান

- আয়তন অনুযায়ী কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রয়োগ করতে হবে।
- প্রতি ১ বা ২ একরের জন্য চারটি স্থান হওয়া ভাল।
- প্রকল্প এলাকার স্রোত প্রবাহমান এলাকায় খাদ্য প্রয়োগ পরিহার করতে হবে।
- ৩-৪ ফুট গভীর এলাকায় প্রয়োগ করলে ভাল পাওয়া যাবে।

ঙ. খাদ্য প্রস্তুত ও প্রয়োগ পদ্ধতি

- রুই জাতীয় মাছের সম্পূরক খাদ্য হিসেবে সাধারণত চাউলের কুড়া বা গমের ভূষি এবং সরিষার খৈল ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সরিষার খৈল দ্বিগুণ পরিমাণ পানির সহিত ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং খৈলের সমপরিমাণ চাউলের কুড়া বা গমের ভূষি মিশিয়ে গোলাকার বল তৈরী করতে হবে।
- খাদ্য তৈরীর উপাদানের সাথে পরিমানমত চিটাগুড় মেশালে খাদ্যের মান ভাল হবে এবং বল তৈরী করতেও সুবিধা হবে।
- শতকরা ৩-৫ ভাগ হারে দৈনিক খাবার দিলেই চলবে।
- খাদ্য প্রতিদিন একটি নিদিষ্ট জায়গায় ব্যবহার করতে হবে।
- খাদ্যে ০.৫% ভিটামিন এবং ১-২% আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

সুষম খাদ্য তৈরী সারণীঃ

ক্র.নং	খাদ্য উপাদান	শতকরা হার
১	খৈল (সরিষা/সয়াবিন)	৩৫
২	ধানের কুড়া	৩০
৩	গমের ভুষি/ভুট্টার গুড়া	২৫
৪	ফিশমিল	১০
		(গ্রাম/কেজি)
৬	লবণ	১০
৭	ভিটামিন	১-২
৮	চিটাগুড়	১০

সার প্রয়োগ

পরিমিত পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত পেনে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে, পানির কোন প্রবাহ নাই এবং প্রকল্পের আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট সেখানে নিয়মিত সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। সার প্রয়োগের পূর্বে পানিতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক প্রয়োগ করতে হবে। পানির রং হালকা সবুজ বা হালকা বাদামী সবুজ হলে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে বলে বিবেচিত হবে। পানি বর্ণহীন এবং ধুসর বর্ণের হলে সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রতি ৭ দিন বা প্রতি ১৫ দিন অন্তর শতাংশে নিম্নলিখিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে-

সারের নাম	মাত্রা	
	৭ দিন পর	১৫ দিন পর
রাসায়নিক সার	গ্রাম/শতাংশ	গ্রাম/শতাংশ
ইউরিয়া	৪০	৮০
টিএসপি	৩০	৬০
জৈব সার	কেজি/শতাংশ	কেজি/শতাংশ
খৈল	০.৫	১

উল্লেখিত সার (টি এস পি এবং গোবর/কম্পোষ্ট) ৩ গুন পানির সাথে মিশিয়ে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং পরবর্তী দিন রোদ্রোজ্জ্বল দিনে সূর্যালোকিত স্থান সমূহে প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে ইউরিয়া আলাদাভাবে অথবা প্রয়োগের পূর্বে অন্যান্য সারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পেনে মাছ চাষের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

পেনে মাছ ও চিংড়ি চাষের সাধারণ সমস্যা ও প্রতিকার

পেনে মাছ চাষের সাধারণ সমস্যা

১) মাছের খাবি খাওয়া
২) মাছ চুরি
৩) প্রাকৃতিক বিপর্যয় (বাঁধ/পাড় ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা)
৪) সামাজিক/রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা
৫) অভ্যন্তরীণ কোন্দল/ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি
৬) মাছের রোগ বালাই
৭) চিংড়ির রোগ বালাই
৮) মাছের বিপনন

১) মাছের খাবি খাওয়া এবং চিড়ির পাড়ে চলে আসা

কারণঃ

- অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে
- মজুদ ঘনত্ব বেশী হলে
- অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করলে
- পেনে অতিরিক্ত জৈব পদার্থের পঁচন
- পানির গভীরতা হ্রাস পেলে
- পানির ঘোলাত্ব বেড়ে গেলে এবং
- পানির উপর সবুজ বা লাল স্তর জমা হলে।

প্রতিকারঃ

- বাঁশ পিটিয়ে/সাঁতার কেটে/পাতিলের মাধ্যমে ঢেউ সৃষ্টি করে অক্সিজেন সরবরাহ করা যাবে।
- খাল/নদী হতে পরিষ্কার পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানির গভীরতা বৃদ্ধি এবং কৃত্রিমভাবে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করা।
- খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখার পাশাপাশি মজুদ ঘনত্ব কমিয়ে ফেলা।
- বাজারে প্রাপ্ত অক্সিজেন ট্যাবলেট/পাউডার প্রয়োগ করা যেতে পারে (৩-৬ ফুট গভীরতায় ২৫০-৩৫০ গ্রাম/একর, তীব্র অক্সিজেন সংকটে ৫০০ গ্রাম/একর)।
- শতক প্রতি প্রতি তিন ফুট পানির গভীরতার জন্য ২০০-২৫০ গ্রাম হারে চুন (পাথুরে চুন) প্রয়োগ করা যেতে পারে।

চুরি

এটি একটি সাধারণ সামাজিক ঝুঁকি, পেন পার্শ্ববর্তী সাধারণ বসবাসকারীদের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে না পারলে এ ঝুঁকি বেড়ে যায়।

করণীয়

- আয়তনভেদে গার্ডসেড নির্মাণ এবং সংখ্যা নির্ধারণ ও সার্বক্ষনিক পাহারার ব্যবস্থা করা।
- পেন পার্শ্ববর্তী সাধারণ বসবাসকারীদের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।
- বিত্তহীন, ভূমিহীন এবং জেলেদের পেনের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ।
- আংশিক আহরণের ব্যবস্থা করা।
- পেনের ফাঁকা জায়গাগুলোতে বাঁশের কঞ্চি, গাছের শুকনো ডালপালা পুঁতে রাখা।
- পার্শ্ববর্তী বসবাসকারীগনের সাথে সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো।

প্রাকৃতিক বিপর্যায় (বাঁধ/পাড় নিয়ন্ত্রণ)

প্রবল বর্ষণ, অনাবৃষ্টি, বন্যা, নিচু বাঁধ, প্রবল জোয়ার, বাঁধে আলগা মাটি এবং জলোচ্ছ্বাসে পেনে মাছ চাষ কার্যক্রমটিকে ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিশ্চিত করতে পারলে পেনে মাছ চাষ অনেকটাই ঝুঁকিমুক্ত থাকবে।

- ব্যয় এবং প্রাকৃতিক ঝুঁকি কমানোর জন্য সম্পূর্ণ বানা ব্যবহার করে মাছ চাষ করতে হয় এমন স্থান চাষের জন্য নির্বাচন না করা।

- বেষ্টনী বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ মাথায় রাখা।
- এলাকাটি একাধিক গ্রাম দ্বারা বেষ্টিত কি না সেদিকে খেয়াল রাখা।
- স্থানীয় রাস্তা, খালের পাড়, নদীর পাড়, হালট ও বেষ্টনী বাঁধ কাজে লাগিয়ে প্রকল্প নির্মাণ করা।
- বড় রাস্তা থেকে সংযোগ সড়ক ব্যবহার করে বেষ্টনী অবকাঠামো নির্মাণ করা ।
- অবকাঠামো তৈরীর ক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচিত এলাকার নীচু এলাকা দিয়ে কমপক্ষে একটি স্লুইচ গেট নির্মাণ করা।
- অবকাঠামো তৈরীর ক্ষেত্রে বাঁধের উচ্চতা ও প্রস্থ এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে প্রকল্পটি বন্যামুক্ত হয়। সর্বোচ্চ বন্যার পানির স্তর থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট বেশী উচুঁ করতে হবে। বাঁধের ঢাল হবে ১ঃ২ অনুপাতে।
- অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কৃষকের আবাদি জমির ক্ষতি না হয়।
- বালি মাটি দিয়ে বাঁধ নির্মাণ পরিহার করতে হবে, কারন প্রতি বৎসর ভেঙ্গে যাবে এবং মেরামত ব্যয় বেড়ে যাবে।
- প্রকল্পের বেষ্টনী বাঁধে ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপনের দ্বারা একদিকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যায় অন্যদিকে বাড়তি আয় করা ও সম্ভবপর হয়।
- চাষের সুবিধার্থে এবং বাঁধ নির্মাণ সহজতর না হলে সম্পূর্ণ নীচু এলাকাসমূহে প্রথমে বাঁশের শক্ত বাঁনা স্থাপন করতে হবে এবং বাঁনার উভয় পার্শ্বে ঘন নেট (পানি নির্গমনযোগ্য)/জাল ব্যবহার করা।

সামাজিক/রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা

বৃহত্তর পরিসরে পেনে মাছ চাষ কার্যক্রম বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম হিসেবে পরিচালিত হয়। কার্যক্রমটিকে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে নানাবিধ সামাজিক/রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সচেতন থাকলে সহজেই সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা যাবে।

- জমির মালিকদের সাথে যথাযথভাবে ন্যুনতম ৫-১০ বৎসরের জন্য জমি ব্যবহারের জন্য চুক্তি সম্পাদন।
- নির্বাচিত পেন এলাকা সরকারী সম্পত্তি হলে, জলমহাল নীতিমালা অনুসরন পূর্বক লীজ গ্রহন, চুক্তি সম্পাদন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ পূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং ভূমিহীন/বিত্তহীনদের কার্যক্রমে অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণ।
- শেয়ার বন্ঠনে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং এককভাবে কোনো প্রভাবশালীকে অধিক শেয়ার না দেওয়া।
- স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং সামাজিকভাবে প্রভাবশালীদের কার্যক্রমটির সাথে ইতিবাচকভাবে অংশগ্রহন করানো।
- অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করা এবং নির্ধারিত নিয়মের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী/বেসরকারী প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে মাছ বিক্রয়ের টাকা বন্ঠন করা।
- সুফলভোগী নির্বাচনে দলীয় প্রভাবের উর্দ্ধে দল মত নির্বিশেষে সতর্কতা অবলম্বন করে প্রকৃত ভুক্তভোগীদের নির্বাচন নিশ্চিত করা।

অভ্যন্তরীণ কোন্দল/ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি

পেনে মাছ চাষ কার্যক্রমে বেশীরভাগক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা এবং কারিগরিভাবে অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয় বলে ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় এবং কার্যক্রমসমূহের মান নিম্নমুখী হয় এবং সামাজিক বিশৃংখলা দেখা যায়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য/নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অতি লোভের কারনে আর্থিক বিষয়ে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়, ফলে দলের মধ্যে কোন্দল দেখা যায় এবং কার্যক্রমটি গতি হারায়। নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিশ্চিত করলে সমস্যাসমূহ পরিহার করা যায়।

- সৎ, যোগ্য, পরিশ্রমী এবং গতিশীল নেতৃত্বে পারদর্শী এমন লোককে ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব প্রদান।
- নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করা এবং সভায় বিগত সভা হতে বর্তমান সভা পর্যন্ত সকল খরচের হিসাব বিবরণী ভাউসার সহ কমিটি এবং সুফলভোগীদের অবগত করানো।
- প্রতি মাসের আয় এবং ব্যয়ের হিসাব মাসের প্রথম সপ্তাহে নোটিশ বোর্ডে সভাপতির স্বাক্ষরসহ উপস্থাপন করা।
- মাছ বিক্রয়ের অর্থ মাছ বিক্রয়ের সাথে সাথে নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান নিশ্চিত করা।
- ব্যবস্থাপনাগত কোন অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে সাধারণ সভায় বিষয়টি উপযুক্ত প্রমানাদিসহ উপস্থাপন করা।
- সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিকট জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পে সমবায়/মৎস্য অধিদপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করা।
- প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য ও উপাত্ত যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং উপস্থাপন করা।
- মাছ বিক্রয় পরবর্তী সুফলভোগী এবং জমির মালিকদের মধ্যে নির্ধারিত চুক্তিপত্রের আলোকে বন্ঠন নিশ্চিত করা।

পেনে মাছ চাষের রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

মাছের রোগ বালাই, লক্ষণ ও প্রতিকার

রোগের নাম	আক্রান্ত মাছের প্রজাতি	সম্ভাব্য কারণ	রোগের লক্ষণ	সময়কাল	প্রতিকার	প্রতিরোধ
ক্ষত রোগ (ইপিজুটিক আলসারেটিভ সিনড্রোম)	অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের সকল মাছ	দূষিত পরিবেশ ও জৈব পদার্থের উপস্থিতি (ছত্রাক)	মাছের দেহের বিভিন্ন অংশে ঘাঁ হয়	শীতকাল	শতাংশে ০.৫ কেজি চুন ও ০.৫ কেজি লবন হারে সপ্তাহে ১ বার ২ সপ্তাহ প্রয়োগ করতে হবে।	কার্যক্রমের শুরুতে শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। এবং প্রতি মাসে শতাংশ প্রতি ৫০০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ কতে হবে।
লেজ ও পাখনা পঁচা রোগ	স্বাদু পানির রুই জাতীয় মাছ, শিং ও মাগুর জাতীয় মাছ।	অতিরিক্ত জৈব পদার্থের উপস্থিতি (ব্যাকটেরিয়া)	লেজ ও পাঁখনা পঁচে যেতে পারে, পাখনা ছিড়ে সাদা হয়ে যায়	গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল	-শতাংশে ২৪-৩৬ গ্রাম/ফুট পানির গভীরতায় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ করা যেতে পারে। -শতাংশ প্রতি ৬ গ্রাম/ফুট পানির গভীরতায় তুঁতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।	প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ এবং জৈব সার প্রয়োগ বন্ধ রাখা।
মাছের লাল ফুটকি রোগ	সিলভার কার্প এ রোগে বেশী আক্রান্ত হতে পারে।	পুকুরের তলায় বেশী কাঁদা ও অতিরিক্ত মজুদ ঘনত্ব	দেহের বিভিন্ন অংশে লাল-দাগ দেখা যায়, দাগগুলোতে টিপ দিলে রক্তের মত বের হয়	শীতকালের পরপরই	-শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। -শতাংশে ২৪-৩৬ গ্রাম/ফুট পানির গভীরতায় পটাশিয়াম প্যারম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ করা যেতে পারে । -মজুদ ঘনত্ব হ্রাস করতে হবে।	প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ এবং জৈব সার প্রয়োগ বন্ধ রাখা।
মাছের ফুলকা পঁচা রোগ	চাইনিজ কার্প এবং দেশীয় কার্প জাতীয় মাছ বেশী আক্রান্ত হতে পারে	ছত্রাক ও পুকুরের তলায় বেশী কাঁদা	ফুলকায় লাল দাগ দেখা যায়, পরে ফুলকাটি সাদা হয়ে যায় এবং অকর্মন্য হয়ে পড়ে	বছরের প্রায় সব সময়ই	-শতাংশে ০.৫ কেজি চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। -আক্রান্ত মাছকে ২-৩% লবন জলে ৩-৫ মিনিট গোসল করালে ভাল হবে।	পঁচা কাদা অপসারন, অতিমাত্রায় জৈব পদার্থ প্রয়োগ না করা।
পরজীবী (ট্রাইকোডিনা)	সব ধরনের মাছ	এক কোষী পরজীবীর আক্রমন	ফুলকায় হলদে গুটি, মাছ ঘন ঘন মুখে পানি নেবে, ফুলকায় রক্তক্ষরণ	শীতকাল	-১০০০ লিটার পানিতে ২৫-৩০ মিঃ লি ফরমালিন মিশিয়ে সেখানে ৩০-৬০ মিনিট মাছকে গোসল করানো। -১০ লিটার পানিতে ১০০-২০০ গ্রাম লবণ দ্রবীভূত করে ১-২ মিনিটের জন্য গোসল করানো।	

পুষ্টিহীনতা	সব ধরনের মাছ	পুষ্টিকর, খনিজযুক্ত সুষম খাদ্যের অভাব	দেহ বেঁকে যাওয়া, লেজের অংশ বেঁকে যাওয়া		-দেহ বা লেজ বেঁকে গেলে প্রতিকারের উপায় নেই।	সুষম খাদ্য প্রয়োগ, খনিজ ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য প্রয়োগ।
পেট ফোলা রোগ	রুই জাতীয় মাছ, শিং ও মাগুর ইত্যাদি।	পুকুরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থের উপস্থিতি (ব্যাকটেরিয়া)	পেট ফুলে বেলুনের মতো হয়ে যায়, পেটে ও আঁইশের নীচে পানি জমে যায়, চামড়ায় ঘাঁ হয় এবং অন্ত্র ফুলে যায়	গ্রীষ্মকাল	-প্রতিকেজি খাদ্যে ২০০ মিঃ গ্রাঃ ক্লোরামফেনিকাল প্রয়োগ করা যেতে পারে। -সিরিঞ্জ দিয়ে পেটের পানি বের করে নিতে হবে অতঃপর ২.৫% লবণ পানিতে ৩-৫ মিনিট মাছকে গোসল করাতে হবে।	সুষম খাদ্য প্রয়োগ, শতাংশে ১ কেজি চুন প্রয়োগ, মজুদ ঘনত্ব কমিয়ে রাখা এবং জৈব সার কম দেওয়া।

চিংড়ির রোগের সাধারণ লক্ষণ

রোগের প্রকারভেদ ও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা পরজীবীর আক্রমণের ধরন অনুযায়ী রোগাক্রান্ত চিংড়ির মাঝে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে রোগাক্রান্ত চিংড়ির মধ্যে যে সমস্ত লক্ষণ ও আচরণ বেশি দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে-

- ঠিকমত খাদ্য গ্রহণ করে না
- ধীর গতিতে চলাচল করে
- এলোমেলোভাবে পানির উপর সাঁতার কাটতে থাকে
- পাড়ের কাছাকাছি খাবি খায়, কখনও পাড়ে উঠে আসে
- খোলস নরম হয়ে যায়
- ফুলকায় কালো দাগ দেখা যায়
- খোলসের উপর নীলাভ রং/শেওলা জমে যায়
- হাঁটার অংগ ও এন্টিনা খসে পড়ে অথবা বাঁকা হয়ে যায়।

নিচে চিংড়ির কিছু সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

এন্টেনা ও সন্তরণ পদ খসে পড়া

কারণ ঃ ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ
লক্ষণ ঃ মজুদের ৩-৪ মাস পর এন্টেনা, সন্তরণ পদ খসে অথবা ঝরে পড়তে থাকে
প্রতিকার ঃ

- সাময়িকভাবে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখা
- পিএইচ পরীক্ষা করে ২৫০-৩০০ গ্রাম/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ।

খোলস শক্ত হয়ে যাওয়া

কারণ ঃ পরিবেশগত; পিএইচ, লবণাক্ততা বা তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে খোলস পাল্টায় না, শক্ত হয়ে যায়
লক্ষণ ঃ

- খোলস স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে শক্ত
- বয়সের তুলনায় চিংড়ির কম দৈহিক বৃদ্ধি

প্রতিকার ঃ

- পানির পরিবেশ উন্নয়ন
- পরিবেশের যে কোন হঠাৎ পরিবর্তন যেমন- পানির উচ্চতা বৃদ্ধি অথবা রাসায়নি সার প্রয়োগ

ক্যারাপেস ও শরীরের উপর পাথর জমা

কারণ ঃ পরিবেশগত যে কোন গুনাগুনের তারতম্যের কারণে এটা হয়ে থাকে। বিশেষ করে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এটা বেশি হতে দেখা যায়
লক্ষণ ঃ করাত ও ক্যারাপেস অংশে ধুসর রংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর দেখা যায়

প্রতিকার ঃ

- পুকুরের পানি পরিবর্তন
- স্বাদু পানির সরবরাহ বৃদ্ধি
- পানির গভীরতা বৃদ্ধি

নরম খোলস বা স্পঞ্জের মত দেহ

চাষাবাদের মাঝামাঝি সময়ে প্রায়ই চিংড়ির এ রোগ দেখা দেয়

কারণ ঃ

- পানিতে ক্যালসিয়াম কমে যাওয়া
- এ্যামোনিয়া ও তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া
- পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব
- অনেকদিন পানি পরিবর্তন না করা

লক্ষণ ঃ

- খোলস নরম হয়ে যায়
- পা লম্বা ও লেজ ছোট হয়
- দেহ ফাঁপা হয়ে স্পঞ্জের মত হয়

প্রতিকার ঃ

- পুকুরে ২-৩ মাস অন্তর শতাংশ প্রতি ০.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ
- খাবারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি

খোলস পাল্টানোর পর মৃত্যু

কারণ ঃ খাদ্যে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, ফ্যাটি এসিড, আমিষ এবং খনিজ দ্রব্যের অভাব

লক্ষণ ঃ

- দেহ নরম থাকে এবং রং নীলাভ হয়ে যায়
- মৃত চিংড়ি রান্না করলে রং হালকা কমলা বর্ণ ধারণ করে। উল্লেখ্য যে সুস্থ চিংড়ি রান্না করলে রং লাল হয়।

প্রতিকার ঃ খাদ্যের সংগে ৫০ মিলি গ্রাম/কেজি হারে ভিটামিন প্রিমিক্স প্রয়োগ।

গায়ে শেওলা পড়া

কারণ ঃ খোলস পরিবর্তন না করা ও চিংড়ির চলাফেরার গতি কমে যাওয়া

লক্ষণ ঃ চিংড়ি ধরার পর সারা দেহে সবুজ শেওলা দেখা যায়

প্রতিকার ঃ পানি বাড়িয়ে দিতে হবে এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে

চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

চাষির আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উপকরণের সহজ প্রাপ্যতা, চাষ এলাকার ব্যাপকতা ও চিকিৎসা পদ্ধতির জটিলতার কারণে চিংড়ির রোগ নিরাময় অনেকটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। গলদা চিংড়ির রোগ প্রতিকার এর চেয়ে রোগ প্রতিরোধই অধিক শ্রেয়। চাষের শুরুতেই নিচের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে চিংড়ির রোগ চিকিৎসার মত ঝুকিপূর্ণ বিষয় পরিহার করা যেতে পারে-

- সম্ভব হলে পেনের অভ্যন্তরীন এলাকার দৃশ্যমান ময়লা আবর্জনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অধিক মজুদ ঘনত্ব পরিহার করা
- চাষের শুরুতে চুন প্রয়োগ
- বাইরের অবাঞ্ছিত প্রাণী প্রবেশ রোধ করা
- পেন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে হলে পরিমিত সার ও খাদ্য সরবরাহ করা

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

- পোনা মজুদের পর হতে প্রতি মাসে ১ বার করে মাছের নমুনায়ন করতে হবে। এতে মাছের সংখ্যা, বৃদ্ধি, সুস্থতা সহ নানা বিষয়ে ধারনা পাওয়া যাবে এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া সম্ভবপর হবে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০৩	অধিবেশন নং-০২	সময়: ১১:৩০-১২:০০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম : **ইলিশ মাছ পরিবহন , বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন,মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।**

অভীষ্ট দল: বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নির্বাচিত সুফলভোগী জেলে

লক্ষ্য: অংশগ্রহণকারীদের মাছের আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যাতে তারা নিজেরা মাছের আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনার সময় অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাতে পারেন।

উদ্দেশ্য:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- মাছের আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনা কী তা বলতে পারবেন;
- মাছের আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- তাজা মাছ কী তা বলতে পারবেন এবং এর বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে পারবেন ;
- মাছের পচন, পচনের কারণ এবং পচন রোধে করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মাছে বরফ দেয়ার গুরুত্ব ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	গময়
ভূমিকা			০৫ মিনিট
	১. স্বাগত জানানো, কুশল বিনিময় ২. পূর্ববর্তী অধিবেশনের সূত্র ধরে বর্তমান অধিবেশনের অবতারণা। (প্রধান শিক্ষণ বিষয়: মাছের আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনা) ৩. বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত (শিরোনাম) ৪. বর্তমান অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ (উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব)	প্রশ্নোত্তর পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৪৫ মিনিট
	- মাছের আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনা কী? - মাছের আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব; - তাজা মাছ কী? - মাছের পচন, পচনের কারণ এবং পচন রোধে করণীয়; - মাছে বরফ দেয়ার গুরুত্ব ও পদ্ধতি; - বাজারজাতকরণ ও ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট তৈরী।	প্রশ্নোত্তর প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট	
সার-সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	১. মূল বিষয়ের পুনরালোচনা (প্রধান শিক্ষণ বিষয়গুলি) ২. উদ্দেশ্য যাচাই (অধিবেশনের উদ্দেশ্য); ৩. হ্যান্ড আউট বিতরণ ও পড়ানো; ৪. ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং পরবর্তি অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা দেয়া।	প্রশ্নোত্তর/ পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : পাওয়ার পয়েন্ট/ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

ইলিশ মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণের পদ্ধতি উন্নয়ন,মান নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি সম্ভাবনা

ইলিশ মাছ পরিবহন

ইলিশ মাছ দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নদ-নদীর মোহনা এলাকা এবং সমুদ্র হতে ধরা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে আহরিত প্রায় ৮০% ভাগ ইলিশ মাছ সমুদ্রে ধরা পড়ে। সমুদ্র হতে কাঠের নির্মিত ফিসিং ট্রলার বা মেকানাইজড বোট নিয়ে ইলিশ মাছ ধরা হয়ে থাকে। সাধারণত ১২-১৫ জনের জোলেদল ১০-১৫ দিনের খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় জল এবং বরফ নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য হয়। অমাবস্যা বা পূর্ণিমাকে সামনে রেখে জেলেদল সমুদ্রে যাত্রা করে থাকে। ধৃত ইলিশ মাছ সংরক্ষণের জন্য ফিসিং ট্রলারে ইনসুলেটের স্টোর থাকে। জেলেরা যুক্ত মাছ বরফ নিয়ে ঐ স্টোরে সংরক্ষণ করে। অতঃপর মাছ ধরা শেষ হলে বা তাদের খাদ্য ও পানীয় জল শেষ হলে মাছ বিক্রির জন্য তীরে ফিরে আসে। অনেক সময় সমুদ্র হতে বহনকারী নৌকা বা ক্যারিয়ার বোটে করেও মাছ তীরের আড়তদার পর্যন্ত বহন করা হয়। তীরে আসার পর জেলেরা সাধারণত মাছ পাইকারি বাজারের আড়তদারের মাধ্যমে বিক্রি করে। আড়তদারের নিকট হতে স্থানীয় পাইকার, খুচরা বিক্রেতাগণ মাছ ক্রয় করে রিকসা, ভ্যান অথবা সরাসরি নিজেরা বহন করে মাছ স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে। অন্যান্য পাইকার এবং রপ্তানীকারকগণ আড়ত হতে মাছ ক্রয়পূর্বক বরফ দিয়ে প্রাপ্যতা অনুযায়ী সুবিধামতো পরিবহন যথা- লঞ্চ, মেকানাইজড বোট, ট্রাক ও ট্রেন যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে থাকে।

অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে ধৃত মাছ অনেক সময় জেলেরা সরাসরি নিজেরা খুচরা বাজারে বা পাইকারি বাজারে আড়তদারের নিকট বিক্রয় করে। আবার কখনও কখনও নিজস্ব মহাজনের ক্যারিয়ার বোটের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে থাকে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের জেলেরা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাছ ধরার পর মাছ সরাসরি খুচরা বাজারে অথবা পাইকারি বাজারে আড়তদারের মাধ্যমে বিক্রি করে থাকে। মাছ ধরার স্থান হতে পাইকারি বাজার ও দেশের বিভিন্ন স্থানে ইলিশ মাছ পরিবহনের পদ্ধতি নিজের রেখাচিত্রে দেখানো হলো।

ইলিশ মাছের প্রধান অবতরণ কেন্দ্রঃ

বাংলাদেশে ইলিশ মাছের প্রধান প্রধান অবতরণ কেন্দ্রের নাম নিচে দেয়া হলো:

১) কক্সবাজার, ২) চট্টগ্রাম, ৩) টেকনাফ, ৪) কুতুবদিয়া ৫) হাতিয়া, ৬) সন্দ্বীপ, ৭) ভোলা, ৮) পটুয়াখালী, ১০) খেপুপাড়া, (১১) মহিপুর, ১২) কুয়াকাটা, ১৩) পাথরঘাটা, ১৪) খুলনা, ১৫) চাঁদপুর, ১৬) ঢাকা, ১৭) গোয়ালন্দ

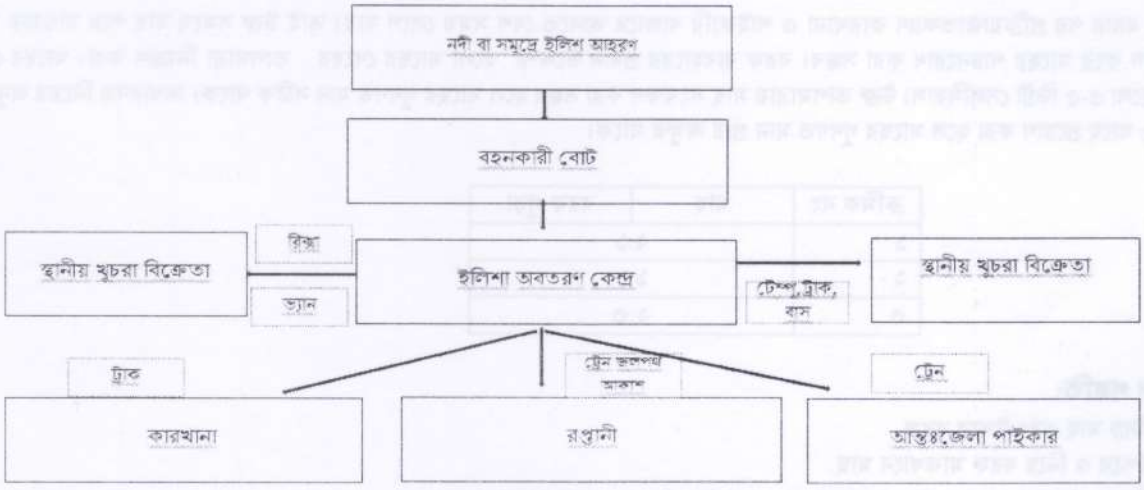

চিত্রঃ ইলিশ মাছের পরিবহন পদ্ধতি।

বাজারজাতকরণের পদ্ধতি ও নেটওয়ার্কঃ

ইলিশ মাছ বিভিন্ন স্থান হতে ধরার পর ওপরে আলোচিত পদ্ধতিতে দেশের বিভিন্ন বাজারে পরিবহন করা হয়। ইলিশ মাছের বিভিন্ন বাজারকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা

- প্রাথমিক বাজার
- মাধ্যমিক বাজার
- উচ্চ মাধ্যমিক বাজার
- সর্বশেষ বাজার
- বিদেশের রপ্তানি বাজার

প্রাথমিক বাজার:

এই বাজার নদী এবং উপকূলীয় এলাকায় মাছ ঘাট অথবা অবতরণ কেন্দ্রে হয়। জেলেরা মাছ ধরার পরে অবতরণ কেন্দ্রে আসে মাছ বিক্রির জন্য। আড়তদার অথবা মহাজনরা নিলামের মাধ্যমে স্থানীয় পাইকারের নিকট মাছ ভিত্তি করে। অনেক সময় আড়তদার অথবা মহাজনকে না জানিয়ে জেলেরা আংশিক ধৃত মাছ নদীতে ভাসমান পাইকার অথবা বেপারির নিকট বিক্রি করে থাকে।

মাধ্যমিক বাজার:

প্রাথমিক বাজার হতে ক্রয়কৃত ইলিশ মাছ আন্তঃজেলা পাইকার অথবা বেপারিগণ দেশের মাধ্যমিক বাজারে অপেক্ষাকৃত বড় আড়তদার অথবা কমিশন এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রয় করে থাকে।

উচ্চ মাধ্যমিক বাজার:

খুচরা বিক্রেতাগণ মাধ্যমিক বাজার হতে ক্রয়কৃত ইলিশ মাছ স্থানীয় বাজারে ভোক্তার নিকট বিক্রি করে। এখান হতে কিছু মাছ পাইকার গণ ক্রয় করে পুনরায় দেশের অন্যান্য বাজারে প্রেরণ করে এবং কিছু কিছু মাছ বিদেশেও রপ্তানি করে।

সর্বশেষ বাজার:

পাইকাররা উচ্চ মাধ্যমিক বাজার হতে মাছ ক্রয় করে খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রি করে। খুচরা বিক্রেতা আবার দুই ধরণের হয়। একটি হলো শহর অঞ্চলের এবং অন্যটি উপশহর অথবা গ্রাম বাজার অঞ্চল। এইভাবে ইলিশ মাছ সর্বশেষে ভোক্তার নিকট পৌঁছে।

বিদেশের রপ্তানি বাজার:

বিদেশে রপ্তানির জন্য সাধারণত প্রাথমিক বাজার বা অবতরণ ক্ষেত্র হতে পাইকার, আড়তদারগণ মাছ বাছাই করে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাছ ক্রয় করে। অতঃপর মাছ বরফ দিয়ে দেশের প্রচলিত পদ্ধতিতে প্যাকিং করে রপ্তানির জন্য সমুদ্র বন্দর, আন্তঃদেশীয় সীমান্ত শহরের চেক পয়েন্ট (স্থলবন্দর), বিমানবন্দর, রেল ও ট্রাকযোগে প্রেরণ করে থাকে। রপ্তানির জন্য কিছু মাছ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বাজার হতেও সংগ্রহ করা হয়।

পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সময় ইলিশ মাছে বরফ প্রয়োগ ও প্যাকেজিং:

ইলিশ মাছ ধরার পর প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও পাইকারি বাজারে আনতে বেশ সময় লেগে যায়। তাই উক্ত সময়ে মাছ পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বরফ প্রয়োগ করে মাছের পাচনরোধ করা সম্ভব। বরফ ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মাছের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা। মাছের দেহের বিপন্মুক্ত তাপমাত্রা হলো ৩-৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। উক্ত তাপমাত্রায় মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব হলে মাছের গুণগত মান সঠিক থাকে। সাধারণত নিম্নের অনুপাতে বরফগুঁড়া Stake Ice মাছে প্রয়োগ করা হলে মাছের গুণগত মান প্রায় অক্ষুন্ন থাকে।

ক্রমিক নং	মাছ	বরফ গুড়া
১	২:১	
২	১:১	
৩	২:৩	

বরফকরণ পদ্ধতি:

১. নিচে মাছ এবং উপরে বরফ
২. উপরে ও নিচে বরফ মাঝখানে মাছ
৩. নিচে বরফ, তার ওপরে মাছ, তারপর বরফ, আবার মাছ এবং পরে বরফ

কিন্তু আমাদের দেশে উপরোক্ত অনুপাতে মাছে বরফ প্রয়োগ করা হয় না। এ বিষয়ে জেলেসহ সকল পাইকার ও আড়তদারগণকে সচেতন করা যেতে পারে।

প্যাকেজিং উপকরণ

ইলিশ মাছ প্যাকিং করতে সাধারণত নিম্নলিখিত উপকরণ ব্যবহৃত হয়:

১. বরফ
২. কাঠের বাক্স
৩. হুগলা/চট

উপরোক্ত উপকরণসমূহ সম্পূর্ণ তাপ নিরোধক নয়। উন্নত দেশে মাছ পরিবহনের জন্য তাপ নিরোধক প্লাস্টিক বাক্স ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশেও তাপ নিরোধক প্লাস্টিক বাক্সের প্রচলন শুরু হয়েছে।

পরিবহন ও বাজাজাতকরণের সময় গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ রাখার কৌশলঃ

গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যাবলী:

- গুণগত মান সংরক্ষণ করা সম্ভব হলে বাজারে উচ্চমূল্যে পাওয়া যাবে। ফলে সংশ্লিষ্ট সকলেই লাভবান হবেন।
- বস্তুনিকারক, ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারী আর্থিক লাভ সমুন্নত রাখতে।
- জাতীয় আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের স্বার্থে, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের টিকে থাকার স্বার্থে।

গুণগত মান সংরক্ষণের কৌশলঃ

কাজটি করতে গিয়ে কোন পর্যায়ে/স্তরে ইলিশ মাছের গুণগত মান বিনষ্ট হয় তা আমাদের জন্য দরকার এবং ঐ সকল স্তরে কার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, কার কি দায়িত্ব তাও জানা দরকার। একইভাবে বিভিন্ন স্তরে কি কি অবহেলা ও অসাবধানতার কারণে ইলিশ মাছের গুনগত মান বিনষ্ট হয় এবং তার জন্য কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা জেনে সে অনুযায়ী সকলকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইলিশ মাছের গুণগত মান বিনষ্টের স্তর, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় করণীয় নিম্নের ফ্লোচার্টের (১) মাধ্যমে দেখানো হলো।

ইলিশের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে সমস্যা:

- ধৃত মাছ নৌকা ও জলযানে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হয় না।
- কাঠের বাক্স, বাঁশের ঝুড়িতে ইলিশ পরিবহন বিজ্ঞানসম্মত নয়।
- দীর্ঘ সময় মাছ খোলা অবস্থায় রাখা হয়।
- বরফ প্রয়োগে সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না।
- গাদাগাদিভাবে মাছ রাখা ও বরফ মেশানোর বিলম্ব।
- অস্বাস্থ্যকরভাবে মাছ হ্যান্ডলিং করা:
- লবণ মেশানোর জন্য সাধারণত নিম্নমানের মাছ বাছাই করা হয়।
- ভেজাল ও সস্তা লবণ ব্যবহার, মাছ ও লবণের ত্রুটিপূর্ণ অনুপাত এবং বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব।

উত্তরণের উপায়ঃ

(১) সরাসরি সূর্যরশ্মি উষ্ণ স্থান ও তাপ উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি থেকে সরিয়ে রেখে তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক মাত্রায় বরফ প্রয়োগ করতে হবে (সঠিক মাত্রায় বরফ প্রয়োগে ১৫-১৮ দিন মাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থাকে)

(২) পরিবহণের জন্য বাক্স/ ঝুড়িতে বরফের অনুপাত এমন হওয়া উচিত যাতে তা সব সময় শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কাছাকাছি থাকে।

(৩) হিমায়নের পূর্বে মাছে একবার পচন ধরলে তা হিমায়ন, হিমায়িত গুদামে সংরক্ষণ ও বরফ গলানোর প্রতিটি পর্যায়েই থেকে যায়। এ জন্য হিমায়িত মাছের মান নিয়ন্ত্রণের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হিমায়ন প্রক্রিয়ার জন্য নিখুঁতভাবে মাছ প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করা। হিমায়ন কালে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে শতর্কতা অবলম্বন করা উচিত:

ক) তাপমাত্রা বাড়ার আগেই মাছ হিমায়নের ব্যবস্থা করা।

খ) হিমায়ন যাতে মন্থর ও অসম্পূর্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
গ) হিমায়িত মাছ প্যাকিং ও কোল্ড স্টোরেজে স্থানান্তর কাজে বিলম্ব পরিহার করা এবং
ঘ) কোল্ড স্টোরেজে তাপমাত্রা যাতে বৃদ্ধি না পায় বা ওঠানামা না করে তার ব্যবস্থা করা।

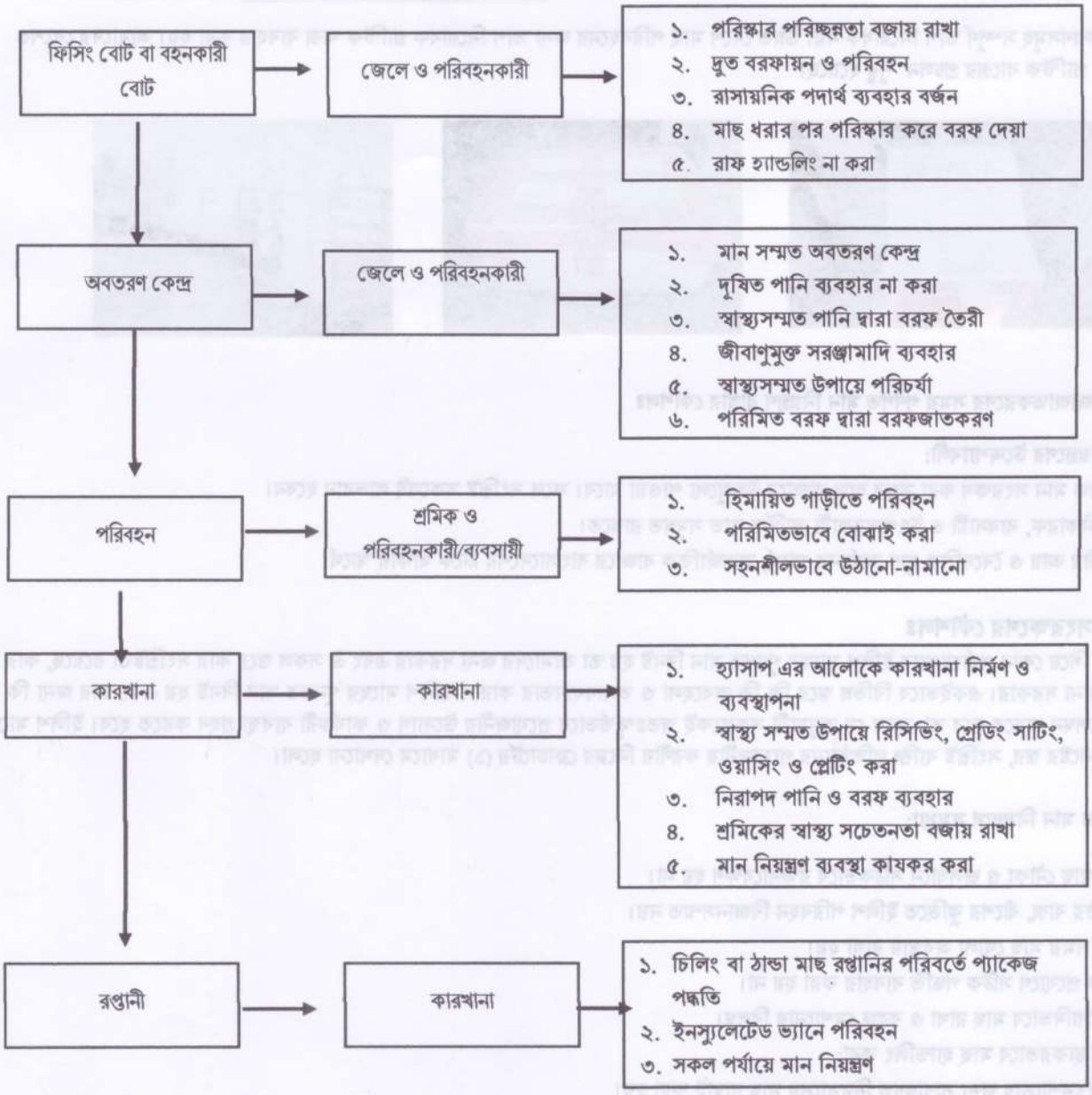

ফ্লো-চার্ট- (১)

ইলিশ মাছের গুনগতমান বিনষ্টের স্তর, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং করণীয় কাজ/সাবধানতাঃ

আহরণ থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা পর্যন্ত এমনকি রান্নাঘর পর্যন্ত বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্য সম্মত খাবার হিসাবে ইলিশের গ্রহণ যোগ্যতা বিনষ্ট অথবা বিনষ্ট অথবা জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইলিশ মাছ নিম্নের পদ্ধতি বা ফ্লোচার্ট অনুযায়ী হিমায়িত করা হলে গুনগত মান অক্ষুন্ন থাকবে।

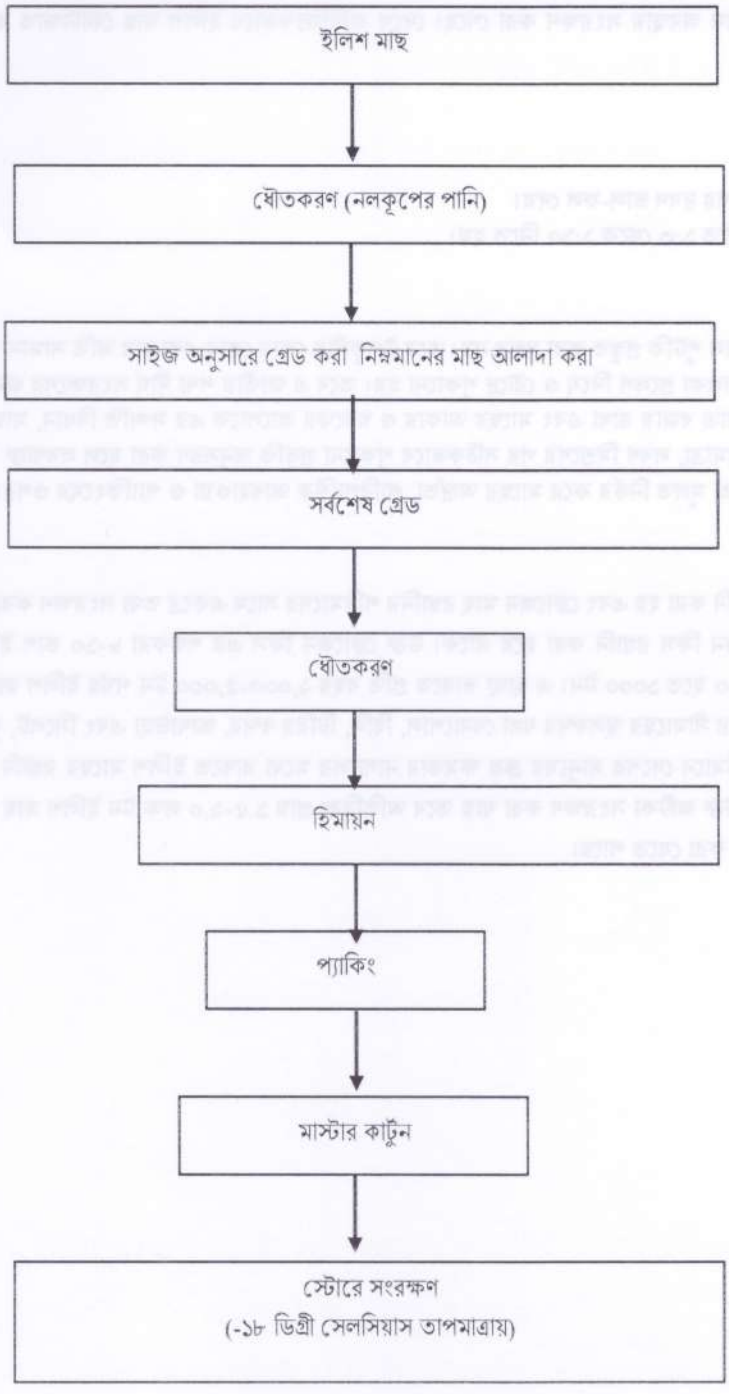

ইলিশ মাছের প্রক্রিয়াজাতকরণ

কৌটাজাতকরণঃ

এ মাছকে কোটাজাত বা ক্যানিং এর মাধ্যমে মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণ বা সংরক্ষনের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রে ইলিশ কোটাজাতকরণ প্রক্রিয়া সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। লবণ ও সয়াবিন তেলের মিশ্রণে ১২১ সে. তাপমাত্রায় ১৫ পাউন্ড চাপে ৫৫ মিনিটে কৌপাজাতকৃত ইলিশ মাছ ১-১.৫ বছর পর্যন্ত ভাল অবস্থায় সংরক্ষণ করা গেছে। দেখে বাণিজ্যিকভাবে ইলিশ মাছ কৌটাজাত করা হলে রপ্তানির বিপুল সম্ভাবনা আছে।

লবণাক্ত ইলিশ ও ডিম প্রস্তুতঃ

এটা দুই ভাবে করা যায় যথা।

ক. ভেজা লৰণ (Brine water): ১৫-২০% লবণের দ্রবণ ভাল-ফল দেয়।

খ. শুষ্ক লবন (Dry Salt): লবণ ও মাছের অনুপাত ১:৩ থেকে ১:১০ নিতে হয়।

শুঁটকি ইলিশ প্রস্তুত:

ইলিশ মাছের দেহে চর্বির পরিমাণ বেশি বিধায় ভাল শুটকি প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। তবে উপকূলীয় কোন কোন এলাকায় অতি সামান্য পরিমাণে ইলিশ মাছের শুটকি প্রস্তুত করা হয়। কোথাও আবার লবণের হালকা প্রলেপ দিয়ে ও রৌদ্রে শুকানো হয়। তবে এ জাতীয় পণ্য দীর্ঘ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত নয়। ভাজা বা টাটকা মাছ ব্যবহার, লবণ ও মাছের সঠিক অনুপাত বজায় রাখা এবং মাছের আকার ও ঘনত্বের আলোকে এর সঙ্গাতি বিধান, মাছ কাটা ও নাড়িভুড়ি বের করার সময় সতর্কতা অবলম্বন, পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা, লবণ মিশ্রণের পর সঠিকভাবে শুকানো প্রভৃতি অনুসরণ করা হলে লবণাক্ত মাছ দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা সম্ভব। লবণাক্ত মাছ কত দিন ভাল থাকবে তা মূলত নির্ভর করে মাছের আর্দ্রতা, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও প্যাকিংয়ের ওপর।

রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা:

ইলিশ মাছ সাধারণত ঠান্ডা অবস্থায় (Chill) রপ্তানি করা হয় এবং ফ্রোজেন মাছ রপ্তানির পরিমাণের সাথে একত্রে তথ্য সংরক্ষণ করা। হয়। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবছর গড়ে ৮,০০০ হতে ১০,০০০ টন ফ্রোজেন ফিস রপ্তানি করা হয়ে থাকে। উক্ত ফ্রোজেন ফিস এর শতকরা ৮-১০ ভাগ ইলিশ মাছ। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ হতে ইলিশ মাছ রপ্তানির পরিমাণ ৮০০ হতে ১০০০ টন। এ ছাড়া ভারতে প্রতি বছর ২,০০০-৫,০০০ টন পর্যন্ত ইলিশ রপ্তানি হয়ে থাকে। ভারতে যে সমস্ত মাছ রপ্তানি করা হয় তা সাধারণত দেশের সীমান্তের স্থলবন্দর যথা বেনাপোল, হিলি, চিরির বন্দর, আখাউড়া এবং সিলেট, কুমিল্লা ও খুলনার সীমান্ত পথ দিয়ে ট্রাক ও ট্রেনযোগে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের মধ্যে রাখতে ইলিশ মাছের রপ্তানি বন্ধ রয়েছে।বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রচুর পরিমান জাটকা ধরা হয়। যদি উক্ত জটিকা সংরক্ষণ করা যায় তবে অতিরিক্ত প্রায় ১.৫-২.০ লক্ষ টন ইলিশ মাছ প্রতিবছর উৎপাদন করা সম্ভব। উক্ত অতিরিক্ত ইলিশ মাছ বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে।

অধিবেশন পরিকল্পনা

দিন: ০৩	অধিবেশন নং-০৩	সময়: ১১:৩০-১২:০০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম : **ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় গণসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব।**

অভীষ্ট দল: বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নির্বাচিত সুফলভোগী জেলে

লক্ষ্য: অংশগ্রহণকারীগণ ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব এবং বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে অবহিত হবে;
- ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে কিভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির কাজে সম্পৃক্ত করা যায় সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবেন।

উদ্দেশ্য: *এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-*
- গণসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হবেন ;
- গণসচেতনতা সৃষ্টিতে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্ক জানতে পারবে;
- সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে কিভাবে এ কাজে সম্পৃক্ত করা সম্ভব সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			০৫ মিনিট
	১. স্বাগত জানানো, কুশল বিনিময় ২. পূর্ববর্তী অধিবেশনের সূত্র ধরে বর্তমান অধিবেশনের অবতারণা। (প্রধান শিক্ষণ বিষয়: মাছের আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনা) ৩. বর্তমান অধিবেশনের ওপর আলোকপাত (শিরোনাম) ৪. বর্তমান অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ (উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব)	প্রশ্নোত্তর পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			৪৫ মিনিট
	- ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব; - গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাছের ইলিশ জেলেদের মাঝে গণশিক্ষা ও স্বাক্ষরতা আন্দোলনের বিস্তার; - বিভিন্ন প্রকার মুদ্রিত দ্রব্যাদি (বুকলেট, লিফলেট, পোস্টার) ও গণসংযোগ(মাইকিং,ঢোলশহরৎ, নাটক, বিজ্ঞাপন) সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারনা;	প্রশ্নোত্তর প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট	
সার-সংক্ষেপ			১০ মিনিট
	১. মূল বিষয়ের পুনরালোচনা (প্রধান শিক্ষণ বিষয়গুলি) ২. উদ্দেশ্য যাচাই (অধিবেশনের উদ্দেশ্য); ৩. হ্যান্ড আউট বিতরণ ও পড়ানো; ৪. ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং পরবর্তি অধিবেশন সম্পর্কে ধারণা দেয়া।	প্রশ্নোত্তর/ পাওয়ার পয়েন্ট/ ফ্লিপচার্ট	
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী : পাওয়ার পয়েন্ট/ফ্লিপচার্ট, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, হ্যান্ডআউট ইত্যাদি।			

গণসচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্ব ও বিভিন্ন উপায়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইলিশ সংরক্ষণ কাজে সম্পৃক্তকরণ।

ইলিশ আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী এবং নবায়ন যোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু আমরা যেমন- দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝি না তেমনি বাজারে ইলিশের প্রাচুর্যতা থাকা পর্যন্ত তার প্রতি যত্নবান হইনি। আর যত্নবান না হওয়ার কারণে ইলিশ আজ হুমকির সম্মুখীন। তাই ইলিশের উৎপাদনকে সহনশীল ও সংরক্ষণ তথা বৃদ্ধির জন্য সকল স্তরের জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি অতীব প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তর ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি

ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ এবং মা ইলিশ/জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন ও বিধি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিম্নের মাধ্যমগুলো ব্যবহার করা হয়-

গণমাধ্যম

ইলিশ জেলে, ব্যবসায়ী এবং ইলিশ শিল্পে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্তরের মানুষের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহার করা হয়। যেমন- টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, বিলবোর্ড, ওয়েবসাইট/সিডি, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি। রেডিও, টেলিভিশনে নাটক/নাটিকা বা কুইল, সংবাদপত্রের কুইজ বা শব্দজব্দ, বিলবোর্ডের সাধারণ প্রযুক্তিগত তথ্য, ভিডিও এর মাধ্যমে প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রকাশ করে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়। ইলিশ/জাটকা সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণ চলচ্চিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বা ডকুমেন্টারি চলচিত্র তৈরি করে গণমাধ্যমে বিশেষ করে টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মাঝে প্রচার করা হয়।

মুদ্রিত দ্রব্যাদি

বিভিন্ন ধরনের মুদ্রিত দ্রব্যাদি যেমন পোস্টার, বুকলেট, লিফলেট, নিউজলেটার, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি প্রস্তুত করে জেলে সহ ইলিশ পরিবহন, বাজারজাতকরণ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট বিতরণ করা হয়। এই সব মুদ্রিত দ্রব্যাদি দ্বারা আইন, বিধি ও নীতি, সংরক্ষণ পদ্ধতি , পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি ও সাধারণ তথ্যসমূহ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

গণসংযোগ

মাইকিং, প্রচলিত ঢোল সহরত, নাটক, বিজ্ঞাপন, লোকগীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। বিশেষ করে লোকসঙ্গীত ও নাটকের মাধ্যমে স্থানীয় কারিগরি জ্ঞান ব্যবহার করে ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন করা যায়।

প্রত্যক্ষ সংযোগ (সচেতনতা সভা)

প্রত্যক্ষ সংযোগ (সচেতনতা সভা) সচেতনতা সৃষ্টির একটি খুবই কার্যকরী মাধ্যম। সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, দলীয় আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। এসব মাধ্যম দ্বারা আইন, ও নীতি, পদ্ধতি, পরিবেশ বিষয়ক ইস্যু, সম্পদ ইলিশ/জাটকা জেলে বা ইলিশ ব্যবসায় স্থানীয় প্রতিনিধি এবং প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংরক্ষণ, স্থানীয় কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে জনগণকে সচেতন করা যায়। অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/স্থানীয় প্রশাসন/আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য/গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/গণমাধ্যমকর্মী/ আড়তদার/ ট্রলার মালিক/ মাঝি/জেলে/মৎস্যজীবী সমিতির সদস্য/প্রতিনিধির সমন্বয়ে জেলে পল্লী/মাছ ঘাট/নদীর পাড়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ইউনিয়ন পরিষদ বা সুবিধাজনক স্থানে সভার আয়োজন করা হচ্ছে এবং ইলিশ অভয়াশ্রমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের অভয়াশ্রম সংলগ্ন নদীর পাড়/জেলে পল্লী/মাছ ঘাট/ ইউনিয়ন পরিষদে আয়োজন করা হচ্ছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে (নভেম্বর থেকে জুন) ৮ (আট) মাসব্যাপী এবং মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে ২২ (বাইশ) দিন প্রকল্প এলাকার জেলেপল্লীতে সচেতনতামূলক সভা, ইলিশ রক্ষা সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শন, মৎস্য সংরক্ষণ আইন সংক্রান্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ২৯ (উনত্রিশ) টি জেলার ১৩৪ (একশত চৌত্রিশ) টি উপজেলায় ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রতি বছরে ০২ (দুই) টি করে মোট ১০৭২ (এক হাজার বাহাত্তর) টি এবং ০৬ (ছয়) টি ইলিশ অভয়াশ্রমে ০২ (দুই) মাস সব ধরনের মাছ ধরা যেন বন্ধ থাকে তার জন্য অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট ১৫৪ (একশত চুয়ান্ন) টি ইউনিয়নে প্রকল্প মেয়াদে ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রতি বছরে ০২ (দুই) টি করে মোট ১২৩২ (এক হাজার দুইশত বত্রিশ) টি সচেতনতামূলক সভা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন

প্রতি বছর জাটকা মৌসুমে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ইলিশ/জাটকা ও সম্পদ এবং তা সংরক্ষণের গুরুত্ব, আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর দেশের ইলিশ অধ্যুষিত জেলা উপজেলায় জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন করেন। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহে প্রচার-প্রচারণার অংশ হিসেবে দৈনিক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় ক্রোড় পত্র প্রকাশ, বিজ্ঞাপন,নৌর‍্যালি,সেমিনার-ওয়ার্কশপ,টকশো, ভিডিও ফুটেজ, ডকমেন্টারি প্রর্দশন, লিফলেট, পোষ্টার,বিলবোর্ড সহ ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

রচনা প্রতিযোগিতা

দেশব্যাপী জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন কালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ইলিশ সম্পদ, জাটকা নিধনের ধ্বংসাত্মক প্রভাব এবং এ সম্পদ রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়।

বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে সম্পৃক্ত করা

সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন, মৎস্য মেলা ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে ইলিশ সংরক্ষণ কাজে সম্পৃক্ত করা। ইলিশ সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলায় ইলিশ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি সহ অন্যান্য কমিটি ও কার্যক্রমে ইলিশ জেলে, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনী ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের লোকজনকে অন্তর্ভুক্ত করায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজন ইলিশ সংরক্ষণে সম্পৃক্ত হচ্ছে। ফলে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল দৃশ্যমান হয়েছে। ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্যোগকালীন সময়ে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের করণীয়

(ক) প্রতিবৎসর ঘূর্ণিঝড়/বন্যা মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই ঘূর্ণিঝড়/বন্যাপ্রবণ এলাকার মাছ ধরার নৌকাসমূহ, ট্রলার, ফিসিং, গিয়ার, মাছ ধরার কারিগরি যন্ত্রপাতি, মৎস্য পোনা ও মৎস্য পালন স্টক এবং মৎস্য আবাদসমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসারগণ মৎস্যজীবীদের সজাগ করবেন।

(খ) অধীন অফিসসমূহ, মৎস্যচাষি এবং মৎস্যজীবী প্রতিনিধি প্রভৃতির সহিত অধিদপ্তরের গৃহীত নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করবেন।

(গ) দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে মাছ ধরার নৌকাসমূহ, ট্রলারসমূহ এবং ফিসিং গিয়ারসমূহ, অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার সাথে রাখার জন্য স্থায়ীভাবে নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করবেন।

(ঘ) ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে প্রতিটি ট্রলারের ওয়্যারলেস ও রেডিও সেট থাকার বিষয় নিশ্চিত করবেন।

(ঙ) উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য শিকাররত নৌকাসমূহ/ট্রলারসমূহে রেডিও রিসিভিং সেট ও ট্রলার/ নৌকায় উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য লাইফ জ্যাকেট রাখা নিশ্চিত করবেন।

(চ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহের সরকারী ও বেসরকারী মৎস্য বিষয়ক সম্পদসমূহের নবায়নকৃত তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করবেন।

(ছ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকাসমূহের মৎস্যজীবী জনসংখ্যা, মৎস্যচাষি ও মৎস্য চাষ ক্ষেত্রসমূহের জরীপ ও উপাত্ত সংরক্ষণ করবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর পর তাহা হাল- নাগাদ করবেন।

(জ) সংশ্লিষ্ট এলাকার মাছ ধরার নৌকাসমূহ, ট্রলারসমূহ এবং সমুদ্রগামী জাহাজসমূহের মালিক/ চালকের ঠিকানাসহ তালিকা সংরক্ষণ করবেন।

(ঝ) সামুদ্রিক জলোচ্ছাসজনিত আঘাতের কারণে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করবার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার বাঁধ ও স্লুইসগেটসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(ঞ) স্লুইসগেটসমূহের যথাযথ পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।

(ট) প্রয়োজনের সময় সিপিপি -এর সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে পুকুরসমূহ হইতে লবণাক্ত পানি বাহির করে দেয়ার কাজে শক্তিচালিত নলকূপের প্রাপ্যতা সম্পর্কে স্থানীয় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন -এর কর্মকর্তাগণের সহিত সমন্বয় করবেন।

(ঠ) ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা প্রস্তুতি ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং পুনর্বাসন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

দুর্যোগ পর্যায়

(ক) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য সমুদ্রগামী জাহাজ রিকুইজিশন করার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করবেন (ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগকালীন সময়)।

(খ) নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করবেন এবং স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যোগযোগ কর্মকর্তা প্রেরণ করবেন।

পুনর্বাসন পর্যায়ে

(ক) সরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন মৎস্যসম্পদ খাতে ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য অবিলম্বে জরিপকার্যের ব্যবস্থা এবং এই খাতের জন্য অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন ও তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবেন।

(খ) স্থানীয় প্রশাসন এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহিত সমন্বয়পূর্বক, সম্ভব হলে সরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শক্তিচালিত পাম্প আমদানি করবেন।

(গ) মৎস্য উন্নয়ন খাতে অবিলম্বে দীর্ঘ মেয়াদী ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন এবং কাজের অগ্রগতির বিষয়ে উচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন।

(ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত ইলিশ জেলেদের পুনর্বাসনের জন্য অনুপ্রাণিত এবং সহায়তা করবেন।

(ঙ) স্থানীয় প্রশাসনকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।

জেলেদের করণীয়ঃ

১। আবহাওয়ার অবস্থা জেনে নদী/সমুদ্রে গমন করবেন।

২। নদীতে /সমুদ্রে সপ্তাহব্যাপী মাছ ধরতে যাওয়ার পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

৩। প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং চিকিৎসার সরঞ্জাম (ব্যান্ডেজ, ডেটল প্রভৃতি)সাথে রাখতে হবে

৪। লাইফ জ্যাকেট, বয়া ইত্যাদি জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামাদি সাথে নিতে হবে।

৫।সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় অবশ্যই জিপিএস, ভিএইচ এফ, মোবাইল সেট ও রেডিও সাথে নিতে হবে।

৬। সমুদ্রে দুর্যোগে আক্রান্ত হলে বা বিপদ সংকেত পাওয়া মাত্র কাছাকাছি অন্য ট্রলারের সাথে নিরাপদে থাকতে হবে।

৭। সকাল,দুপুর ও বিকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনার অভ্যাস করতে হবে।

৮। রেডিওতে প্রতি ১৫ মিনিট পর পর ঘূর্ণিঝড়ের খবর শুনতে হবে।

৯। ঝড় একটু কমলেই রওনা হবেন না। পরে আরও প্রবল বেগে অন্যদিক থেকে ঝড় আসার সম্ভাবনা বেশি থাকায় পরিস্থিতি বুঝে যাত্রা করতে হবে।

জেন্ডার সচেতনতা

জেন্ডার শব্দটির অর্থ অভিধানের ভাষায় লিঙ্গ বলা হয়। সাধারণত ব্যাকরণেও জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ চিহ্নিত করা জন্য, যেমন- পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লিবলিঙ্গ, ইত্যাদি। কিন্তু এভাবে জেন্ডার এবং সেক্স একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন, সাহিত্যে জেন্ডারের ভিন্ন ও ব্যাপকতর অর্থ নির্দেশিত হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাই জেন্ডার এবং সেক্সের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য সূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য কিংবা শরীর বৃত্তিয়ভাবে নির্ধারিত নারী ও পুরুয়ের বৈশিষ্ট্য যা জন্মগত এবং সাধারণত অপরিবর্তনীয়।
জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী ও পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী ও পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন/বিভিন্ন হয়ে থাকে।
বস্তুত নারী ও পুরুষ এই বিপরীত লিঙ্গের মধ্যকার সম্পর্কের সামাজিক রূপই হচ্ছে জেন্ডার। এক কথায় জেন্ডার হচ্ছে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সমাজ সৃষ্ট সম্পর্ক এবং লিঙ্গ হচ্ছে নারী ও পুরুষের জন্মগত বা জৈবিক বৈশিষ্ট্য।

জেন্ডার সম্পর্ক সংস্কৃতি, জাতি, ধর্ম শ্রেণী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হলেও গোটা বিশ্বজুড়ে দু টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সাধারণত অভিন্ন অবস্থা বিদ্যমান। নারী-পুরুষের দৈনন্দিন কাজ, দায়-দায়িত্ব, ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বা অসমতা অর্থাৎ জেন্ডারভিত্তিক শ্রম বিভাগ। দ্বিতীয়ত পুরুষের তুলনায় সম্পত্তি, অধিকার, পছন্দ, ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর দুর্বলঅবস্থা, বা সুযোগের অভাব অর্থাৎ সমাজে নারীর অমর্যাদাজনক বা দুর্বলঅবস্থান।

জেন্ডার ভূমিকা

পৃথিবীতে নারী এবং পুরুষ যে কাজগুলো করে তাদের এক কথায় বলে জেন্ডার ভূমিকা।

জেন্ডার ভূমিকা তিন ধরনের-

ক. পুনঃ উৎপাদনমূলক (গৃহস্থালি) ভূমিকা
খ. উৎপাদনমূলক (আয়মূলক) ভূমিকা
গ. সামাজিক ভূমিকা

পুনঃ উৎপাদনমূলক ভূমিকা

এ জাতীয় কাজগুলো কোন বিনিময় মূল্য ছাড়াই নিজেদের প্রয়োজনে করা হয়ে থাকে। যেমন-সন্তান ধারণ ও লালন পালন, বাড়িঘর রক্ষণাবেক্ষণ, শ্রম শক্তি যোগাদারদের যত্ন - অতীত (দাদা-দাদী, নানা-নানী, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি), বর্তমান (স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, দেবর, ননদ, ইত্যাদি), ভবিষ্যত (পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী)।

জীবন ধারণ ও মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এ জাতীয় কাজ অপরিহার্য। এ কাজগুলো নিজেদের প্রয়োজন করা হয় এবং সাধারণত এ কাজগুলো নারীরাই করে থাকে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে পুরুষের অংশগ্রহণ প্রায় নেই বললেই চলে।

উৎপাদনমূলক (আয়মূলক) ভূমিকা

যে কাজ করলে আয় হয় সে সব কাজগুলোকে এক কথায় উৎপাদন ভূমিকা বলে। এই আয় সরাসরি অর্থের মাধ্যমে হতে পারে আবার দ্রব্যের মাধ্যমেও হতে পারে যার কিছু না কিছু বিনিময় মূল্য আছে। যেমন -চাকুরী করা, ব্যবসা করা, রিক্সা চালানো, ইট ভাঙ্গা, ইত্যাদি। সরাসরি অর্থের সাথে জড়িত বলে এ জাতীয় কাজ সব সময় গুরুত্ব পেয়ে থাকে এবং যারা এ ধরণের কাজের সাথে যুক্ত তাদের মর্যাদা বেশি।
আমাদের সমাজে আয়মূলক কাজের সাথে সাধারণত পুরুষেরাই বেশি যুক্ত।

সামাজিক ভূমিকা

যে সব কাজ কোন বিনিময় মূল্য ছাড়াই সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয় তা হলো সামাজিক ভূমিকা। এই ভুমিকা মূলত দুই ধরনের - ক) সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা খ) সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা।

ক) সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা

অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সকলের স্বার্থে যা করা হয় তা হলো সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা। যেমন গ্রামের সকলে বা কয়েকজন অথবা একাই পুরাতন সাঁকো ও রাস্তা মেরামত, বাধ নির্মাণ, মৃত্যুবার্ষিকী পালন, ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের সাহায্যসহযোগিতা করা। নারী-পুরুষ উভয়েই এই ভূমিকা অংশ নিতে পারে।

খ) সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা

সমাজের কল্যাণার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করা হয় তা হলো সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের প্রধান দিক। যেমন ইউনিয়ন পরিষদের কর্মসূচী, কোথায় স্কুল হবে, ইত্যাদি। মোটকথা সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা হলো সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা আর সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা ঐ কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণত পুরুষেরা দু ধরনের উৎপাদনমূলক এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা, পালন করে এবং নারীরা তিন ধরনের যথা- পুনঃ উৎপাদনমূলক, সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে এবং তিনটি ভূমিকার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে।

জেন্ডার চাহিদা

চাহিদা বলতে মানুষের জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণের প্রয়োজনীয়তাকে বুঝি। সাধারণ চাহিদা ও জেন্ডার চাহিদার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। জেন্ডার চাহিদা কেবল নারীদের দেশ কাল অবস্থানগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও বিশ্বব্যাপী এখনও নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক দূর্বল অবস্থায় আছে এবং এই কারণেই জেন্ডার চাহিদা প্রধানত নারীদের হয়ে থাকে। জেন্ডার চাহিদা দু ধরনের -
ক) বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা এবং খ) কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা।

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা

নারীর প্রাত্যহিক জীবনযাপন ও তার কাজ-কর্ম সম্পাদনের বাস্তব সমস্যা থেকে উভূদত হয় বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা। একজন নারী (সকাল থেকে রাত) তার দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করতে গিয়ে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ নারীরা তাদের তিন ধরনের ভূমিকা পালনে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়, বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভব। বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নারীর প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা পালন সহজতর হয়। কাজের বোঝা হ্রাস পায়। ফলে জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়, দায়িত্ব আরও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারে। যেমন, নারীর দূর থেকে খাবার পানি সংগ্রহের কষ্ট লাঘবের জন্য বাড়িতে টিউবওয়েল বা পাকা কুয়া স্থাপন, উন্নত চুল্লী সরবরাহের মাধ্যমে জ্বালানি ও শ্রমের সাশ্রয় করা, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, নারীকে আয় উপার্জনমূলক কাজে জড়িত করে সংসারের অভাব কিছুটা দুর করা, ইত্যাদি হলো জেন্ডার চাহিদা পূরণের নমুনা।

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নারীর অবস্থানের উন্নয়ন ঘটলেও তা কিন্তু সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে না। অর্থাৎ নারী-পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা পরিবর্তনে সরাসরি সহায়তা করে না। এই চাহিদা সহজে পূরণ করা সম্ভব এবং চাহিদা পূরণের উপকরণ বা উপায়গুলো প্রত্যাহার করে নিলে নারীর অবস্থা আবার পূর্বের মত হয়ে পড়ে।

কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা

সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর দুর্বল অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন থেকে নারীর কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার উদ্ভব। পুরুষের তুলনায় নারীর অধস্তন অবস্থার বিশ্লেষণ এবং তা মোকাবেলা করার জন্য কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা চিহ্নিত করা হয়। মোটকথা ক্ষমতা, অধিকার, মর্যাদা, সিদ্ধান্তগ্রহণ, পছন্দ ও সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা বা বৈষম্য দুর করার জন্য যে চাহিদার উদ্ভব হয় সেটা হলো কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা। জেন্ডার শ্রম বিভাগ, ক্ষমতা, মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ, আইনগত অধিকার অর্জন, সমান মজুরি প্রাপ্তি, সম্পদে মালিকানা ও নিজ আয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ, নিজ দেহ ও প্রজননের ওপর আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার, পারিবারিক নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ, ইত্যাদি কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেহেতু এই জেন্ডার চাহিদা নারীর মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ, অধিকার, ক্ষমতা, ইত্যাদি অর্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাই এটা পূরণ অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা।

জেন্ডার এবং উন্নয়ন

নারীরা পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক, মোট শ্রমশক্তি ৪৮% এবং জাতীয় আয়ে নারীর অবদান ৩০ ভাগ। নারীরা পৃথিবীর মোট কাজের দুই/তৃতীয়াংশ সম্পাদন করে এবং পুরুষের চাইতে প্রায় ১৫ গুণ সাংসারিক কাজের বোঝা বহন করে। কিন্তু মোট সম্পাদনের মাত্র এক ভাগের মালিক হলো নারীরা এবং মোট আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ লাভ করে নারীরা। গোটা দুনিয়ার চরম দারিদ্রেযর মধ্যে বসবাসকারী ১৫৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৭০ ভাগই হলো নারী। যেহেতু নারীর সাংসারিক কাজকে উৎপাদনমূলক বা অর্থনৈতিক কাজ হিসাবে গণ্য করা হয় না সেহেতু প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীর এই অদৃশ্য অবদানস্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায় অর্থাৎ পরিমাপ করা যায় না। সমাজে ক্ষমতার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রাপ্তি থেকে নারীরা বঞ্চিত হবার মূল কারণ জেন্ডার শ্রম বিভাগের মধ্যে। সে জন্যই সমগ্র মানব জাতির স্বার্থেই ন্যায্যসমতার ভিত্তিতে উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করাটা জরুরী কর্তব্য। আর এর অর্থই জেন্ডার সচেতন হয়ে ওঠা এবং সে জন্যই জেন্ডার আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ইস্যু হয়ে উঠেছে।

নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তারা সমস্ত ধরণের সরঞ্জাম এবং সক্ষমতা অর্জন করে যা তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে পাশাপাশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমাজে আরও বিশিষ্ট এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়

নারীর ক্ষমতায়ন নারীদের বৃহত্তর আত্মবিশ্বাস, নিরাপত্তা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানে এবং পরিস্থিতিগুলিকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে এমন পরিস্থিতি সংগঠিত ও পরিবর্তনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

নারীর ক্ষমতায়নের ধারণায়ন ব্যাপক ব্যবহারের কারণে 'ক্ষমতায়ন' শব্দটির অর্থও অনেকটাই ছড়িয়ে গিয়ে এর স্পষ্টতা হারিয়েছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়নের পরিসরে এটি অনেক ক্ষেত্রে স্রেফ একটি বহুল উচ্চারিত ফাঁপা বুলি বা বাজওয়ার্ডে পরিণত হয়েছে (বাতলিওয়ালা ২০০৭, কর্নওয়াল ও ইয়াড ২০১১)। এক

সময় ক্ষমতায়ন বলতে মূলত বোঝানো হতো তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন লড়াইকে, যেগুলোর লক্ষ্য ছিল অসম ক্ষমতা সম্পর্কের মুখোমুখি হওয়া ও সেগুলো পালটে দেওয়া। তবে এক পর্যায়ে শব্দটি বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও এনজিও থেকে শুরু করে বহু বাণিজ্যিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংগঠনও শিথিল অর্থে ব্যবহার করতে শুরু করে (কর্নওয়াল ২০১৬)। এভাবে এটির সাধারণ প্রয়োগ বাড়তে থাকে উন্নয়নের পরিসরেও, যেখানে নারীদের ভূমিকা ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিষয়ও μমশ মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছিল। এটি বিশেষ করে ঘটেছিল ষাট ও সত্তরের দশকের দিকে নারীদের ওপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিবিধ নেতিবাচক প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে। এমন পটভূমিতেই জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দশক (১৯৭৫-৮৫) ঘোষিত হয়েছিল। ততদিনে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, কেবল আয়মূলক কর্মকাণ্ড নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনে খুব একটা ভূমিকা রাখে না, বরং তা ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ওপর আরো বোঝা চাপিয়ে দেয়। এমন উপলব্ধি থেকেই জেন্ডার ও ক্ষমতায়নের সম্পর্কের প্রতি মনোযোগ বাড়তে থাকে। তবে সেই পটভূমিতে 'ক্ষমতায়ন' শব্দটির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার পর এটির অর্থও শিথিল হতে শুর

অটিজম

অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (এ এস ডি) একটি জটিল স্নায়বিক বিকাশ সংক্রান্ত রোগের শ্রেণী যা সামাজিক বিকলতা, কথা বলার প্রতিবন্ধকতা, এবং সীমাবদ্ধ, পুনরাবৃত্তিমূলক এবং একই ধরনের আচরণ দ্বারা চিহ্নিত হয়। এটা একটি মস্তিষ্কের রোগ যা সাধারণত: একজন ব্যক্তির অন্যদের সাথে কথা বলার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

অটিজমের লক্ষণসমূহ

তিনবছরের ছোট্ট ছেলে 'অ'। তিনবছর বয়স হলেও সে ঠিকমত কথা বলতে শিখেনি। দুটি শব্দ ব্যবহার করে সে নিজ থেকে কোন অর্থপূর্ণ বাক্য বলতে পারেনা। তবে মাঝে মাঝে অন্যের বলা কথা বারবার বলতে থাকে। নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়না, সমবয়সীদের সাথে মেশে না। বাবা-মায়ের চোখে চোখ রেখে তাকায় না। প্রতিদিন নিজস্ব রুটিন মেনে চলতে ভালোবাসে। রুটিনের ব্যতিক্রম হলে সে মন খারাপ করে বা রেগে যায়। মাঝে মাঝে সে কোন কারণ ছাড়াই উত্তেজিত হয়ে উঠে।

অটিজম কী?

অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার শিশুদের স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা যেখানে
-শিশুর সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে অসুবিধা,
-আশেপাশের পরিবেশ ও ব্যক্তির সাথে মৌলিক ও ইশারা ইংগিতের মাধ্যমে যোগাযোগের সমস্যা
-এবং আচরণের পরিবর্তন দেখা যায়।

(ক) ধর্ম-বর্ণ-আর্থসামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে যেকোন শিশুর মধ্যে অটিজমের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।
(খ) মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রায় চার গুণ বেশি।
(গ) সাধারণত শিশুর বয়স ৩ বছর হবার আগেই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৮ মাস থেকে ৩৮ মাস বয়সের মধ্যেই) অটিজমের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়।

অটিজমের প্রাথমিক লক্ষণ:

১। ১২ মাস বয়সের মধ্যে আধো আধো বোল না বলা, পছনের বস্তুর দিকে ইশারা না করা
২। ১৬ মাসের মধ্যে কোন একটি শব্দ বলতে না পারা
৩। ২৪ মাস বয়সের মধ্যে দুই বা ততোধিক শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে না পারা
৪। ভাষার ব্যবহার রপ্ত করতে পারার পর আবার ভুলে যাওয়া
৫। বয়স উপযোগী সামাজিক আচরণ করতে না পারা

অটিজমের সাধারণ লক্ষণসমূহ:

১। শিশুর ভাষা শিখতে সমস্যা
২। একবছর বয়সের মধ্যে 'দা...দা', 'বা...বা', 'বু...বু' উচ্চারণ করতে না পারা।
৩। দুই বছর বয়সের মধ্যে অর্থপূর্ণ দুটি শব্দ দিয়ে কথা বলতে না পারা।
৪। শিশু যদি চোখে চোখ না রাখে
৫। নাম ধরে ডাকলে সাড়া না দেয়া
৬। অন্যের সাথে মিশতে সমস্যা হয় এবং আদর নিতে বা দিতে সমস্যা হয়
৭। হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠা
৮। পছন্দের বা আনন্দের বস্তু/ বিষয় সে অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করতে না পারা
৯। অন্যের বলা কথা বার বার বলা
১০। বার বার একই আচরণ করা
১১। শব্দ, আলো, স্পর্শ ইত্যাদি বিষয়ে কম বা বেশি প্রতিক্রিয়া দেখানো
১২। একটি নিজস্ব রুটিন মেনে চলতে পছন্দ করা, আশেপাশের কোন পরিবর্তন সহ্য করতে না পারা।
১৩। নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা
১৪। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে না পারা।